ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা: ১৯৭১

জগন্নাথ হল

সংকলন ও সম্পাদনা
রতনলাল চক্রবর্তী

উৎসর্গ

জগন্নাথ হলের সবুজ চত্বর
যাদের খুনে হয়েছিল রাঙা।
অজানা সেই অমর শহীদদের
জানাই শেষ প্রণাম।।
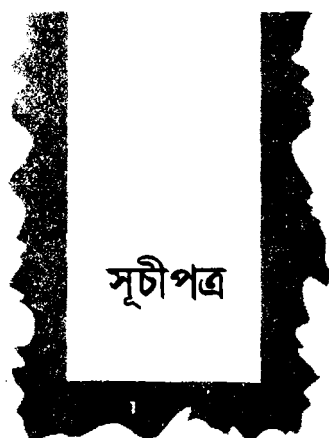
সূচীপত্র

কোনমতেই মনের ইচ্ছা নয়। শহীদ পরিবারগুলোর এই বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের অবসানকল্পে আমি শহীদদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম এই গ্রন্থখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করতে। কিন্তু আমার প্রয়াস ও প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এই ধরনের তথ্য সংকলন নিঃসন্দেহে অতীব দুরূহ কাজ। ২৬শে মার্চ (১৯৭১) জগন্নাথ হলের বিভিন্ন ভবন ও স্থান পাক সৈন্যের অগ্ন্যুৎসবে ভস্মীভূত হয়। পরবর্তীকালে জগন্নাথ হল হয় লুণ্ঠিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন হতে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান দলিলপত্র হয় বিনষ্ট। ফলে শহীদ শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী সম্পর্কিত তথ্যাদি হল হতে সংগ্রহ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জগন্নাথ হলের গণহত্যার উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু প্রকাশিত তথ্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। অধ্যাপক নূরুল উল্লার সাহসী প্রচেষ্টায় গৃহীত ভিডিও চিত্র দেখে ঘটনার বিশালত্ব সম্পর্কে অনুমান করাও অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই অবস্থা জগন্নাথ হলের গণহত্যা সম্পর্কিত তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাকে ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে। আমি শরণাপন্ন হয়েছি শহীদ পরিবার, প্রত্যক্ষদর্শী ও হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গের–যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলই এই গ্রন্থ। আমার ভূমিকা সংগ্রহ ও সংকলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে সময় লেগেছে প্রচুর। কেননা প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষাৎকার দানকারিগণের একাংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত। যোগাযোগ স্থাপন ও তাদের সময় দেবার বিষয়টি এখানে জড়িত। সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে শহীদদের ছবি সংগ্রহে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বহু পরিবারের পরলোকগত আত্মীয়স্বজনদের ছবি নেই। শহীদ পরিবারের সাথে পত্র যোগাযোগ করলে এই তথ্যটি ছিল প্রায় সাধারণ ঘটনা। অন্যদিকে শহীদ পরিবারের একটি অংশ ভারতে চলে যাওয়ায় তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়নি। যে ক্ষেত্রে শহীদদের (মূলত ছাত্রদের) কোন ছবি পাওয়া যায়নি, সেখানে শহীদদের হস্তাক্ষর তুলে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বেশ কিছু সংখ্যক শহীদের ছবি বা হস্তাক্ষর কোনটাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শহীদদের (ছাত্র) তালিকাটি বর্ণক্রমানুযায়ী দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যেসব শহীদের ছবি বা হস্তাক্ষর কোনটাই নেই তাদের তালিকা শেষে প্রদান করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার দানকারিগণ সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনেকেই নিষ্ঠুর গণহত্যার হাত হতে সৌভাগ্যক্রমে অব্যাহতি পেয়েছেন। সুতরাং তাদের ছবি এই গ্রন্থে সংযোজন করা আমি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। গ্রন্থের শেষে পরিলেখ পরিকল্পনা–চিত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে।

এই দলিল গ্রন্থ প্রণয়নে আমি বহুজনের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি সাক্ষাৎকার দানকারীদের নিকট হতে, যারা আমার আহবানে সর্বদাই সাড়া দিয়েছেন আন্তরিকভাবে। একইভাবে শহীদ পরিবারসমূহ আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন পর্যায়ে। জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন জগন্নাথ হলের নথিপত্র আমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছেন। অনুলিপি, ফটোকপি ও হস্তাক্ষর সংগ্রহে জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের আন্তরিক ভূমিকা এই গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়াসকে সফল করে তুলেছে। আমার শিক্ষক ডঃ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রত্যক্ষদর্শী ও তৎকালীন জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুরের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কোলকাতা হতে, কেননা ডঃ ঘোষ ঠাকুর সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সাক্ষাৎকারগুলো লিখন ওপরিমার্জনের ক্ষেত্রে উত্তম সমদ্দার, নির্মল চক্রবর্তী, অনুপ সমদ্দার, আমজাদ হোসেন, শ্যামল চক্রবর্তী, আবদুল মালেক (বিপ্লব), রুহুল আমীন, লোপা মুদ্রা (দোলা),ত্রিবেণী চক্রবর্তী (মুক্তা) ও কামরুন নাহার বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ছিল অসম্ভব। প্রাপ্ত ছবিসমূহ সতর্কতার সাথে সনাক্তকরণ করা হয়েছে। তবুও যদি কোন ভুল থাকে তা সম্পাদকের অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নয়। ছবি সংগ্রহের দুরূহ কাজে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি মুভি এন্ড স্টিলের ইফ্‌তেখার হোসেন (পিন্টু), বাংলার বাণীর প্রেস ম্যানেজার রতন দাস, আমার ছাত্রী ইফ্‌ফাৎ জাহান, জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ কার্যালয়ের কর্মচারী সমীর গোস্বামী, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ রায় ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অফিসারফজলুর রহমান খন্দকার ও আমার ছাত্র বায়েজিদ আক্তার, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগারের রঞ্জন কর্মকার প্রমুখের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি। গণহত্যার পরিলেখ পরিকল্পনা-চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র মাসুদ রানা ও শফিকুল ইসলাম শফিক-সবার নিকট আমি ঋণী এবং সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

এই দলিল গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে প্রকাশনা যথেষ্ট অর্থব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ বিষয়ে পরামর্শ ও বাস্তব সাহায্য পেয়েছি আমার সহপাঠী ও সহকর্মী প্রফেসর মুনতাসীর মামুন ও আগামী প্রকাশনীর জনাব ওসমান গনির নিকট হতে। মুনতাসীর মামুনের আগ্রহ ও বাস্তব সাহায্য না পেলে এটি হয়তো পাণ্ডুলিপি আকারেই থাকতো এবং হারিয়ে যেতো অন্ধকারের বিবরে '৭১-এর শহীদদের মতো। আগামীর পরিচালক ওসমান গনির মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের আগ্রহকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই যে সংকলক ও সম্পাদক হিসেবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে যদি এই গ্রন্থ স্বাধীনতার শপথ ও শহীদদের রক্ত ঋণ শোধের জন্য সচেতন জনগণকে উদ্দীপিত করে।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২

ভূমিকা

২৬শে মার্চ, ১৯৭১। এদিন কেন এত তাৎপর্যবহ? এর সহজ সরল উত্তর হলো–এদিন আমাদের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসটি শুধু নির্ভেজাল আনন্দঘন হয়ে ওঠে না আমাদের কাছে। স্বাধীনতা দিবস এলেই স্বজন হারানোর এক বুক কান্না আমাদের চেপে বসে। কেননা এদিন শুধু স্বাধীনতা দিবসই নয়, এদিন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর ও জঘন্য গণহত্যার প্রথম কালরাতের সূচনা করে। যেন তমসাভেদী স্বাধীনতা সূর্যের উদয়লগ্নে পূর্ব আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রক্তের আল্পনা। রক্তস্নাত স্বাধীনতা সূর্য তাই আমাদের সুখ ও বেদনার নিদর্শন, আমাদের পতাকার প্রতীক।

স্বাধীনতার বেদীতে যারা ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তাঁদের কাহিনী সূর্যসেনের অনুসারীর মত যেন গোপন রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে যতটুকু লেখা হয়েছে, তা ঘটনার মাত্রা ও গভীরতার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার জন্য প্রকল্পের পর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষিত সমাজ কখনই এ সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেনি। অন্যদিকে স্বল্পায়ু প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। ১৯৭১ সালের এই যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ না মুক্তিযুদ্ধ তা নিয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে চলছে বাক্‌যুদ্ধ। এর অনিবার্য ফল স্বরুপ সময়ের অমোঘ গতিতে অপসৃয়মান হচ্ছে স্বাধীনতার স্মৃতি। দুই দশক অতিক্রম করার ফলে সমকালীন অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এখন আর রোমাঞ্চকর নয়, নয় বাস্তব–দিনে দিনে তাতে অনেক রং ধরেছে এবং সত্য অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হয়েছে কল্প-কাহিনীতে। তবু এখনও কিছু সময় আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধরে রাখার। মুক্তিযুদ্ধের লিখিত তথ্যের পরিমাণ ৩–৪ লক্ষ পৃষ্ঠার বেশী হবে না। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে সংঘটিত গণহত্যা, বিপর্যস্ত জনজীবন, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, দেশীয় সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাধারণ মানুষের ঐক্যের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য ও বিস্তৃত আলোচনা আমাদের কাছে নেইও। এসব সম্পর্কে তেমন কোন লিখিত উৎস থাকার কথা নয়, সম্ভবত নেইও। তাই এজন্য আমাদের প্রয়োজন সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তৎকালীন ইতিহাস ধরে রাখা। সাক্ষাৎকার সমর্থিত ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন থাকা খুবই স্বাভাবিক যে সেখানে আবেগ ও আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় লক্ষ্য করা যাবে অনিবার্যভাবে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনাও সাদৃশ্য সন্ধানের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারভিত্তিক ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কিত জটিলতা কতকটা নিরসন সম্ভব। এসব বিষয় সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলে সংঘটিত গণহত্যার তথ্য সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রেখেছে। কেবলমাত্র প্রজ্ঞার সুদীপ্ত মশাল জ্বালানোর মধ্যেই এই মহান বিদ্যাপীঠের কার্যক্রম সীমিত ছিল না, তার চেতনার শাণিত তরবারি চমক দিয়েছে জাতীয় প্রয়োজনে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে সফল নেতৃত্বদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাই হয়ে পড়েছিল ঘাতকের অনিবার্য শিকার। রাতের অন্ধকারে ঘাতক হায়েনার দল সহস্র লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে আকণ্ঠ রক্ত পান করে এবং তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রতিবাদী জনতার লাশ।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তৎকালীন ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃত্বে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জগন্নাথ হলেও এরূপ কুচকাওয়াজ চলছিল কয়েকদিন ধরে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে যে, জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল হতে যুদ্ধের সশস্ত্র প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই মন্তব্য বাস্তব ছিল না।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশেষভাবে জগন্নাথ হল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় কি ঘটেছিল তা একটু আলোচনার প্রয়োজন। ২৫শে মার্চ সারাদিন ছিল প্রতিবাদমুখর। একটা কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন। তবে ঘটনার বিশালত্ব এত বড় হবে এবং এত মারাত্মক হবে তা কেউই অনুমান করতে পারেনি। যারা অনুমান করেছিলেন তারা অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে গেছেন। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অধিকাংশই গরীব-এদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয় টিউশনী করে। ফলে সে সময় বহু সংখ্যক ছাত্র জগন্নাথ হলে ছিল। যাই হোক, রাত বারোটার পর ইউ. ও.টি.সি-এর দিকের দেয়াল ভেঙ্গে পাক বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে জগন্নাথ হলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রথমেই মর্টার ছোড়ে উত্তর বাড়ির দিকে। সাথে সাথে অজস্র গুলিবর্ষণ শুরু হয়। উর্দু ও ইংরেজী মিশ্রিত ভাষায় আত্মসমর্পণ করে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। এরপর জগন্নাথ হলের অভ্যন্তরে শুরু হয় নারকীয় কান্ড। উত্তর ও দক্ষিণ বাড়ির প্রতিটি কক্ষ অনুসন্ধান করে ছাত্রদের নির্বিচার গুলি করে। এমনকি টয়লেটে, বাথরুমে, পায়খানায় ও ছাদে রক্ষিত জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে যেখানেই পাওয়া যায় লোকের সন্ধান সেখানেই চলে নির্বিচারে গুলি ও হত্যা। পশ্চিম দিকের টিনশেড অর্থাৎ পশ্চিম ভবন, ক্যান্টিন ও ক্যান্টিন সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ধরিয়ে দেয়া হয় আগুন। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা পালিয়েছিল; কিন্তু সর্বগ্রাসী আগুনের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতেই তাদের উপর শুরু হয় নির্বিচারে গুলি। ক্রমশ আক্রান্ত হয় জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বাসভবন। পাক বাহিনী মেরে ফেলে গোবিন্দ দেবকে এবং পালিত কন্যা রোকেয়ার স্বামীকে। পরে আক্রান্ত হয় জগন্নাথ হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার যেখানে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মুনীরুজ্জামান পুত্র ও আত্মীয়সহ নিহত হন। মারাত্মকভাবে আহত হন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। পাক মিলিটারী মধুসূদন দে'র (মধুদা) বাসা আক্রমণ করে হত্যা করে তার পুত্র, সদ্য বিবাহিতা পুত্রবধূ, স্ত্রী যোগমায়া-যিনি ছিলেন দশ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গুলিতে মধুদাও মারাত্মকভাবে আহত হন।

জঘন্যতম পদ্ধতি গ্রহণ করে পাক-বাহিনী পরবর্তী ঘটনার অবতারণা করে। পলায়িত ও আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে আসে এবং তাদের এইসব লাশ জগন্নাথ

হলের মাঠে জড়ো করার কাজে লাগায়। পাক-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এদের মধ্যে দু'একজন লাশ টানার কাজে যোগদান করেনি। কিন্তু অনেকেই রাইফেল ও বেয়নেটের নির্দেশে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। ছাত্ররা নিহত সহপাঠীর লাশ, কর্মচারীরা গোবিন্দ দেব, মুনীরুজ্জামান ও মধুদার লাশ টেনে হলের অভ্যন্তরে জড়ো করে। এই কাজ সম্পন্ন হয় মিলিটারীর পাহারায়। পরে যারা লাশ টানে তারা এবং বিভিন্ন স্থান হতে ধরে আনা লোকজনকে সারিবদ্ধ হবার নির্দেশ দেয় পাক-বাহিনী। এদের মধ্যে শিববাড়ির কয়েকজন সাধু ছিলেন। মুখে ছিল তাদের দাড়ি, পরনে গেরুয়া। অন্য একজন ছিল টুপি পরিহিত মুসলমান। কিন্তু মানবতা ও ধর্ম কোন জ্ঞানই ছিল না বর্বর পাক-বাহিনীর। লাইনে দাঁড়ানো ও সমবেত জনগণের উপর তারা চালালো মেশিনগান—এক নতুন লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক দৃশ্যের সূচনা হলো। দূরে বস্তিতে পালিয়েছিলো মহিলাগণ-যারা স্বজন হারানোর বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো। জগন্নাথ হলের বাতাস একটু জল ও পানির আহাজারিতে ভরে গেল। মরণ যন্ত্রণা ও প্রাণ বাঁচানোর এক করুণ দৃশ্য দেখা গেল।

কিছু সময়ের জন্য পাক-বাহিনী জগন্নাথ হল ও তৎসংলগ্ন এলাকা ত্যাগ করে। বস্তি হতে ছুটে আসে মহিলাগণ। বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকেন তাদের অনেকেই। যারা অপেক্ষাকৃত কম আহত ছিলেন তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কেউ কেউ নিজের চেষ্টাতেই পালিয়ে যান জগন্নাথ হলের মাঠ থেকে। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে পাক-বাহিনী বুলডোজার নিয়ে। একটা ছোট গর্ত করে ময়লা-আবর্জনার মত মাটি চাপা দেয় জীবিত-মৃত, আহত-নিহত সবাইকে। মাটি চাপা দেবার কাজটাও এত অবহেলার সাথে সম্পাদন হয়েছে, যে বহুসংখ্যক নিহত ব্যক্তির হাত-পা, মাথা ও দেহের অংশ মাটির উপরে ছিল। গণ-কবর হতে জেগে ওঠা মুষ্ঠিবদ্ধ হাত যেন স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রতীক। এর পর পরই পাক-বাহিনী হল এলাকা ত্যাগ করে।

২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলে সংঘটিত গণহত্যায় কতজন শহীদ হয়েছেন এর নির্ভরযোগ্য সংখ্যা নিরূপণ এবং তা গ্রহণ উভয়ই জটিল বিষয়। উল্লেখ্য, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের অফিস হয়েছিল লুণ্ঠিত, ফলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত নথিপত্রের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জগন্নাথ হল এবং নির্ভরযোগ্য কর্মচারীদের আন্তরিকতার জন্যই অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনতার পর জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধে জগন্নাথ হলের শহীদ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীর একটি তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস গ্রহণ করেন। গণহত্যার সাংখ্যিক বিবরণী সংগ্রহ সম্ভব না হলেও লোকমুখে শোনা তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এই তালিকার সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্নের অবকাশ ছিল এবং আছে। পরবর্তীকালে যখন শহীদ স্মৃতি ফলক নির্মাণ করার সময় স্বাধীনতা যুদ্ধে জগন্নাথ হলের শহীদ শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের প্রশ্ন ওঠে, তখন (১৯৭৪) তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অজয় কুমার রায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি জগন্নাথ হলের শহীদ ছাত্রদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগের জন্য চিঠি লেখেন, যার ফলে বহুসংখ্যক অভিভাবক তাদের সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করেন। অবশ্য কেউ কেউ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ করেন। অধ্যাপক অজয় রায়ের এই পত্র প্রেরণের পশ্চাতে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও জগন্নাথ হলের শহীদ ছাত্রদের সংখ্যা নিরূপণের প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান।

হলের শহীদ শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণীত হয়। এই তালিকাটিও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে সঠিক ছিল না। কেননা শহীদ সন্তানদের হারিয়ে কোন কোন অভিভাবক শরণার্থী হয়ে ভারত গমন করেন এবং বেশ দেরীতে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক রঙ্গলাল সেনের সময় প্রণীত তালিকায় শহীদ ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির প্রয়াস নেয়া হয় ১৯৮১ সালে জগন্নাথ হলের হীরক জয়ন্তী পালন উপলক্ষে বৃহৎ পরিসরে 'বাসন্তিকা' প্রকাশ করার প্রয়োজনে। এ সময়ই শহীদদের একটি বর্ধিত তালিকা 'বাসন্তিকা'র হীরক জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই তালিকাটিও সম্পূর্ণ তা এখনও প্রশ্নাতীত নয়। যা হোক সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কেবলমাত্র ৩৪ জন ছাত্র জগন্নাথ হলেই শহীদ হয়। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে স্বপন চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং গণপতি হালদার তার জন্মভূমি মঠবাড়িয়ায় পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য যে, গণপতি হালদার ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলে পাক-বাহিনীর আক্রমণের হাত হতে বেঁচে যায়। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, তাকে শেষ পর্যন্ত পাক-বাহিনীর হাতেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যে জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও সহকারী আবাসিক শিক্ষক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য শহীদ হন। হলের বাইরে থাকলেও গণহত্যার পর গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃতদেহ জগন্নাথ হলের গণকবরে পাক বাহিনী অমার্জনীয় অবহেলায় সমাহিত করে। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কণ্ঠদেশে গুলি লাগে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে মারা যান। কী আশ্চর্য! এরপরও ডঃ গুহঠাকুরতার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পাদন সম্ভব হয়নি। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী শোকাতুরা, বাক্যহীনা ও অসম্ভব অপ্রকৃতিস্থা বাসন্তী গুহঠাকুরতা বলতে পারলেন না কোথায় তাঁর স্বামীর পুণ্যদেহ। কন্যা দোলা বিদায় প্রণাম করতে পারলো না বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পিতাকে। গাড়ির ড্রাইভার হলেও অতি অন্তরঙ্গ গোপাল পেল না শেষ দর্শন। আজও কেউ জানে না কোথায় আছে ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার দেহাবশেষ। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী চিৎবল্লী ও জনৈকা রাজকুমারী দেবী তথ্য প্রদান করেন যে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গের কাছে সজনা গাছের নিচে খুব স্বল্প পরিসর গর্তে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে হাসপাতালের চিকিৎসকগণ চিরদিনের জন্য শুইয়ে রেখেছেন।

আমরা জগন্নাথ হলের শহীদ শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মোটামুটি একটা সঠিক সংখ্যা জানতে পারি । জগন্নাথ হলের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তিনজন, ছাত্র ৩৪ জন ও কর্মচারী ৪ জন ২৬শে মার্চই শহীদ হন। কিন্তু এছাড়া ছিল জানা-অজানা অনেক লোক। এদের খুব কম অংশই আমরা জানি। সকলের পরিচিত মধুদা (মধুসূদন দে) জগন্নাথ হলের মাটিতে মিশে আছেন। মিশে আছেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান তাঁর কয়েকজন নিকট-আত্মীয়সহ। দর্শন বিভাগের কর্মচারী খগেন দে ও তাঁর পুত্র মতিলাল দে-পিতাপুত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। গুলিতে দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যখন জগন্নাথ হলের মাঠে পিতা-পুত্র লুটিয়ে পড়েছেন তখন দু'শো গজ দূরে আর্ত চিৎকার করে উঠেছেন শহীদ খগেন দে'র স্ত্রী রেনুবালা দে। মারা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সুশীল চন্দ্র দে, বোধিরাম, দাসুরাম, ভীর রায়, মনিরাম, জহরলাল রাজভর, মন ভরন রায়, মিস্ত্রী রাজভর, শঙ্কর কুরী প্রমুখ। নির্মলেন্দু গুণ ২৮শে মার্চ জগন্নাথ হলে এসেছিলেন এবং তৎকালীন ঢাকার একাংশের একটি খন্ডচিত্র তাঁর এক কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কবি আবুল

হাশেম জগন্নাথ হলেই মারা যান, কেননা তাঁর মৃতদেহ জগন্নাথ হলের পুকুরে ভাসতে দেখেছেন তিনি। এছাড়া বহুসংখ্যক অতিথিও এই রাতে পাক-বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়েছেন যার প্রমাণ সাক্ষাৎকারদানকারীদের বক্তব্যে পাওয়া যায়। ভৈরব কলেজের হেলাল, বাজিতপুর কলেজের বাবুল পাল, জগন্নাথ কলেজের বদরুদ্দোজা, নেত্রকোনার জীবন সরকার, মোস্তাক, বাচ্চু ও অমর প্রমুখ ছাত্র ও অতিথিদের নাম সাক্ষাৎকারদানকারীদের নিকট হতে জানা যায় যারা ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলের গণহত্যার নির্মম শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এদের পরিচয় এইটুকুই-এর বেশী খুব একটা জানা যায়নি। অবশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে যে গণহত্যা হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। অন্যদিকে জগন্নাথ হলে গণকবর রচিত হয়েছিল যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জগন্নাথ হলের কাছাকাছি যত লোককে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রায় সবাইকে এনে গণকবরে সমাহিত করা হয় বুলডোজারের মাধ্যমে। শিববাড়ির সাধুদের ধরে এনে জগন্নাথ হলের মাঠে গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। আর একটা কথা বলা দরকার। জগন্নাথ হলে আসন সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাধ্য হয়েই ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে থাকতো। জগন্নাথ হলের কিছু সংখ্যক ছাত্র তখন রমনা কালীবাড়িতে থাকতো। ২৬শে মার্চ রমনা কালীবাড়িও পাক-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সেখানে নিহত হয় ৫/৬ জন জগন্নাথ হলের ছাত্র। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র অর্থনীতির ছাত্র রমনীমোহণ ভট্টাচার্য ব্যতীত আর কারো নাম জানা যায়নি। এমনি অনেক নাম-না-জানা লোক দিয়ে প্রথম বিক্ষিপ্ত লাশগুলো জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো করানো হয় এবং শেষে গণহত্যার সাক্ষীদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। সবশেষে রচিত হয় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-অতিথি ও জনগণের এক গণসমাধির শেষ সাম্য।

জগন্নাথ হলের গণকবর মহাপবিত্র স্থান। মানবতাবাদী দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, বিদগ্ধ পণ্ডিত মুনীরুজ্জামান, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মধুদা, ছাত্র, কর্মচারীর রক্তের সাথে মিশেছে শিববাড়ির গৈরিক বসনধারী কয়েকজন সাধু ও টুপি পরিহিত জনৈক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের রক্ত। উল্লেখ্য যে শিববাড়ির ৫ জন সাধুকে ধরে এনে জগন্নাথ হলের মাঠে হত্যা করা হয়েছে। অধ্যাপক নূরুল উল্লাহ্‌র ভিডিওতে এর চিত্র দেখা যায়।

সাক্ষাৎকারগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, উঠতে পারে সাক্ষাৎকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা দরকার যে একটা পরিকল্পিত গণহত্যার অংশবিশেষের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষাৎকারদানকারী তার বক্তব্য রেখেছেন। এখানে নিজেকে বড় বা অন্যকে ছোট বা দোষারোপ করার কোন সুযোগ নেই। ২৬শে মার্চ রাত হতে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন, হত্যা, মৃত্যু, পাক-সেনার গুলিতে আহত মৃত্যুপথযাত্রীর জলতৃষ্ণা, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও বাঁচার প্রচেষ্টা, স্বজনদের আহাজারি-তারই ছবি ধরা পড়েছে সাক্ষাৎকারদানকারীদের বক্তব্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এত অধিক সংখ্যক সাক্ষাৎকার নেবার প্রয়োজন কি ছিল ? ২৬শে মার্চ রাত ১২টার পর হতে ২৮শে মার্চ সকাল পর্যন্ত জগন্নাথ হল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় শতাব্দীর যে নিদারুণ, নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল-তা ছিল বিক্ষিপ্ত। ফলে এক বা দু'জন লোকের

পক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। এক একজন এক এক স্থান হতে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। কেউবা ২৮শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেবার পর ঘটনার শেষ অবস্থা লক্ষ্য করেছেন, কেউবা হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রীদের দেখেছেন এবং পরে জগন্নাথ হল এলাকা পরিদর্শন করেছেন অজানা আশঙ্কা বুকে নিয়ে। ফলে গোটা এলাকায় পাক-বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন হয়েছে বহুসংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারসমূহের একটি অংশ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলাকায় সংঘটিত গণহত্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি সন্নিবেশ করার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারসমূহও সংযোজন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। একইভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুযায়ী এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎদানকারীদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শী–যাদের এক অংশ শিক্ষক, এক অংশ ছাত্র এবং এক অংশ জগন্নাথ হলের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। তাছাড়া ২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেবার পর হল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে থেকে এসেছেন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি। সুতরাং এই অবস্থা দুটি বিষয়কে সাহায্য করেছে। প্রথমত, গণহত্যা সংঘটনের সময় এবং এর অব্যবহিত পরে উভয় সময়ই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, ঘটনার বিষয়ে কোন ধরনের অতিরঞ্জন পরিহার করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাত্র ও ব্যক্তির নাম পাই। সাক্ষাৎকার-দানকারিগণের একাংশ দূর হতে গণহত্যার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্য অংশ পাক-বাহিনীর নির্দেশে জগন্নাথ হলের বিভিন্ন বাড়ি ও জগন্নাথ হল সন্নিহিত এলাকা হতে মৃতদেহ বহন করে হলের মাঠে জড়ো করেছেন। সে পরিস্থিতিতে তাদের উপলব্ধি, বোধশক্তি ও চেতনা ছিল মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন। ফলে ছাত্র বা ব্যক্তি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তাদের ভাষ্যকে প্রশ্ন ছাড়া পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য সুপরিচিত ব্যক্তি গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যসহ কয়েকজনের ক্ষেত্রে এ ধারণা প্রযোজ্য নয়।

শোভা পাল খুব নিকট হতে দেখেছেন অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে। পাক-মিলিটারীর আক্রমণের ভয়ে শোভার মত অনেক মহিলা তাদের ছোট ছোট সন্তান-সন্ততিসহ আশ্রয় নিয়েছেন পুরানো এ্যাসেম্বলী ভবনের এ্যাসেম্বলী কক্ষে। শোভা লক্ষ্য করে ভোর হবার আগেই কাকে যেন বেঁধে জোর করে টেনে নিয়ে আসছিল পাক-সৈন্যরা। কিছুটা অন্ধকার থাকার জন্য ভাল করে বোঝা যায়নি। সকাল হতেই দেখা গেল ধুতি দিয়ে হাত দুটি পিছন মোড়া করে বাঁধা অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য উবু হয়ে বসে আছেন। পরনে একটা ছোট নিম্নবাস। অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের চোখ দুটো অসম্ভব লাল, সর্বাঙ্গে প্রহারের সুস্পষ্ট চিহ্ন। কী যেন বিড়বিড় করে বলছেন তিনি। শোভা পালের বক্তব্য, কেমন যেন হয়ে গেছিলেন তিনি–কতকটা বোধশক্তি রহিত অবস্থা। অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে এত নিকট হতে দেখার সৌভাগ্য হল শোভা পালের, কেননা ইতিমধ্যে পাক-মিলিটারী এ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করে এ্যাসেম্বলী কক্ষে সমবেত মহিলা ও শিশুদের ধরে এনে এ্যাসেম্বলীর সামনে জড়ো করে। তার একটু দূরেই হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে উবু করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে। উচ্চশিক্ষার্থে অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য যাবেন বিদেশে–সবকিছু তার ঠিক হয়ে রয়েছে।

আর সে সময় তাকে দিতে হল স্বাধীনতার মূল্য নিজের প্রাণ জল্লাদের হাতে। কিছুক্ষণ পরে অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও দারোয়ান সুশীলকে এ্যাসেম্বলী হতে দক্ষিণ বাড়ির দিকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কল্পনাতীত ঘটনাগুলো যখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছিল, তখন দেখা গেল জীবন ও মৃত্যুর সহ-অবস্থান। বাঁচার তীব্র আকাংক্ষা, জীবনের দুর্নিবার আশা মরণ-পথযাত্রীদের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করে। পাক সামরিক জান্তার গুলিতে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে অনেকে বেঁচে ছিলেন কিছু সময়। সামরিক বাহিনী সাময়িকভাবে জগন্নাথ হল ত্যাগ করার পর পরই কিছু লোককে দেখা গেছে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে। অধিকাংশই রোকেয়া হলের দিকে দৌড় দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। কিন্তু দৈহিক শক্তি তখন নিঃশেষিত। জগন্নাথ হলের মাঠের অপর প্রান্ত হতে লক্ষ্য করছেন ধনঝি। পলায়নরত ব্যক্তির পেট হতে বার বার পাকস্থলী বের হয়ে আসছিল, আর মাঝে মাঝে থেমে নিজেই তা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। তবুও শেষরক্ষা হল না, সামনে জগন্নাথ হলের দেয়াল-ততক্ষণে শক্তিও নিঃশেষিত। অবশেষে লুটিয়ে পড়লো দেয়ালের কাছে-বাঁচার শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের আশ্বাস। মৃত, অর্ধমৃত ও আহতদের যখন বয়ে এনে জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো করা হচ্ছিল তখন আহতদের অনেকেই জল দেবার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছিল। কিন্তু এই শেষ দাবী কর্ণগোচরে পৌঁছা মাত্র পাক-সৈন্যটি ঘুরে দাঁড়াল আক্রমণের ও কটাক্ষের অভীপ্সা নিয়ে। সজোরে মারতে লাগলো লাথি পানি প্রত্যাশাকারীর রক্তাক্ত থুতনির উপর। এরপর লাশ বহনকারীরা প্রতিবারই আহতদের কথা না বলতে এবং পানি না চাওয়ার অনুরোধ জানায় শুধু একটু আপ্তবাক্যে-পাক-বাহিনী চলে গেলেই তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশ্য পরে সে নিরাপদ আশ্রয় মিলেছে-সাম্যের শাশ্বত কেন্দ্রে, গণকবরে।

সাহসী অধ্যাপক নূরুল উল্লাহ। নিজের জীবনের নিরাপত্তাকে বাজি রেখে স্মরণাতীতকালের জঘন্য গণহত্যার প্রমাণ তিনি ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন তার ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে। জগন্নাথ হলের দক্ষিণ দিকে রাস্তার ওপারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক বাসভবন হতে অধ্যাপক নূরুল উল্লাহ বিজ্ঞানকে কাজে লাগান মানবেতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার ভিডিও সম্পাদন করে। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। অধ্যাপক নূরুল উল্লাহর নিকট মাত্র একটি ভিডিও টেপ ছিল-ফলে সব ঘটনা ধরে রাখাও ছিল না সম্ভব। তবে জগন্নাথ হলের মাঠে সংঘটিত গণ-হত্যাকান্ডের জীবন্ত প্রমাণ তাঁর ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। অকুতোভয় অধ্যাপক নূরুল উল্লাহ জীবন বাজি রেখে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ চিরদিন তা মনে রাখবে।সেলিনা হোসেন তাঁর আবেগমথিত "একাত্তরের ঢাকা" গ্রন্থে তথ্য দিয়েছেন যে, "তখন জগন্নাথ হলের ছাত্ররা গণকবর খুঁড়তে থাকেন সহপাঠীদের জন্য"। (সেলিনা হোসেন, একাত্তরের ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ২২) কিন্তু এ তথ্য সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে গণকবর দেবার ব্যবস্থা মিলিটারী জান্তা উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পন্ন করে। বুলডোজার দিয়ে গর্ত খুঁড়ে গণসমাধি দেয়া হয় জগন্নাথ হলের গণহত্যার শিকারদের।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে শোষণ, বঞ্চনা ও

গণহত্যার বিরুদ্ধে। ক্রমশ দেশব্যাপী দীর্ঘ নয় মাস পাক-বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন ও অমানবিক নারী নির্যাতনের খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১১ই মে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ তদন্ত কমিশনের উদ্যোগে জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণের গণকবর খনন করা হয়। খননকার্যের সময় সমস্ত পরিস্থিতি ছিল বিভীষিকাপূর্ণ। পূতি-দুর্গন্ধময় মানব দেহাবশেষ, ছিন্ন-ভিন্ন কাপড়, রাশি রাশি তামাটে চুল, অসংখ্য নরকঙ্কাল সব মিলে কল্পিত নরকের বাস্তব রূপ। এই খননকার্যের সময় বহু লোকের সমাগম ঘটে। অনেক স্বজনহারা একটু চিহ্ন বা পরিচয়ের আশায় এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও ভিড় জমায়। এখানে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণ ও বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা। উদ্ধারকৃত নরকঙ্কালগুলো জগন্নাথ হলের বর্তমান গণসমাধিস্থলে পুনরায় সমাধিস্থ করা হয় এবং তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রয়াত ফনীভূষণ মজুমদার সেখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেন। এ দুটি ক্ষেত্রই বর্তমানে জগন্নাথ হলের গণহত্যার শেষ নিদর্শন।

সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, দেশ এই গণহত্যার শিকারে ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য কিছুই করতে পারেনি। ভবিষ্যৎ উপার্জনকারী সন্তানকে হারিয়ে কোন কোন পিতা-মাতা হয়েছেন নিঃস্ব। স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে দেশের সমস্ত শহীদ পরিবারের জন্য যে ২০০০ টাকা প্রদান করেছিলেন তাছাড়া আর কোন সুবিধা তারা পাননি। বলা বাহুল্য তাদের খোঁজও কেউ নেননি। আমার সাথে যেসব শহীদ পরিবারের সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই সন্তান শহীদ হবার জন্য কোন অর্থ পেতে চান না। তারা চান একটু স্বীকৃতি এবং একটু আন্তরিক সহমর্মিতার ছোঁয়া। স্বাধীনতার বিশ বছর অতিক্রান্ত। এই বিশ বছরে এদের আর কোন খোঁজ নেয়া হয়নি। জগন্নাথ হলের গণহত্যার শিকার এসব শহীদদের জীবন ছিল আমাদের স্বাধীনতার বেদীতে প্রথম আত্মোৎসর্গ। জগন্নাথ হলের সবুজ চত্বরের ওপর ঢেলে দেয়া শহীদদের বুকের রক্তই যেন শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে আমাদের জাতীয় পতাকায়।

সাক্ষাৎকার

সুরেশ দাস
এ্যাডভোকেট, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

[সুরেশ দাস বর্তমানে সুনামগঞ্জে আইন ব্যবসা করছেন। তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী সুরেশ দাস ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলেই ছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির (শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ভবন) ছাদের উপর আশ্রয় নেন। তার সঙ্গে ছিল অনেক সতীর্থ। একমাত্র সুরেশ দাস ব্যতীত আর কেউই পাক–বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের হাত হতে রক্ষা পায়নি। সুরেশ দাস আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেছেন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে।]

১৯৬৬ ইংরেজীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হই। ১৯৬৭–৬৮ সালে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ হল শাখার সভাপতি নির্বাচিত হই। ১৯৬৮–৬৯ সালে আমি জগন্নাথ হল সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক ছিলাম। গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭০–এর নির্বাচনে ঐতিহাসিক মহান ১১–দফার পক্ষে যখন পূর্ব বাংলার জনগণ রায় দেয় তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের বেলায় টালবাহানা আরম্ভ করে। ১লা মার্চ তৎকালীন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়। এ সময় হতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে এই উদ্দেশ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আমরা সংগঠিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করি। পরবর্তীকালে আপোস মীমাংসা চালানো হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হলে শুরু হয় বাঙ্গালী নিধন। ২৩শে মার্চ ছিল প্রতিরোধ দিবস। ২৪শে মার্চ পল্টনে ছিল মৌলানা ভাসানীর জনসভা।

২৫শে মার্চ বিকালবেলা আমি গুলিস্তানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময় গুজব শোনা যায় সামরিক আইন জারী হবে। বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী হানা দেবে। সন্ধ্যার সময় পায়ে হেঁটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পিছনে 'পপুলার হোটেলে' খাওয়া–দাওয়া করে কলেজ হোষ্টেলের ভিতর দিয়ে আসার সময় ৪র্থ পর্বের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ডঃ কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে জগন্নাথ হলে যেতে নিষেধ করলেন। আমি নিজে কল্পনাও করিনি এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আমি তাড়াতাড়ি জগন্নাথ হলে গেলাম। আনুমানিক রাত ১০টা। শহরে নানাস্থানে ব্যারিকেড ছিল এবং থমথমে ভাব ছিল। জগন্নাথ হলের গেটের সামনে মৃণাল বোস, জীবন সরকার, সত্যরঞ্জন দাস, অমর দাস, উপেন্দ্র রায় (অনেকের নাম মনে নেই) এবং দারোয়ান দুখীরাম দাঁড়ানো। তারা সবাই উৎসুক হয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে জানার জন্য আমাকে প্রশ্ন করতে

থাকে। আমি সবাইকে নির্ভয়ে হলের ভিতর যাওয়ার জন্য বললাম। ভিতরে কিছু আলাপ-আলোচনা করে আমরা স্ব-স্ব রুমে গিয়ে শুয়ে থাকি। আমি উত্তর বাড়ির উত্তর দিকে ২য় তলায় ১৫২ নং রুমে থাকতাম। আমার সংগে ছিল নরসিংদির শিবপুরের সত্যরঞ্জন দাস। আমরা উৎকণ্ঠা ও মানসিক ক্লান্তিতে থাকায় আনুমানিক রাত ১১-৩০মিঃ শুয়ে পড়ি। ভৌতিক শব্দ শুনে হঠাৎ ঘুম হতে জেগে উঠি। তখন আনুমানিক রাত্রি ১২-৩০ মিঃ। লক্ষ্য করলাম উত্তরের জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে রুমের ভিতরে অনবরত পড়ছে। ফলে আমরা উভয়ে নিজ নিজ খাটের নিচে শুয়ে পড়ি। কিন্তু শব্দের তীব্রতা না কমায় উভয়ে ছাদের উপর আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠি। ছাদে গিয়ে আরো ৮জন ছাত্রকে পাই। তাদের মধ্যে মৃণাল বোস, জীবন সরকার, রবীন সাহা, উপেন্দ্র রায় (অন্যদের নাম মনে নেই) ছিল। আমরা সকলে মিলে পানির ট্যাঙ্কের নিচে শুয়ে পড়ি। কিন্তু চতুর্দিকে নিদারুণ হাহাকার ও গুলির শব্দে আমরা ছিলাম সন্ত্রস্ত। হলের মাঠে কমপক্ষে দুশো পাক-সৈন্য এবং একটি ট্যাঙ্ক ছিল। হানাদার বাহিনী হলের শহীদ মিনারটিও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ছাদের উপর আমরা আছি কিনা তা জানার জন্য আলোর বুলেট ছুঁড়ত হলের চতুর্দিক দিয়ে হানাদার বাহিনী। রাত আনুমানিক ৪-৩০ মিঃ। হলের গেট ভাঙ্গার শব্দ শুনি। গেটের পাশের রুমে দারোয়ান দুখীরামকে পাক-সৈন্য গুলি করে হত্যা করে। হানাদার বাহিনী হলের নিচতলার রুমে আক্রমণ করেও অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের বাদল এবং হরিধন দাস হলের পুকুরের পানির নিচে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। হানাদার বাহিনী প্রত্যেক রুমে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম তলায় হানাদার বাহিনী রুমে রুমে আগুন দেয়। ২৭শে মার্চ বাথরুমে শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী ও তাহার বন্ধু মোস্তাকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাদরে শরীর ছিল ক্ষতবিক্ষত। অনুমান করা যায় তাদের বেয়নেট দিয়ে মারা হয়েছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর হলে ছাত্র কম ছিল। ২য় তলায়ও কোন ছাত্র না পেয়ে রুমে রুমে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভোর আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটে ৭ জন হানাদার সৈন্য ছাদের উপরে ওঠে। রাইফেল উঁচিয়ে আমাদেরকে দাঁড়ানোর জন্য বলে। আমরা ১০ জন হাত তুলে দাঁড়াই। তখন পাক-সৈন্যরা আমাদের শরীর তল্লাশী করে। প্রথমে দশজন হতে তিনজনকে একটু দূরে নিয়ে ফল ইন করায়, অর্থাৎ একজনের পিছনে আর একজনকে দাঁড় করায়। এ সময় একজন সৈন্য রাইফেল দিয়ে গুলি করে এবং এতে সবাই মারা যায়। এ লাইনে চট্টগ্রামের রবিনও অমর (আর একজনের নাম মনে নাই) ছিল। তারপর অপরাপর সাতজন হতে তিনজন নিয়ে অনুরূপভাবে গুলি করে। এ লাইনে নেত্রকোনার জীবন সরকার (অন্য দু'জনের নাম মনে নাই) ছিল। বাকি চারজনের মধ্যে উপেন্দ্র চন্দ্র রায় ছাদ হতে লাফ দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে পড়লে সংগে সংগে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। মৃত অবস্থায় সে মাটিতে পড়ে। বাকী ছিলাম আমরা তিনজন। আমি, মৃনাল বোস (মুকুল বোসের বড় ভাই) এবং সত্যরঞ্জন দাস। আমাদের তিনজনকে হত্যা করার পূর্বে পাক-সেনারা "বাংলাদেশ খালি কর দেগা" "বাংলাদেশ শহীদ মিনার পিয়ার করতা হায়", "ঘরমে ঘরমে শহীদ মিনার লাগাতা হায়" ইত্যাকার মন্তব্য করতে

থাকে। আমাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানোর সময় সর্বপ্রথমে ছিলাম আমি, পরে সত্যরঞ্জন এবং শেষে মৃনাল বোস। গুলি করার পূর্ব মুহূর্তে মৃণাল বোস লাইনে থেকে সরে দাঁড়ালে তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে সামনে নেয় এবং আমার পিছনে থাকা সত্যরঞ্জনও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মৃণাল বোস প্রথম, দ্বিতীয় সত্যরঞ্জন এবং সবশেষে আমি। সত্য ও মৃণাল উভয়েই আমার চেয়ে একটু লম্বা ছিল। এমন সময় একজন পাকসেনা আমাদেরকে গুলি করে। শুধু রক্তিম আভা বুঝলাম, এরপর কিছুই বলতে পারি না। অনুমান মিনিট দুই পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। চেয়ে দেখি হানাদার বাহিনীর লোকজন ছাদের উপর পানির ট্যাঙ্কের ভিতর কিছু আছে কিনা তা অনুসন্ধান করছে। আমার বুক তখন রক্তাক্ত এবং ডান হাত অবশ, চিৎ হয়ে পড়ে আছি ছাদে। সংগে সংগে মরার ভান করে পড়ে থাকি। সকাল ৭-৩০মিঃ হানাদার বাহিনী ছাদ হতে নিচে নেমে আসে এবং বলে "সব শালা খতম হো গিয়া"। এ সময় তারা একটা গুলি করে যা ছাদের উপর পড়লে ইট-সুরকি আমার পায়ের পাতায় ঢুকে যায়। পাক-বাহিনী ছাদের উপর হতে নেমে গেলে সবাইকে মৃত অবস্থায় দেখি। ছাদের উপর ৯ জনের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম অর্ধমৃত। প্রাণে বাঁচার জন্য আমি হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা চালাই। ঠিক এমন সময় দু'জন হানাদার বাহিনী আবার ছাদের উপর ওঠে। আমাকে আহত রক্তাক্ত এবং চলন্ত অবস্থায় দেখে '*ঠের*' বলে আদেশ দেয়। আমি তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনে বাম হাতের উপর মাথা রেখে পিঠে আর একটি গুলির অপেক্ষা করছি। কিন্তু হানাদার বাহিনী ২৩শে মার্চের প্রতিরোধ দিবসের কালো এবং বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা দুটি পানির ট্যাংকের উপর হতে নামিয়ে মৃতদেহের রক্তের উপর ফেলে ছাদ হতে নেমে যায়। নামার সময় আমাকে পিঠের উপর দুটো লাথি মারে। পরে বহু কষ্টে আহত অবস্থায় আমি ছাদ হতে নেমে প্রথমেই হলের পশ্চিম দিকে ১৪৯নং রুমে প্রবেশ করি। কারণ ঐ রুমটাই ছিল অক্ষত। সম্পূর্ণ হল ধোঁয়ায় অন্ধকার। রুমে প্রবেশ করে আমার রক্তাক্ত লুঙ্গি এবং শার্ট খুলে পায়ের নীচে দেই। কারণ আগুনে সম্পূর্ণ হলটিই এমন গরম হয়ে গেছে যে, দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পাই আমাদের হলের কর্মচারীদের টিনশেডের ঘরে ফরিদপুরের কৃষ্ণগোবিন্দ সাহা হলের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর সাথে আমার চোখাচোখি হয়। ঐ সময় আমার প্রবল ইচ্ছা হয় যে এই টিনশেডের ঘরে আশ্রয়প্রার্থী হই এবং ঘটনার কথা তাকে বলি। তাই জানালার পাশে শেডে দাঁড়িয়ে পানি সরবরাহের পাইপটি বেয়ে নিচে নামি। এই সময় বাম হাতে খুব ব্যথা অনুভব করি। ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে নালায় নেমে ঐ টিনশেডের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেই। কিন্তু দরজা না খোলায় পাশের আর একটি টিনশেডের দরজায় ধাক্কা দেই। তখন হলের রেষ্টুরেন্টের মালিক সুধীরদার ছোট ভাই দরজা ফাঁক করে আমাকে দেখে দরজা খুলে দেয় এবং আমি দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি। এ সময় বেলা আনুমানিক ১০টা হবে। এরপর মেঝের উপর শুয়ে শুয়ে সারাদিন ও রাত কাটাই। পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ সকাল আনুমানিক ৭-৩০ বা ৮ টার সময় মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় "কারফু উঠ্ যায় গা"। এই ঘোষণার পর ঘর হতে বের হয়ে প্রথমেই ডঃ রঙ্গলাল সেনের বাসায় যাই।

পুনরায় হলের দিকে ফিরে আসি। এমন সময় পরিমল গুহ আমাকে সাহায্য করে এবং হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে আমি হলে ঢুকে আমার রুমে যাই। দেখি রুমটা ধ্বংস হয়ে গেছে। সিঁড়ি রক্তাক্ত এবং দারোয়ান দুখীরামকে তার কক্ষে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখতে পাই। হলের মাঠে ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ মনিরুজ্জামান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মধুদা ও অন্যান্য ছাত্রদেরকে হানাদার বাহিনী গণকবর দেয়। হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য্যকেও হত্যা করা হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পর শেখর চন্দ (দক্ষিণ বাড়িতে থাকত) এবং ডঃ জ্যেতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে আহত অবস্থায় দেখি। ডঃ জ্যোতির্ময়গুহ ঠাকুরতা হাসপাতালে মারা যান। হাসাপাতালে ডাঃ রাব্বী এবং ডঃ মোশারফ সাহেব আমাকে দেখে 'ভাল হয়ে যাবেন' বলে উৎসাহ দেন। এ সময় আমার বন্ধু বকশী বাজারের জামাল আনোয়ার শান্তর বোন ডঃ শিরিন যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। যখন হাসপাতাল আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন আমাকে শান্তিনগরে আনোয়ারুল হক এ্যাডভোকেট সাহবের বাসায় যাওয়ার জন্য বর্তমান কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা অজয় দাসগুপ্ত ইঙ্গিত দিলে ছদ্মবেশে শান্তিনগর যাই। সেখানে আমার বন্ধু কামাল হায়দার, আব্দুল মোনায়েম সরকার এবং নির্মল বিশ্বাসকে পাই। ঐখানে কয়েক দিন থেকে আমিও নির্মল বিশ্বাস মীরপুর, ধামরাই, কালিয়াকৈর হয়ে মির্জাপুর হাসপাতালে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করি। সেখান থেকে শক্তিপদ ঘোষ, নির্মল বিশ্বাস ও আমি পাথরঘাটা, হাতিয়া, নলুয়াগড়, মল্লিকবাড়ি, কাটাজোয়া হয়ে ভালুকা থানায় আসি এবং পরের দিন ভালুকা হতে ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ হয়ে নেত্রকোনায় আসি। পরে সেখান হতে নিজ বাসস্থান সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানায় এসে পৌছি। পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

তপন বর্ধন
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
মৌলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ,
কাগমারী, টাঙ্গাইল।

[ইংরেজী সাহিত্যের তৎকালীন ছাত্র তপন বর্ধন গণহত্যার মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন। জগন্নাথ হলের গণহত্যার হাত হতে মুক্তি পেয়েও আশ্রয় জোটেনি তার শিক্ষকের বাসায়-এমনি দুর্ভাগ্য ছিল সেদিন তার।]

অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে আমি হলেই ছিলাম। সম্মান পরীক্ষার ছয় পেপার শেষ হল। ১লা মার্চের ইয়াহিয়া খানের ভাষণে বাঙালীর লালিত স্বাধীনতা স্পৃহা অগ্ন্যুৎপাতের মত বিস্ফোরিত হল। আমি নিজে ছাত্র রাজনীতিতে সামান্য জড়িত

ছিলাম এবং আন্দোলনের সবকিছু প্রত্যক্ষ করার একটা প্রবল আকাংক্ষা পোষণ করতাম।

২রা মার্চ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, ৬ই মার্চ টিক্কা খানের গভর্নর হিসাবে নিযুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর সকলের মনেই ধারণা হয় যে, দেশে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অধিকাংশ ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে গেল। কেবল শুধুমাত্র কিছু অতি উৎসাহী এবং যারা প্রাইভেট ছাড়তে নারাজ এমন ছাত্র হলে থেকে গেল। বাণিজ্যের ছাত্র কুমিল্লার নীহার মজুমদারকে ৭ই মার্চ সকালে চলে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে অনুরোধ করলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে যেতে। সে আমাকে টিক্কা খান সম্পর্কে জানালো যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে নৃশংস এই জেনারেল বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতের উপর বোম্বিং করেছে এবং সেদিন অনুষ্ঠিতব্য জনসভায়ও বোম্বিং করতে পারে। সে আমাকে হল ছেড়ে বাড়ি যেতে সুপারিশ করলো।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর আন্দোলনের কিছু গুণগত পরিবর্তন হয়। আন্দোলন এখন আর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল স্তরের জনগণের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ধীরে ধীরে জঙ্গীরূপ নিতে থাকে। খাওয়ার সময় ছাড়া খুব কম সময়ই আমি হলে অবস্থান করতাম। বিভিন্ন জনসভা ও মিছিলে অংশ নিতাম। মুজিব–ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালীন সময় আমি ২/১ দিনের জন্য বাড়ি যাই। সেখানে আমার গ্রামের যুবকরা আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার মা, বাবা, সবাই ঢাকা আসতে বারণ করেন, কিন্তু ঢাকায় কি ঘটছে আর ২৫শে মার্চ আসন্ন সংসদ অধিবেশনের দিন আরও কিছু ঘটতে যাচ্ছে এরূপ একটা কৌতূহল আমার মধ্যে প্রবল হতে থাকে। ঢাকায় ফিরে এসে জগন্নাথ হলকে অনেকটা ভুতুড়ে বলে মনে হলো। প্রায় সব ছাত্রই বাড়ি চলে গেছে। আনুমানিক ৪০/৫০ জন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা ঐ প্রকাণ্ড হলটিতে অবস্থান করছে।

মুজিব–ইয়াহিয়া বৈঠকে কোনরূপ অগ্রগতি না হলে উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান দিয়ে জঙ্গী মিছিল বের করে। জগন্নাথ হলের মাঠে ছাত্রলীগের অতি–উৎসাহী স্বেচ্ছা–সেবকরা গেরিলা যুদ্ধের মহড়া দিতে শুরু করে। এ থেকেই হয়ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধারণা জন্মে যে জগন্নাথ হলে অস্ত্রের বিরাট মজুত গড়ে উঠেছে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সর্বত্র বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী সৈনিকরা পল্টন ময়দানে গেরিলা যুদ্ধের মহড়া দেয়। সেখানে ছাত্রলীগের এক প্লাটুন গেরিলাও অংশগ্রহণ করে ছাত্রলীগ নেতা চিশ্‌তী শাহ্ হেলালুর রহমান (২৫শে'র রাতে জহুরুল হক হলে শহীদ) এর নেতৃত্বে। আমিও সেই প্লাটুনের সদস্য ছিলাম। ঐ রাতে ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরী (পরবর্তীতে গেরিলা যুদ্ধে শহীদ) তার বোনের অসুখের কথা বলে তার বাড়ি চট্টগ্রামে চলে গেল। পরে জানতে পারি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের বিশেষ দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল।

২৫শে মার্চ সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করি। হলের কিছু ছাত্র ঐদিনও বাড়ি চলে যায়। ঐদিন বিকালে বায়তুল মোকাররমে ছাত্রলীগের এক জঙ্গী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবশ্য আসন্ন বিপদের কথা জনসাধারণকে জানানো হয়নি। রাতে শহরের লোকের মধ্যে বেশ গুঞ্জন–কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের

ব্যাপার এই যে জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকরা ঐ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও রহস্যজনক বলে মনে হয়। রাত ৮টার দিকে হলের ডাইনিং বন্ধ থাকায় 'হোটেল কাফেরাজে' খেতে যাই। সেখানে রেডিওতে জানতে পারি ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেছে। হলে ফিরে ইংরেজী বিভাগের ছাত্র কার্তিক শীল ও পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র নিরঞ্জন হালদারের (উভয়েই নিহত) সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে নিজ কক্ষে (উত্তর বাড়ির ১১৯ নম্বরে) ক্লান্ত দেহখানা বিছানাতে এলিয়ে দেই। পূর্বদিকের জানালা খোলা ছিল। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস ক্লান্ত দেহখানাকে শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অবশ করে দিল।

রাত আনুমানিক ১২টা বা ১২-৩০টা। পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র দেবী নারায়ণ রুদ্র পাল (বর্তমানে জয়দেবপুরে ধান গবেষণায় নিয়োজিত) আমাকে ডাক দেয়। আমি অতি তাড়াতাড়ি ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে আসি। ও আমাকে জানালো হল রেইড হতে পারে। রেইড শব্দটি আমাদের কাছে বিশেষ ব্যঞ্জনায় পরিচিত। আয়ূবী-মোনেমী আমলে এন,এস, এফ, এর পাণ্ডারা হকিষ্টিক ও ছুরি নিয়ে মাঝে-মধ্যে হল রেইড করতো। রেইড মানে যে নির্বিচারে নিরপরাধ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীকে অকুস্থলে হত্যা করা হবে তা আমরা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি। নীচে নেমে দেখি মৃণাল বোস, সুশীল, গণপতি, সুরেশ দাস আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে।

মৃণালদা আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তিনি সদ্য এম. এ পাস করে হলেই থাকতেন। তার সার্টিফিকেটগুলো আমার কাছেই ছিল। তিনি বললেন, সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে পরের দিন বাড়ি যাবেন। এরই মধ্যে চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে লাগল। আমরা ইকবাল হল অভিমুখে রওয়ানা হলাম নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে কিছু জানার জন্য। ততক্ষণেই ঐ হলে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়েছে। এখন হলে (যেখানটায় স্মৃতিসৌধ ঐখানটায়) দাঁড়িয়ে আমরা প্রভোষ্টের এর বাসায় যাবার কথা বলাবলি করছি। এমনি সময় অতর্কিত মাঠের পূর্বদিক থেকে ইউ. ও. টি. সি. অফিসের কাছাকাছি এলাকা থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হলের উপর আক্রমণ করা হল। বিকট আওয়াজে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিই। অধিকাংশ ছাত্র প্রধান ফটক দিয়ে হলের ভেতরে প্রবেশ করে। আমি ও সীতানাথ (হলের কর্মচারী) পুকুরের পার দিয়ে দৌড়ে সীতানাথের কোয়ার্টারে ঢুকি। একটু পরে এম. এড-এর ছাত্র বিকাশ এবং আরও পরে রত্ন কেতন বড়ুয়া ঐ ঘরে আসে। এতক্ষণে হলের পশ্চিম পার্শ্বে গোলাগুলির শব্দ আরও নিকটে মনে হলো। মনে হলো আমরা চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গেছি। বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই। মুহূর্তে মা-বাবার কথা মনে পড়ল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। হলের পূর্ব দিক থেকে মাইক্রোফোনের ঘোষণা-''সারেণ্ডার, সারেণ্ডার, অর ইউ উইল ডাই''। ওদের ধারণা ছিল জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল থেকে প্রতিরোধ হতে পারে। বোধ হয় তাই ওরা মর্টার ও মেশিনগান ব্যবহার করেছে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। পাক-সেনারা বিনা বাধায় ঢুকে যায় হলে। শুরু হলো ওদের তাণ্ডব। আমি ঘরে বন্দী থেকে ওদের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিনি। তবে ওদের অট্টহাসি ও ছাত্রদের আর্ত চিৎকার সব কিছু আন্দাজ করছি। ওরা রুমে রুমে, বাথরুমে, কার্নিশে ছাত্রদের খুঁজতে থাকে। কোন ছাত্রকে পেয়ে গেলে ওরা পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করতো, 'ওস্তাদ, চিড়িয়া মিল গিয়া'। তার পরেই শুনতে পেতাম অসহায় বন্ধুর তীব্র চিৎকার।

এভাবে চলতে থাকে ওদের নরমেধযজ্ঞ। পশ্চিমদিকের রাস্তায় ছাউনি ফেলে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে ওরা সারারাত গুলি ছোড়ে। ক্রমে ভোরের আভাসে ভয়ার্ত পাখিকুলের কিচির মিচির শব্দ কিছুটা অস্বাভাবিক লাগল। মসজিদ থেকে ভেসে এল আযানের ধ্বনি। মনে করলাম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জেহাদে রত ওরা হয়তো বা নামাজের সময় কিছুক্ষণের জন্য ওদের তাণ্ডব বন্ধ রাখবে। কিন্তু ওদের পৈশাচিকতার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। আমাদের ঘরের দোরে বুটের আওয়াজ পেলাম। সীতানাথ, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আমাদের উপস্থিতিতে আরও অসহায় বোধ করল। ওদের ধারণা ছাত্রদের জায়গা দেয়াতে ওদেরও জীবন যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কেউবা চৌকির নিচে ঢুকে পড়ল, কেউবা ভয়ে কাপড়ে পায়খানা পেচ্ছাব করে ফেললো। ঘরের জানালাগুলি ছিল পুরনো কাচের। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখি হলের ছাদে সেনাবাহিনীর লোক। তিনজন সৈনিক স্টেনগান তাক করে কয়েকজন ছাত্রকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে মৃণাল বোসকে চিনতে পারি। সৈন্যরা চিৎকার করে আদেশ দিল, "জয় বাংলা বাতাও"। ছাত্ররা মাথার উপর হাত উঠিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম শুষ্ক কণ্ঠে ক্ষীণ উচ্চারণ "জয় বাংলা"। মুহূর্তে এক ঝাঁক গুলি ওদের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে গেল শূন্যে। ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল প্রাণহীন দেহগুলি। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম কারো কারো হাত–পা ছোড়াছুড়ি ও মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর দেহগুলির গোংগানি। সৈন্যরা ওদের মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করছিল। তারপর ওদের পা ধরে ছুড়ে ফেলে দিল নীচে। এ দৃশ্য দেখে আমি জীবিত কি মৃত তা অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। সকলের চোখেমুখে মৃত্যুর ভয়াতঙ্ক। আমরা পরস্পর ক্ষমা চাইলাম। এমনি পরিস্থিতিতে সীতানাথের স্ত্রী আমাদের চা বানিয়ে দিল। সীতানাথ এই বলে আমাদের চা দিল যে বোধ করি এই আমাদের শেষ খাবার।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল। গোলাগুলির শব্দ ক্রমশ কমে আসল। ঘরে বন্দী অবস্থায় আন্দাজ করলাম রেস–কোর্স এলাকা থেকে বেশ বিরতিতে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি করছিল। দু'জন অনাথ বালক, যারা হলের ছাত্রদের ফরমাশ শুনে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা আনুমানিক ১২টার দিকে এসে আমাদের বলল–"বাবু,মিলিটারী হল থেকে চলে গেছে। আপনারা এখনই হল থেকে চলে যান। ওরা আমাদের বলেছিল ছাত্রদের খুঁজে দিতে। মৃণাল বাবু, সুশীল বাবুদের মেরে ফেলেছে। হলের সামনে শত শত লাশ সারি করে শুইয়ে রেখেছে"। আমরা এক এক করে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বার হয়ে ডাইনিং হলের পাশ ঘেঁষে হলের গেট অব্দি গিয়ে দেখি অসংখ্য লাশ হলের সামনে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। আমার সংজ্ঞা লোপ পেতে বসল। মুহূর্ত দেরী না করে দৌড় দিলাম। প্রতি মুহূর্তের আশংকা এই বুঝি ধরা পড়লাম, গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠে শায়িতদের মত বুঝি লাশে পরিণত হলাম। এক লাফে পাঁচ হাত উঁচু পাঁচিল পার হয়ে তৎকালীন শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মতিউর রহমান সাহেবের বাসার ড্রইং রুমের সোফায় বসে পড়লাম। আমার পেছনেই এল রত্ন কেতন বড়ুয়া। আমাদের বয়েসী দু'জন ছেলে এসে আমাদের সহানুভূতি জানাল। শরীরচর্চা শিক্ষক এসে আমাদের তৎক্ষণাৎ চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি জানালেন যে, রাতে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা ঘেরাও করা হতে পারে এবং সেখানে থাকা আমাদের মোটেই নিরাপদ নয়। আমরা জল খেয়ে উপর তলার সমাজবিজ্ঞানের জনৈক শিক্ষক সাহেবের বাসায় ঢুকে

পড়লাম। তিনিও আমাদের অনুরূপ কথা বলে বিদায় দিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজতে আবার দৌড় দিলাম। উদয়ন স্কুলের একটা খালি রুমে আশ্রয় নিলাম। এবার কেউ বাধা দিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানেই রাত কাটাবার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাক সেনাদের চলাচল আবার বৃদ্ধি পেল। ট্যাংকের চলাচল অনুভব করলাম। জগন্নাথ হলের মাঠে বুলডোজার দিয়ে লাশ কবর দেয়ার কাজ তখন চলছিল। হলটিতে তখনও আগুন জ্বলছিল। এখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া দেখে জাতির ওপর আরোপিত ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আশংকায় মুষড়ে পড়লাম।

চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আমরা অভুক্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতে থাকি। রাত গভীর হতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। স্কুল সংলগ্ন মুদি দোকানদার নিজ হাতে মসুরী ডাল ও আলু সিদ্ধ তৈরী করে ভাত খাওয়ালো। সেদিনের খাওয়ার তৃপ্তি ছিল পরিপূর্ণ ও অভাবনীয়। ওখানেই অতি কম ভলিউমে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনতে পেলাম। এখনো তার ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাষা আর কর্কশ কণ্ঠ স্মরণে এলে বিরক্তি ধরায়। রত্ন কেতন বড়ুয়া ও আমি যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা পালাক্রমে ঘুমাব। বেঞ্চে উভয়েই শুয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে ওদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। মাঝে মাঝে ট্যাংকের চলাচল, বিকট ও তীব্র শব্দ আমাদের আতংক ও ভীতি বৃদ্ধি করে। দু'জনের আলাপচারিতার মুখ্য উপাদান ছিল নিহত ও নিখোঁজ বন্ধুরা। রাত পোহালে আরেকটি দিন দেখার সৌভাগ্য হল।

সকালে ভারতীয় রেডিও'র খবরে জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় প্রাণে যেন মুক্তির উন্মাদনা সৃষ্টি হল। কারফিউ তোলা হলে আমরা দু'জন ধীরে ধীরে আবার হলের দিকে এগিয়ে যাই। পথে ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ সুরেশ দাসের নিকট জানতে পারি কোন কোন বন্ধুর মৃত্যুর খবর। হলে ঢুকেই দারোয়ানের ঘরে দেখতে পাই দারোয়ানের মৃতদেহ আগুনে পুড়ছে। জনৈক ছাত্র অশ্রুনয়নে মৃতদেহ সৎকার করছিল। আমার ১১৯ নং কক্ষ ছিল তিনতলাতে। এগিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় রক্তের বিরাট আল্পনা দেখতে পাই। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে উপর থেকে ছাত্রদের ফেলা হয়েছিল। লাশ টেনেও নামানো হয়। সমস্ত সিঁড়ি রক্তে রঞ্জিত ছিল। অনেক কক্ষে রক্তের আলপ্না। বাথরুমে পালানো ছাত্রদের ওখানেই হত্যা করা হয়। প্রত্যেকটি বাথরুমকে কসাইখানা বলে মনে হয়েছিল। আমার কক্ষটি অক্ষত ছিল। প্রয়োজনীয় কিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। যেখানে অসংখ্য লাশের গণকবর হয়েছিল, বুলডোজারের চাপে সেখানটা ছিল খানিকটা নীচে। রক্ত উপরে উঠে জমাট ধরায় পুকুরসদৃশ মনে হয়। অনেক লাশের হাত–পা বাইরে থেকে দেখা যায়। কোন কোন লুঙ্গি ও শার্ট আমি সনাক্ত করতে পেরেছিলাম। মুহূর্ত দেরী না করে এগিয়ে যাই রাস্তার দিকে। পুকুরের পাড়ে কতিপয় লুঙ্গিপরা ছোরা হাতে বিহারী যুবকের সাথে দেখা। ওরা আমাকে কিছু বলেনি। যমপুরী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলে মনে পড়ল বঙ্গবন্ধুর কথা–"রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এবং এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম''।

হরিধন দাস
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

[পদার্থবিদ্যার ছাত্র হরিধন দাস। জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির মধ্যে পাকবাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী। তার বর্ণনা হৃদয়বিদারক, উপস্থাপনা জীবন্ত।]

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। জগন্নাথ হল। হলে তখনও শতাধিক ছাত্র এবং কয়েকজন অতিথি অবস্থান করছেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত। তাই দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্ররা হল ত্যাগ করতে পারছে না। ২৩শে মার্চের মুজিব–ইয়াহিয়া আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত। হলের ছাত্ররা শংকিত। কিন্তু ঢাকা শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। মাত্র কিছুদিন আগে আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা হয়নি। আমি শেষ বর্ষ সম্মান পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র। জগন্নাথ হলের উত্তর ভবনের ২৯নং কক্ষে থাকি। সুশীল কুমার দাস, নতুন তৃতীয় বর্ষ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র। সে হল সংসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক। বাড়ি ছিল বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর। মিতভাষী ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল বিশেষত রাজনৈতিক কারণে। দুজনেই ছাত্রনেতা মৃণাল বোসকে খুঁজছিলাম। কারণ মৃণালদা সকালেই শেখ সাহেবের বাড়িতে গেছেন। হলে এমন গুজবও শোনা গেল যে বঙ্গবন্ধু মৃণালদাকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। মৃণাল কান্তি বোস। অর্থনীতি শেষ পর্বে উত্তীর্ণ। তাকে না পেয়ে চলে গেলাম ইকবাল হলে (বর্তমানে জহুরুল হক হল) । বন্ধুদের দেখা পেলাম না। ইকবাল হল ও এস. এম. হলে ছাত্র নেই বললেই চলে। সন্ধ্যার দিকে হলে ফিরে আসি। ছাত্রনেতারা তখনও হলে ফেরেন নাই। হলে হাজী আছমত কলেজের দুজন ছাত্র শেখর চন্দের অতিথি হিসাবে আছেন। তাদের সাথে দেখা হল। হলে গুজব চলছে যে ছাত্রনেতাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। আমার এলাকার ছাত্রদেরকে খোঁজ করি। উদ্দেশ্য একযোগে হল ত্যাগ করা। আমার বাড়ি নরসিংদীর নিকটে পারুলিয়া গ্রামে। হলে তখন নরসিংদী এলাকার অনেক ছাত্র। এদের মধ্যে সন্তোষকুমার রায় উদ্ভিদবিদ্যা শেষ পর্বে উত্তীর্ণ, গ্রাম বরাব, জিনারদী। হরিনারায়ণ দাস (পল্টন), শেষ বর্ষ, সম্মান, সমাজবিজ্ঞান ঠিকানা; ব্রাহ্মণদী, নরসিংদী। সত্যরঞ্জন দাস, শেষ পর্ব, রসায়ন (উত্তীর্ণ); ঠিকানা–বেলাব, শিবপুর, নরসিংদী। ঠিক হল কাল সকালে পায়ে হেঁটে চলে যাব। হায়, তাদের জীবনে আর একটি সকাল আসেনি।

হল থেকে আবার বেরিয়ে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় ঘোরাফিরি করে রাত দশটার দিকে যখন হলগেটে পৌঁছি, তখন একজন দ্রুতগামী সাইকেল আরোহী "মিলিটারী নেমেছে, রাস্তা থেকে সরে পড়ুন" বলে দ্রুত চলে গেল। হলে প্রবেশ করলাম। ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠা। অধিকাংশ ছাত্র ঘুমিয়ে আছে। কেউ কেউ

বাইরে থেকে হলে ফিরছে। ভাবলাম সত্যদা'র সাথে দেখা করি কালকের প্ল্যানের ব্যাপারে। সে রাতে তার সাথে ছিলেন সুরেশ দাস (এম. এ. উত্তীর্ণ)। সুশীলের সাথে দেখা। সাথে আরেকজন (নাম মনে নেই, গণিত প্রথম পর্বের ছাত্র)। বাড়ি উত্তর বঙ্গে। দ্বিতীয় জনের কাছে আমার রুমের চাবিটা দিয়ে বললাম–আপনি একটু বসুন, আমরা সত্যদা'র সাথে কথা বলে আসি। আমরা তিনতলায় গেলাম। উত্তর ভবনের উত্তরের ব্লকের তিনতলায় থাকতেন সত্যরঞ্জন দাস। রুমটি ভেতর থেকে বন্ধ। আলো নেই। এরা ঘুমিয়ে। সারাদিনের দৌড়াদৌড়ির পর সবাই ক্লান্ত। ফিরে এসেছি। রাত বারোটার দিকে। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে হাতড়িয়ে নিচতলায় এলাম। ঠিক তখনই জগন্নাথ হলের উপর প্রথম ব্রাশ ফায়ার। উত্তর ভবনের উত্তরের গেটের পাশে আমগাছটির একটি ডালা ভেঙ্গে পড়ল। ব্রাশ ফায়ার ও শেল বিস্ফোরণের অবিরত শব্দ। এত শব্দ হচ্ছিল যে কানের কাছে মুখ রেখে কথা বললেও শোনা যায় না। এ অবস্থায় আমি ও সুশীল আমার ঘরে ঢুকলাম। আরেকজন আগেই রুমে পৌঁছেছিল। গুলি ও গোলাবর্ষণ প্রচণ্ডভাবে চলছে। গুলিতে জানালার কাচ ভেঙ্গে গেছে। একটি প্রচণ্ড শব্দ হল। মনে হল পুরো ভবনই বুঝি ধসে গেছে। স্বাধীনতার পর দেখেছিলাম ২৮ নং রুমের দেয়াল বরাবর প্রকাণ্ড এক সুড়ঙ্গ। ট্যাংকের গোলার আঘাতে ভবনের অনেক স্থানে এরূপ সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। আমরা তিনজন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ফ্লোরে বসে ছিলাম। আধঘন্টা কেটে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হঠাৎ গোলার শব্দ আর নেই, গুলির আওয়াজও কমে আসল। ভাবলাম বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু এ কি! শক্ত বুটের আওয়াজ কেন? এরা কারা? এরপর যে হৃদয়বিদারক ঘটনার সূত্রপাত হয় তাকে ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শতাধিক ছাত্র, শিক্ষকবৃন্দ, কয়েকশত কর্মচারী, বস্তিবাসী কয়েক ঘন্টার মধ্যে শহীদ হলেন। পুরো ঘটনার বিবরণ আমার জানা নেই। শুধু স্মৃতি আজও গভীর ঘুমে আর্তচিৎকারের সৃষ্টি করে, সংক্ষেপে তাই বলছি। বুটের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা কক্ষে কক্ষে তল্লাশি করছে। ব্রাশ ফায়ারে দরজা ভাঙছে। ঘুমন্ত ছাত্রকে খুন করার জন্য ছুড়ছে দু/একটি গ্রেনেড। কেউ আর্তচিৎকার করে উঠছে, আর কেউ তার আগেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এবার আমাদের পালা। বুটের শব্দ দোরগোড়ায়। হাতে হাত মিলিয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এতক্ষণ তিনজনে জড়াজড়ি করে বসে ছিলাম। এবার তিন কোনায় সরে গেলাম। আমি দরজার পাশে। ব্রাশ ফায়ারে দরজা ভেঙে গেল। সাথে সাথেই দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গ্রেনেড চার্জ। জল্লাদটি বলে উঠল, "বাতাও জয়বাংলা, বান্‌চোত, শেখ মুজিব কাঁহা গিয়া?" পেনসিল টর্চের সাহায্যে দেখল কাজ কেমন হয়েছে। জল্লাদরা গেল পরবর্তী কক্ষে। এভাবে ভোর পর্যন্ত চলতে থাকে। এদিকে আমার কক্ষে আগুন ধরে গেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বারুদের গন্ধে। আমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। ভাঙ্গা দরজার নিচে চাপা পড়ে আছি। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে সুশীল ও অন্য বন্ধুর কি অবস্থা জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু এরা কোথায়? হাতড়িয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। রুমে এত পানি ও কাদা এল কোত্থেকে? একটু পরেই বুঝলাম মেশিনগান ও গ্রেনেডের আঘাতে ওদের দেহ টুকরো হয়ে গেছে। রক্তে সমস্ত ফ্লোর ভেসে গেছে। দুজন শহীদ হল। ২৭শে মার্চ জনাব আবদুল বারী আমার খোঁজে ২৯ নং-এ গিয়েছিলেন। তার মুখে শুনেছিলাম রুমটি রক্তে প্লাবিত ছিল। জনাব বারী আমার প্রতিবেশী এবং তখন তিনি এস. এম.

অফিসে চাকুরী করতেন। যা হোক নিজের অবস্থা বুঝতে পারছি না। দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। উঠতে পারছি না। বাম পা'টা মনে হয় খসে গেছে। হাতের আঙ্গুলের চেতনা নেই। বুঝতে পারলাম আমার শরীরের অনেক স্থানে জখম। বাম পায়ের পাতা গোড়ালি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। গায়ের হাফ শার্ট খুলে পা'টা পেঁচিয়ে নিলাম। শুধু হাতের উপর ভর করে চৌকিতে বসলাম। চারদিকে তখনও গুলি, গ্রেনেড ও মৃত্যুচিৎকার। রাত ক'টা জানি না। শুনলাম করিডোর বরাবর কি যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলো। মনে পড়ল আগের দিনের জয়দেবপুরের ঘটনা। সেদিন অনেক বাঙ্গালীকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। আমাদেরও কি তাই হবে? না, আমাকে পালাতে হবে। ভাবতে ভাবতেই দরজায় এল দুটো বালক। টর্চের আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারলাম এরা হাসান ও হোসেন। অনাথ দুই ভাই হলেই থাকে। ছাত্রদের ছোটখাট কাজ করে। কেন্টিন ও ডাইনিং হলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে দিন কাটায়। এদেরকে দিয়ে লাশ টানানো হয়েছিল। ওরা রুমে ঢুকলে আস্তে করে বললাম–হোসেন, আমরা মরিনি, আমাদের নিস না। ওরা চলে গেল। পরে জেনেছিলাম পরদিন মাঠে দুজনকেই গুলি করে কবর দেয়া হয়েছিল। পালাতে হবে। মনে পড়ল, জানালার একটি বড় রড খোলা যায়। গেট বন্ধ হয়ে গেলে ওটা খুলেই আমি রুমে আসতাম। চৌকি থেকে বুক-শেলফের উপর ভর করে কাচের জানালা খুললাম। কাচের জানালা ঝর ঝর করে পড়ে গেল। ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু কেউ আসল না। ঘাতকরা তখন লাশ সামলাতে ব্যস্ত। আলগা রডটি খুললাম। রডটি ডান হাতে ধরে শরীরের উপরের অংশ বাইরে ঠেলে দিয়ে রডের উপর ভর করে কর্দমাক্ত ড্রেনে শুয়ে পড়লাম। আর একটু দেরী হলে ধরা পড়ে যেতাম। কারণ একটু পরেই সুশীল ও অন্যজনের লাশ নিয়ে যায়। তখন পিপাসায় প্রাণ যায়। জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। ড্রেনের জল পান করলাম কিন্তু পিপাসা মিটলো না। জল চাই। সামনেই পুকুর। ঝোপে আচ্ছন্ন। পুকুরে নেমে যাব। কিন্তু রাস্তায় এটা কি? ট্যাংক। ট্যাংকটির পরই কুলগাছের চারা, ঝোপে ঘেরা। আযান পড়ল। এতক্ষণ মনে হয়েছে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছাড়া কেউ নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। চারদিকে আগুন। প্রচন্ড শব্দে মুয়াজ্জিনদের আযান প্রচারিত হচ্ছে। ভাবলাম এভাবে পড়ে থাকলে রক্ষা নেই। একটু পরেই ফর্সা হয়ে যাবে। তাই শেষ চেষ্টা করে দেখি। বিকলাংগের মতো ট্যাংকটির পাশ দিয়ে কুলগাছের ঝোপে প্রবেশ করলাম। পুকুরের ঢালুতে নেমে গেলাম। সমস্ত হলে তখন আগুন জ্বলছে। তখনও অন্ধকার। আরও একটু নেমে আসলাম। জলে নেমে পেট পুরে জল পান করলাম। পড়ে রইলাম জলেই। বুঝলাম শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে, নড়তে পারছি না। মাথা ডাঙ্গায় রেখে শরীরটা জলে ডুবিয়ে পড়ে থাকলাম। তখন ফর্সা হয়ে গেছে। আমার বাম পাশে দক্ষিণ ভবন, ডান পাশে উত্তর ভবন, সামনে পশ্চিম ভবন। পশ্চিম ভবন থেকে লাশ টেনে আনছে কারা। উত্তর ভবনের ছাদের উপর চিৎকার ও গুলি। গুলি করে লাশ ফেলে দিচ্ছে নিচে। আর চোখ খুলে তাকাতে পারলাম না। তখনও চেতনা হারাইনি কিন্তু নড়ার শক্তি নেই। কিছু বেলা হলে দেখলাম আকাশে চক্কর মারছে পিএএফ-এর একটি বিমান।

যেখানে পড়ে ছিলাম তার পিছনে ছিল খেলার মাঠ। সেখান থেকে কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোঙানির শব্দ। পুকুরের পার বরাবর কয়েকজন জল্লাদ চাইনিজ রাইফেল কাঁধে নিয়ে খোশ মেজাজে আলাপ করছে এবং চারদিক দেখছে। মাথার উপর উড়ছে

কাক ও শকুন। আশপাশে তাকাতে চেষ্টা করলাম। কাক ও শকুন ঠোকড়াচ্ছে একটি লাশকে। একটা শকুন প্রায় আমার উপরই বসে পড়ে আর কি! হাত দিয়ে তাড়াতে পারছি না, শক্তি নেই। জিহ্বা ও চোখ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি মৃত নই। তখন সূর্য উঠে গেছে। চারদিক নিঃশব্দ। মাকে স্মরণ করলাম। বাবা-ভাই-বোনকে স্মরণ করলাম। মনে হচ্ছে আর দেরী নেই, জলে পড়েও পিপাসায় মারা যাচ্ছি। তখনই আবার বুটের শব্দ। চোখ বুঝলাম। কয়েকজন পাক-সেনা আমার মাথার ঠিক পিছনে। বুটের সাহায্যে মাথা ঠেলা দিল। আমি জলে পড়ে গেলাম। এরপর আমি জ্ঞান হারাই।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৩০/৩১শে মার্চ জ্ঞান ফিরে পাই। ৭নং ওয়ার্ডে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ, নাকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। শরীরের চামড়া উঠে গেছে। স্থানে স্থানে ক্ষত। নার্সদের কাছ থেকে জানতে পারি ২৭শে মার্চ সকালে এক ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। তখন কয়েকজন লোক জগন্নাথ হলের আনাচ-কানাচ থেকে কয়েকজন আহতকে উদ্ধার করে। আমি ওদেরই একজন। স্বাধীনতার পর আমার উদ্ধারকারীদের খুঁজে পাই। তাদের একজনের ডাক নাম ইদু মিয়া। মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে তার পুরানো বই-এর দোকান। বাকিতে বই কিনতাম। ইদু মিয়া কয়েকজন ধোপাকে সাথে নিয়ে হল থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। তার কাছ থেকে জগন্নাথ হলের গণহত্যার অনেক বিবরণ জানা যাবে।

নার্সদের কাছ থেকে জানলাম শ্রদ্ধেয় ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পাশের বেডেই মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। তাঁকে তার ঘরে চিৎ করে শুইয়ে গলায় পিস্তলের সাহায্যে গুলি করা হয়। গুলিতে তার স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে যায়। পহেলা এপ্রিল তিনি শহীদ হন। সে সময় হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন। লাশটি জল্লাদরা নিয়ে যায়। হাসপাতালে আরও দেখা হয় আহত সুরেশ দাসের সাথে। তিনি ২৫শে মার্চ রাতে উত্তর ভবনের তিনতলায় শহীদ সত্য দাসের রুমে ছিলেন। উত্তর ভবনের ছাদের উপর এগারোজনকে লাইন ধরে গুলি করা হয়। সুরেশ দাস ও সত্য দাস এদের অন্যতম। গুলি সুরেশ দাসের ডান বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। সত্য দাসসহ দশজন ছাদের উপর শহীদ হন। সুরেশ দাস জলের পাইপ বেয়ে নিচে নামেন এবং পার্শ্ববর্তী কোয়ার্টারে পালিয়ে যান। সুরেশ দাস বর্তমানে সুনামগঞ্জে আইন ব্যবসা করেন। হাসপাতালে দেখা হয় শেখরের সাথে। শেখর চন্দ তখন নতুন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র (পরিসংখ্যান); বাড়ি কিশোরগঞ্জ। শেখর ২৬শে মার্চ সকালে জল্লাদের হাতে ধরা পরে। তাকে দিয়ে হল পার্শ্ববর্তী স্টাফ কোয়ার্টার থেকে লাশ টানানো হয়। ডঃ গোবিন্দ দেব, অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও অন্যান্যের লাশ এরাই হলের মাঠে নিয়ে আসে। শেখরদেরকে দিয়ে লাশ টানানোর পর মাঠেই লাইন করে গুলি করা হয়। তাঁর ডান হাতের কব্জিতে গুলি করে। সে মরার মত পড়ে থাকে। শিফ্‌ট চেঞ্জের সময় শেখর দৌড়িয়ে পার্শ্ববর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। হল মাঠে প্রায় তিনশ' মৃত-অর্ধমৃত ছাত্র, কর্মচারী ও বস্তিবাসীকে কবর দেয়া হল। স্বাধীনতার পর যখন গণকবর খোঁড়া হয় তখন হাড় ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু ঘড়ি, জামা ও প্যান্ট ইত্যাদি থেকে অনেককে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

যে মৃণাল বোসকে আমরা খুঁজছিলাম তাকেও এখানেই কবর দেয়া হয়। আজ

আগের সবকিছু মনে করতে পারছি না। অনেকের চেহারা ভেসে ওঠে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও নাম মনে করতে পারি না। কিছু কিছু মুখ যে কিছুতেই ভোলা যায় না। সুশীল, গণপতি, সুভাষ, সত্য দাস, সন্তোষ, পল্টন ....মনে হয় এরা আজও জীবিত। আছে আমাদের মাঝেই। শুধু চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে, কি যেন বলতে চায়, কিন্তু মুখে ফুটে ওঠে না কোন ভাষা।

রাধানাথ ভৌমিক
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ
ভাওয়াল বদরে আলম
সরকারী কলেজ, গাজীপুর।

[গণিত বিভাগের ছাত্র রাধানাথ ভৌমিক পাক বাহিনীর জগন্নাথ হল আক্রমণের সাথে সাথেই হলের অভ্যন্তরে বিহারীর বাসায় আশ্রয় নেয়। সেখান হতে দেখা ও পরবর্তীকালে শোনা ঘটনা নিয়েই জগন্নাথ হলের গণহত্যার উপর তার বিবরণী রচনা করেছেন।]

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ। সেদিন বিকেল বেলা। আমি সদরঘাটে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমার আত্মীয় বাবু কেশব চন্দ্রের বাসায় রাত ৮টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করি। সেখান থেকে মোহাম্মদপুরের বাসে চেপে গুলিস্তান আসি। গুলিস্তান এসেই একটা টেলিগ্রাম পত্রিকা পাই। কাদের ছিল সে টেলিগ্রাম, তাদের নামটা আমি ভুলে গেছি। সেই টেলিগ্রামে লেখা ছিল''ভূট্টো এগরিড্ টু মুজিবস্ ফোর পয়েন্টস্''। তখন আমার দৃঢ়বিশ্বাস আগামীকাল মানে ২৬শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়তো একটা ভাষণ দেবেন এবং আমাদের সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে আমি টেলিগ্রামটা কিনে হলে চলে আসি। হলে এসে নর্থ হাউজের সামনে কিছু ছাত্রকে বসে থাকতে দেখলাম। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত মৃণাল বোসকেও বসে থাকতে দেখলাম। তাকে দেখে আমি পশ্চিম বাড়ির ১৯ নম্বর রুমে চলে যাই। সেখানে এসে টেলিগ্রামটা পড়ে নেই এবং হাত-মুখ ধূয়ে বিছানায় বসে একটু একটু ভাবতে থাকি আমাদের এতদিনের সমস্যা বুঝি দূরীভূত হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, ভুট্টো সাহেব এবং আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আলোচনায় ছিলেন। এসব ভাবতে ভাবতে আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। মধ্যরাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসি এবং জানালা দিয়ে দেখি ইকবাল হলের উপরে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জানালা দিয়ে শুধু আলো দেখা যায় আর জগন্নাথ হলের উপর দিয়ে কেবল গুলির শব্দ শোনা যায়। মাঝে-মধ্যে শব্দ এত প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যেন আমাদের নর্থ হাউজের বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। ভয়ে চৌকির নিচে বসে থাকি। শেষরাতের দিকে আজানের শব্দ পাই, তখন আস্তে আস্তে দরজাটা খুলি। দরজা খুলে তাকিয়ে দেখি পূর্ব বাড়ির টিনশেডে আগুন জ্বলছে। নর্থ হাউজের জানালায়ও আগুন। তখন আমার মনে আরও বেশি ভয় দানা বাঁধে। ভাবলাম মিলিটারীর আক্রমণ চরম আকার ধারণ করেছে। তখন গরমের দিন। আমি খালি গায়ে, লুঙ্গি পরিহিত ছিলাম। একটা জামা গায়ে দেই। আমার ইন্টারভিউ দেয়া

সার্টিফিকেটগুলো একটা হাতব্যাগে নিয়ে সামনে এগোই। তখনকার সুধীরের ক্যান্টিনের, যা সুধীর দা চালাতেন, বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই। এমন সময়, আমাদের হলে দুটো অনাথ ছেলে থাকত তার একটি আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে, বলে–বাবু আর আগাবেন না, ওখানে এক বাবুকে ধরে মেরে ফেলেছে। তখন আমি একটু পিছিয়ে যাই। ভয় লাগে, ভয়ে হাত–পা কাঁপতে থাকে। তখন কোন উপায় না দেখে আমাদের হলের কাছে বিহারীদের যেসব বাসা ছিল, সেখানে চলে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে আরও দুই–তিনজন ছাত্র আছে। এদের মধ্যে একজন তপন বর্ধন, অপর জন মাধব গোবিন্দ সাহা। তারপর আমরা একত্র হয়ে ওখানে কিছুক্ষণ কাটাই। ভোর হতে না হতেই দেখি নর্থ হাউজের ছাদের উপরে মিলিটারী উঠছে। মিলিটারী কালো পতাকা ছিঁড়ে ফেলে এবং মনের আনন্দে গুলি করতে থাকে। এখানে আমাদের দিন কাটছিল, এদিকে দুপুর হয়ে আসছে। আমরা যারা আছি সবাই ভয়ে কাতর, জীবন বাঁচে কি বাঁচে না তা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। সেই দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমরা যে বাসায় ছিলাম সেই বাসার মালিক সীতানাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী কিছু ভাত ও আলু–বেগুন সিদ্ধ করে আমাদের খেতে দেয়। কিন্তু ভয়–ভীতির কারণে আমরা কেউই খেতে পারিনি, তবুও একটু ভাত মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে আমাদের কেটে যায় সে দুপুর। দুপুর একটা কি দেড়টার দিকে হলের চারপাশের গুলির শব্দ কিছুটা কমে আসে। ঐ সময় আমাদের মধ্য থেকে মাধব গোবিন্দ সাহা সরে পড়েন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং গুলির শব্দ আবার বেড়ে যায়। পশ্চিম দিকে গাড়ির শব্দ সারারাত চলছিল। আমরা ভাবছিলাম জগন্নাথ হল উড়িয়ে দিতে বোমাই ছাড়ে কিনা! এই রকম আলাপ–আলোচনা আমাদের মধ্যে চলছিল। রাত ৮টার দিকে মাইকে শুনলাম, বলছে ''দরজা–জানালা খুলবে না, বাইরে কারফিউ চলছে।'' মাইকিং–এর ভাষাটা ছিল বাংলায়। এরপর রাতও গভীর হতে থাকে এবং শব্দও বাড়তে থাকে। রাত ভোর হয়ে গেছে, এমন সময় গাড়ির শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাথে গুলির শব্দও কমে এলো। ২৭শে মার্চ ভোর ৭টার দিকে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়। তখন আমরা দরজা খুলে বের হয়ে আসি। নাম–না–জানা বেশকিছু ছাত্রের সাথে দেখা হয়ে গেল। হলের মধ্যমাঠে দেখি একটা গণকবর। এই কবরে অনেক লোককে কবর দেয়া হয়েছে। একটা নালার মত কেটে মৃত লাশগুলোকে ফেলে উপরে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। ওদের পক্ষে মাটি সমান করাও সম্ভব হয়নি। আলাপ–আলোচনা করে জানলাম হলের ভেতরে–বাইরে এবং এই গণকবরের সামনে যাদেরকে গুলি করে মারা হয়েছে তাদেরকে এখানে কবর দেয়া হয়েছে। কালীপদ শীল নামে একজন ছাত্রের সাথে দেখা হল, তাঁর কাছ থেকে শুনলাম–২৬শে মার্চ যাদের গুলি করা হয়েছে তাঁদের লাশ যাঁরা জীবিত ছিল তাঁদের দিয়ে টানানো হয়েছে। তারপর জীবিতদেরকেও লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় ২৬শে মার্চ বেলা ১টার দিকে। সেই গুলির সাথে কালীপদ শীলও পড়ে যায় সবার সাথে, তবে তার গায়ে গুলি লাগেনি। যখন চতুর্দিকে একটু নীরবতা দেখা গেল তখন কালীপদ শীল মাথা উঁচু করে দেখে মিলিটারী আছে কি–না। কোথাও কোন মিলিটারী নেই দেখে সেখান থেকে তিনি উঠে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যান। আমি তখন হল থেকে বেরিয়ে মেডিক্যালের পাশ দিয়ে গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা চলে যাই।

শেখর কুমার চন্দ
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

[শেখর কুমার চন্দ চরম মুহূর্তেও অবিচল থেকে গণহত্যার কবল হতে মুক্তি পেয়েছেন। পাক-সৈন্যের আদেশমত লাশ টেনে জগন্নাথ হলে জড়ো করেছেন এবং সেই একই পথে যাত্রার পরিকল্পিত মৃত্যুর হাত হতে অব্যাহতি পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ এস. বি. হোসেনের বাসায় আশ্রয় পেয়েছেন। পেয়েছেন সেবা-শুশ্রুষা। এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য জীবন-মৃত্যুর সেই কঠিন সময় অনর্গল মিথ্যা কথা বলেছেন এবং সত্যকে বুকের অভ্যন্তরে পাষান চাপা দিয়েছেন কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে সে মুহূর্তে তিনি নিজেই তা জানতেন না।]

১৯৭১ সালে আমি ৩য় বর্ষ পরিসংখ্যানের ছাত্র ছিলাম। ২৫শে মার্চ রাত ৯ টায় আমি বাড়ি থেকে ফিরে আসি হলে। আমার সাথে ছিল পাঁচজন বন্ধু। তবে তারা কেউই জগন্নাথ হলের ছাত্র ছিলেন না। বদরুদ্দোজা জগন্নাথ কলেজের, হেলাল ভৈরব কলেজের এবং বাবুল পাল বাজিতপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন। সবাই ঢাকা এসেছেন আমারই সাথে। আমার আবাস তখন জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ির ২১৬ নম্বর কক্ষে। আমরা পাঁচজন এই কক্ষেই উঠি। আমার কক্ষের পাশের ২১২ নম্বর কক্ষে থাকতেন বেনেডিক্ট ডায়াস। রাত ১০টায় আমরা খেতে যাই 'ক্যাফে-কাশে'। খেতে যাবার পথে দেখতে পেলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্র মিলে মোড়ের মাথায় ব্যারিকেড দিচ্ছেন। তাঁদের অনুরোধে আমরাও ব্যারিকেড দেই কিছু সময়। সেখান থেকে ফিরে আসি হলে। তখন হলে থাকতেন মৃণাল বোস। মৃণাল বোসের সাথে হলের গেটে দেখা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি "অবস্থা কেমন?" তিনি বললেন, "কাজ চালিয়ে যাও।" আমরা তখন ১৫/২০ জন মিলে হলের সামনেও ব্যারিকেড দেই। ব্যারিকেড শেষ হলে আমি হলে গিয়ে শুয়ে পড়ি। এ্যাসেম্বলিতে থাকাকালীন আমি এবং বেনেডিক্ট ডায়াস দু'জনেই খুব সিনেমা দেখতাম। ডায়াসের মুখে শুনলাম ঢাকায় খুব ভালো একটা ছবি চলে। ২৬ তারিখ আমরা সে ছবি দেখব, ডায়াসের সাথে সে পরিকল্পনা করে আমরা শুতে যাই। ডায়াস তখনও ডাইরী লিখছিল, কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ১২টার দিকে আমার দরজায় লাথির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। "বাইরে কে?" আমি জানতে চাইলে ডায়াস বাইরে থেকে বলল, "কিছু বুঝতে পারছো ? গুলির আওয়াজ হচ্ছে, চল পালাই। তোমার রুমে যারা আছে, ওরা হলের সবদিক চিনবে না; তুমি ওদের নিয়ে পালাও, আর প্যান্ট এবং জুতা পরে নিও।" আমি যখন হলের গেটে আসি তখন প্রিয়নাথদা ছিলেন গেটের দারোয়ান। প্রিয়নাথ বলল, "বাবু কিছু বুঝা যাচ্ছে না। আপনারা হলের পিছন দিক থেকে বের হন, আমি সামনের গেট বন্ধ করে দেই।" আমি হলের পিছন দিক থেকে দেখেছি এস.এম. হলের দিক থেকে পুলিশের ভ্যান আসছে। লাইট দেখা যাচ্ছে। তাই হলের পিছনের দিক থেকে পালাতে পারলাম না। পুকুরের পার দিয়ে ঘুরে এলাম। দেখি হলের দক্ষিণ

দিকের গেট দিয়ে পুলিশ ঢুকছে। সেখান দিয়ে যখন দেখি পালাবার পথ নেই, তখন আমরা ৬ জন (আমার বন্ধু হেলাল, মাহতাব, বদরুদ্দোজা, বাবুল পাল, আমি, আর একজন ছেলে ছিল বরদাকান্ত তালুকদার) সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে ভাঙ্গা লেট্রিনের মধ্যে ঢুকে পড়ি। গুলি চলছে, চারদিকে চিৎকার "বাঁচাও, বাঁচাও।" রাত্রে খুব গোলাগুলি চলল, শেষরাত্রের দিকে আর গোলাগুলি চলেনি। ভাঙ্গা লেট্রিনটার মধ্যে আমরা ৬ জন দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকালবেলা হলের মাঠে কয়েকটি ডেড-বডি দেখা যায়। সুধীরদার ক্যান্টিনের সাথে হলের ছাত্রাবাস ছিল টিনশেড। টিনশেডে যে আগুন দেয় তা আমরা বুঝতে পারছিলাম। আমরা ভাবছিলাম সুইপারদের ওরা মারছে না, শুধু ছাত্রদের মারছে। তখন আমরা সবাই পরামর্শ করি যে, "আমরা যদি ওদের সঙ্গে মিশে যাই তবে বাঁচতে পারব।" এমন সময় দেখি মাঠে আর্মি ঘুরছে। দুই-চার বার ভাঙ্গা লেট্রিনের পাশ দিয়েও গেছে। এক ফাঁকে আড়ালের ভেতর দিয়ে সুইপার কলোনীতে ঢুকে গেলাম। সেখানে এক বুড়ো মালী ছিল, সে বললো-"বাবু, আপনাদের তো বাঁচান যাবে না। আপনারা কিছু মনে না করলে আমাদের কাপড়-চোপড় পরে নিন। আমরা বলব যে আমাদের লোক। আপনারা কিছু বলবেন না।" আমরা ওদের কাপড়-চোপড় পরে নিলাম। সেখানকার এক গোয়াল-ঘরে মেয়েরা বসে ছিল। পাক-সৈন্যরা মেয়েদের বসিয়ে রেখে পুরুষদের ধরে এনেছে। তখন আমাদেরও ধরে আনে এবং একটা শিমুল গাছের নিচে বসায়। সামনে তিনটে ডেড-বডি, একটি অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের, একটি সুনীল আর অন্যটি গয়ানাথের। সামনে আর্মি কম্যাণ্ডার সিগারেট টানছে আর বলছে, "তোমাদের আমার শেষ করিতে লাগিবে তিন দিন, এখানে আমরা আর কিছু চাই না। শুধু মাটি চাই। তোমরা বাঙ্গাল ভাগ যাও, আউয়ূব খানকে তোমরা জুতা দেখাও . . . . .।" এ ধরনের সব কথাবার্তা বলছিলো। তখন কিছু লোক বললঃ "আমরা বাঙ্গালী নই, বিহারী।" পাক আর্মি তখন আমাদের 'বাঙ্গালী' ও 'বিহারী' এ দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলল। আমরা ছিলাম বাঙ্গালী ভাগে। এর মধ্যে প্রিয়নাথের ডেড-বডি নিয়ে এল কালীরঞ্জন শীল। বদরুদ্দোজা, কালীরঞ্জন শীল ও আমি একসাথে ছিলাম। বদরুদ্দোজা কলকাতায় ছিল, ফলে খুব ভাল হিন্দী বলতে পারত। সে বলল "আমাদের বাঁচাও, আমরা হলে কাজ করি।" কালীরঞ্জন শীল নিজেকে বিহারী বলায় পাক আর্মিরা তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। আমাদের তখন স্টাফ কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। বাঙালী গ্রুপটাকে নিয়ে যাওয়া হলো স্টাফ কোয়ার্টারে আর বিহারী গ্রুপটাকে নিয়ে যাওয়া হলো হলের ভিতরে। স্টাফ কোয়ার্টারে আমরা তিনটে ডেডবডি পেলাম। আমাদের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। তাঁর কোয়ার্টারে গেলাম, উপরে-নিচে কিছুই দেখলাম না। পাশের বাংলোতে একটা কালো পতাকা ছিল, আমার বন্ধু মাহতাবকে দিয়ে সেটি আনিয়ে আর্মিরা পোড়ালো। আমাদের বললো ডেডবডিগুলো গাড়িতে আনতে। আমরা গাড়িতে ডেডবডিগুলো নিয়ে গেলাম। এখন যেখানে হলের শহীদ মিনার সেখানে ডেডবডিগুলো জড়ো করা হচ্ছিল। ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার সময় ডঃ জি. সি. দেবের বাড়িতে ওরা যখন ঢোকে তখন কালীদা বুঝি ওদের সংগে ছিল, আমি ছিলাম না। তখন আমরা ভাগ হয়ে গিয়েছি। কেউ আগে, কেউ পিছনে হয়ে গিয়েছি। ডেডবডি নিয়ে আসার পর সবাইকে লাইন দিয়ে বসালো। একটি ডেডবডি পড়ে ছিল, সেটা কেউ আনেনি। আমি আর মাহতাব গেলাম সেটা আনতে, আমাদের সাথে একজন

আর্মি ছিল। পরিকল্পনা ছিল যে আমরা ডেডবডি এখানে নিয়ে আসার পর মাটিতে বসব, তারপর আমাদের গুলি করবে। কিন্তু মাহতাবকে দাঁড়ানো অবস্থায়ই গুলি করল, মাহতাব পড়ে গেল এবং সেই সাথে আমিও পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার পর আমাকে গুলি করল। গুলিটা সৌভাগ্যক্রমে বুকে লাগেনি, হাতে লাগলো, ডান হাতে। তারপর মাটিতে শুয়ে আছি, আর শুয়ে শুয়ে আমি মনে করছি "আমি মরে গেছি।" বর্তমান শহীদ মিনারের সামনে আমাকে গুলি করে। আমাকেই শেষ গুলি করে, আমাকে গুলি করার পর হলে আর কাউকে গুলি করেনি। আমি মাটিতে পড়ে যাবার পর আর্মি গোল হয়ে দাঁড়ালো। এর আগে আমি দেখেছি হেলালকে প্রথম গুলিটা করলো, তারপর করেছে বাচ্চুকে, তারপর আর কাকে আমি বলতে পারবো না। ওরা যখন মাটিতে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় নড়াচড়া করছে তখন আর্মি আবার গুলি করেছে। আমি মাটিতে শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারছি যে, আমার একটা হাত নেই। তারপর শুনলাম আর্মিরা যেন কম্যাণ্ড দিচ্ছে, কম্যাণ্ড দেয়ার পর সমস্ত আর্মি গাড়িতে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার পর আমি সেখান থেকে পালালাম। পালাবার পর মনে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়, হাউজ টিউটর কোয়ার্টারের কথা, সেখানে থাকেন জি.কে.নাথ। কিন্তু স্যারকে মনে হলো ঘটনার সময় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। তাঁর বাংলোতে গেলাম, নক করলাম কয়েকবার, কেউ সাড়াশব্দ করেনি। হলের কোনায় থাকতেন ডঃ এম. এন. হুদা। তাঁর বাংলোতে গেলাম, দেখলাম কয়েকটা চেয়ার–টেবিল পড়ে আছে বারান্দাতে, লোকজন নেই। শামসুননাহার হল তখনো হয়নি। দেয়াল টপকে সেখানে ঢুকলাম। দেখলাম দেয়ালের ভিতরের দিকে কতগুলো ডেডবডি পড়ে আছে। ভূগোল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন নাফিজ আহমেদ, তাঁর বাংলোর ভিতর দিয়ে সৈয়দ এস. বি. হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (রেজিষ্টার) ওনার বাংলোতে গেলাম এবং পেছনের দেয়াল টপকে বাসার ভেতরে ঢুকলাম। স্যারের স্ত্রী ছিলেন, আমাকে দেখে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। ২৬ তারিখ দিন কাটল, রাত কাটল। ২৭ তারিখ দুপুরের দিকে কার্ফ্যু তুলে নিলো ঘন্টাখানেকের জন্য।

এই সময় আমি হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে যাবার পথে দেখলাম হলে লোকজন আসছে। লাশ দেখছে, তখন লাশগুলো একসংগে গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে। আমি হাসপাতালে যাওয়ার পর ৭নং ওয়ার্ডে আমাকে নেয়া হল। সেখানে দেখতে পেলাম ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। স্যারের গলায় গুলি লেগেছে। স্যার কথা বলতে পারছেন না। স্যারের পাশে দেখলাম তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, মেয়ে দোলা আর ড্রাইভার গোপালকে। আমি গেলাম, আমার আহত হবার কথা স্যারকে বলিনি। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, কেমন আছেন?" স্যার বললেন, "ভাল, হলের সব ভাল তো?" বললাম, "স্যার চিন্তা নেই, হলের সবাই ভাল। কারও তেমন কিছু হয়নি।" স্যার খুব কষ্ট করে বললেন, "আমি হয়তো বাঁচবো না। হলের সব ছেলেরা ভাল থাকলেই ভাল। আমি বাঁচবো না। আমার জন্য তোমরা কোন দুঃখ করো না।" এই ওনার শেষ কথা, তারপর তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নাই। হাসপাতালে ২৯ তারিখ সকালে স্যার মারা যান। কালীদার সাথেও আমার আর দেখা হয়নি। কালীদা আছেন এটা আমি ইদুর কাছে শুনেছি। ইদু হাসপাতালে গিয়েছিল। তার সাথে যখন আমার দেখা তখন সে বলল যে, "কালীবাবু আছেন, আমি ওনাকে উঠাইয়া নিয়া গেছি।" আমাদের হলে থাকতেন সুরেশ দাশ। সুরেশদা তখন এম. এড.

পড়তেন। তিনি এখন সুনামগঞ্জে ওকালতি করছেন। তাঁর কাছে শুনলাম আমাদের উত্তর বাড়ির ছাদে একসাথে ৯ জনকে গুলি করেছে। ৯ জনের মধ্যে একমাত্র সুরেশ দাশ জীবিত আছেন। এছাড়া রণজিৎ, রবীন রাত্রে মারা যায় হলে। অনেকদিন পর 'সংবাদ' পত্রিকায় কালীদার লেখা জগন্নাথ হলের বিভীষিকাময় সেই রাতের লেখা পড়ি। পড়ে আবার মনে হয় সেই রাত এবং দিনের বিভীষিকার কথা–যখন আমাদেরকে পাক–আর্মি অর্ডার করছে আর আমরা তা পালন করছি চাকরের মতো। আর ভাবছি আমরা মরে যাব। আমার একটা বন্ধু ছিল মাহতাব। তার কেউ ছিল না। সে বলছিল–তোমরা মরে গেলে কেউ মনে করবে, কিন্তু আমি মরে গেলে কেউ মনেও করবে না।

দেবীনারায়ণ রুদ্রপাল
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,
ধান গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর।

[দেবীনারায়ণ রুদ্র পাল জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়িতে সংঘটিত ঘটনার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। জগন্নাথ হলের অভ্যন্তরে থেকেও তিনি পাক–বাহিনীর বর্বর আক্রমণ হতে নিজকে রক্ষা করতে পেরেছেন।]

সেদিন ছিল ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ। অধিকাংশ ছাত্র হল ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমরা গুটিকয়েক ছাত্র সেদিন হলে ছিলাম। রাতে খাবার পর আমরা কয়েকজন উত্তর বাড়ির তিন তলার ১২৩ নং কক্ষের বিপরীতে পশ্চিম দিকের কক্ষে ছিলাম। উক্ত কক্ষে থাকতেন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র উপেন রায় (শহীদ)। আমার কক্ষ ছিল ১২৫। ওই কক্ষে ৪ জন তাস খেলছিল। তারা হচ্ছে মাধব সাহা, উপেন রায় (শহীদ), জীবন কৃষ্ণ সরকার (শহীদ) এবং সম্ভবত বাদল দাস (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকুরীরত)। আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং হিটলারের 'মেইন ক্যাম্প' বইটি পড়ছিলাম।

রাত আনুমানিক ১১–৩০ টা। উত্তর দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছিল। শব্দ ক্রমশ প্রচণ্ডতর হচ্ছিল এবং নিকটবর্তী হচ্ছিল। আমি তাস খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সবাই চিন্তা করতে লাগলাম ব্যাপার কি হতে পারে। কেউ কেউ বললো হয়তো বা মহসীন বা সূর্যসেন হলের ছেলেরা কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছে। কে যেন বললো, পাকিস্তানের সেনারাও আক্রমণ করতে পারে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের উপর আঘাত হানতে পারে, টিক্কা খান গভর্নর হয়ে আসার পর হতেই এরূপ একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল। যা হোক,

গোলাগুলির শব্দের সঠিক তথ্য জানার জন্য আমরা নিচে নেমে এলাম, উদ্দেশ্য জহুরুল হক হলে গিয়ে এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় কিনা। আমাদের হৈ চৈ এ হলের আরও কয়েকজন ছাত্র বেরিয়ে এসেছে, সবার নাম মনে নেই। তপন বর্ধনের (বর্তমানে করটিয়া সাদত কলেজের অধ্যাপক) কক্ষে লাথি মেরে তাকে আমি জাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেও আমাদের সাথে ছিল (সম্ভবত)। উত্তর বাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দোতলা বাংলো আছে, তার সামনে দিয়ে আমরা বৃটিশ কাউন্সিলের দিকে অগ্রসর হলাম। আমরা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলাম না, বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তায় আসার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার অফিসের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি মনে হলো আমাদের দিকে আসছে। বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ। দৌড়ে হলের সামনে চলে এলাম। আরো কয়েকজন ছাত্র ইতিমধ্যে নিচে নেমে এসেছে, সংখ্যায় ১০/১৫ জন হবে। বর্তমানে জগন্নাথ হলের যেখানে শহীদ মিনার, সেখানে আগেও একটি শহীদ মিনার ছিল। আমরা সবাই সেই শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে। সবাই নিশ্চিত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি তাদর টার্গেট হবে। হলে থাকা নিরাপদ নয়, যত শীঘ্র সম্ভব হল ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাত তখন আনুমানিক ১২-৩০টা। যে যেদিকে পারি পালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং উচ্চৈস্বরে হলের অন্যান্যদের ডাকতে শুরু করলাম।

কিন্তু পালানোর সুযোগ পেলাম না। মাঠের পূর্বদিকে ইউ.ও. টি. সি.-এর সামনে থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি আমাদের দিকে আসতে লাগলো। কেউ কারো কথা ভাবতে পারলাম না, জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারলো দৌড়ালো। আমি ছিলাম উত্তর বাড়ির মেইন গেটের সামনের রাস্তায়, দৌড়ে সোজা হলে ঢুকে পড়লাম। পশ্চিম দিকের গেটটা বন্ধ ছিল, বেরিয়ে যেতে পারলাম না, করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়ালাম। আরও ২/৩ জন আমার সাথে দৌড়াল বলে মনে হলো। সঠিক বুঝতে পারলাম না বা মনের অবস্থাও বোঝার মত ছিল না।

ক্ষণিক চিন্তা করলাম কি করবো, কোথায় লুকাব। হল থেকেও বেরুবার উপায় দেখছি না। উপায় এসে গেল। দক্ষিণ দিকের পায়খানার দিকে এগুলাম। তিনটি পায়খানার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দুইটিতে আগেই কারা যেন ঢুকে পড়েছিল, মাঝেরটি তখনও খোলা। সোজা ঢুকে পড়লাম। চিন্তা করলাম পাক-সেনারা হয়ত হলে চলে আসবে, দরজা বন্ধ দেখলে ভিতরে লোক আছে নিশ্চিত বুঝতে পারবে। তাই দরজা খোলা রেখে এক কোণে চুপ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফ্লাশের টিউবের ফাঁকে গুঁজে রাখলাম এবং মালকোঁচা দিয়ে যতদূর সম্ভব সোজা হয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলাম। হলের আলো নিভে গেল। চারদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা বেড়ে গেল। শুনতে পেলাম মাইকের শব্দ, কারা যেন কি বলছে। বুঝতে পারলাম না। এভাবে প্রায় ২৫/৩০ মিনিট কেটে গেল। গুলাগোলি করতে করতে সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পারলাম, আরও বুঝতে পারলাম সংখ্যায় তারা অনেক ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম টর্চের তীব্র আলো এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। বাঁচার আশা ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে লাগলাম। পৃথিবীর সকল চিন্তা থেকে নিজেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রেখে ঈশ্বরের চিন্তা করতে লাগলাম যাতে করে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে না ফেলি।

টর্চের আলো পায়খানার দিকে আসতে লাগল, সাথে অসংখ্য গুলি। দরজার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দক্ষিণ দিকে স্নানাগারে কাকে যেন পেল এবং সাথে সাথে এক ঝাঁক গুলি। আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম, ভয়ে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। বিপদ বুঝলাম। এগিয়ে এল সেনারা। আমার উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পায়খানার বন্ধ দরজায় পদাঘাত করতে লাগলো, বেরিয়ে আসতে হুকুম দিল। বুঝতে পারলাম ওরা দরজা খুলে দিল এবং এও বুঝতে পারলাম দক্ষিণ দিকের পায়খানায় সম্ভবত উপেন রায় ছিল। তাকে বোধ হয় কিছু দিয়ে আঘাত করলো, গুলি না করে ধরে নিয়ে গেল। একজন সেনা আমার পায়খানার দিকে পা বাড়ালো, ভয়ে চোখ বুঝে ফেললাম। শুনলাম সে কি যেন বললো তা অনুভব করলাম (চোখ বন্ধ রেখেই), ওরা সবাই চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলাম। যখন বুঝলাম আশে–পাশে কেউই নেই, চোখ খুললাম। হলের অন্যত্র দরজা ভাংগার শব্দ, আর্ত চিৎকার, বোমা ও গুলির শব্দ।

আনুমানিক ২০–২৫ মিনিট পর আবার এক দলের আগমন। দুটি ছোট ছেলেকে সাথে করে এসেছে, শুনতে পেলাম (যদিও উর্দুতে) ছাদে উঠার পথ কোন্‌টা বলে দিতে এবং আদমী কোথায় লুকিয়ে আছে জানাতে। ছেলে দুটি কিছুই বলছে না, শুধু হাউ–মাউ করে কাঁদছে। ঐ ছেলে দুটি হলেই থাকতো ছিন্নমূল, ছাত্রদের ফাই–ফরমাশ শুনতো। পরে (২৭শে মার্চ)– ছেলে দুটির সাথে দেখা। ওরা বললো, "স্যার আপনি কি দক্ষিণ দিকের মাঝখানের পায়খানায় লুকিয়েছিলেন? নিচের ফাঁক দিয়ে আপনার পা দেখেছিলাম। ওদেরকে বলিনি।" ভাবলাম ঐ ছিন্নমূল বালকদ্বয়ের বুদ্ধিতে আমি বেঁচে আছি। আমার নিকট সামান্য কিছু টাকা ছিল, তা থেকে ওদেরকে ৫ টাকা দিলাম। বললাম, বেঁচে থাকলে পরে যদি দেখা হয় তোদেরকে এ উপকারের জন্য পুরস্কৃত করবো। দুর্ভাগ্যবশত দেশ স্বাধীন হবার পর ওদের সাথে আর দেখা হয়নি, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও জানি না। থাক সে কথা। রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হতে চললো। রাত আনুমানিক ২–৩টা হবে। ছাদের উপর থেকে কি যেন দক্ষিণ দিকের পুকুর পাড়ে পড়ছে বলে মনে হলো। মনে হলো ছাদ থেকে গুলি করে কাউকে নিচে ফেলেছে। পরে জানলাম আমার অনুমান সত্য ছিল। এরপর প্রায় ঘন্টাখানেক হলের ভিতরটা বেশ নিরব ছিল। ভাবলাম সবকিছু শেষ করে সেনারা চলে গিয়েছে। রাত শেষ হলেই শেষ হবে এ ভয়াবহ গণহত্যা। আজান পড়ার পূর্বে আবার একদল এলো, আবার দরজা ভাংগার শব্দ, বোমা ও গুলির শব্দ। ধোঁয়ার গন্ধ, হাঁচি আসতে লাগলো, নাকে–মুখে কাপড় গুঁজে হাঁচি চেপে রাখলাম। এবার আর কোন আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর সবাই হল ছেড়ে চলে গেল বলে মনে হলো।

আজান পড়লো। আবার কাদের যেন আগমন। বেশ অনেক লোক মনে হলো। অল্পকিছু কথাবার্তা ও চিৎকার শুনে বুঝলাম এরা হয়তো সেনাবাহিনীর নয়। উর্দুভাষী লোক, লুটতরাজের জন্য এসেছে। কক্ষ ভাংগার শব্দ শুনলাম প্রায় সকাল হওয়া পর্যন্ত। বাইরে অবশ্য গোলাগুলি তখনও চলছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে হলটা খুব শান্ত মনে হলো। বাইরে গোলাগুলির শব্দ শুনে বুঝলাম অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই। ধ্বংস ও নিধনযজ্ঞ চল্‌ছে, তাই আর বেরুতে সাহস করলাম না। হঠাৎ পায়খানার কমোডের দিকে তাকিয়ে দেখি কে যেন আগে ওখানে পায়খানা করেছিল। জল ঢেলে পরিষ্কার করেনি, তখন পায়খানার ফ্লাশগুলো কাজ করতো না। পায়খানা করার পর জল ঢেলে

পরিষ্কার করতে হতো নিজেদেরকেই। বুঝলাম কেন পাকিস্তানী সেনারা ঢুকতে চেয়েও আমার পায়খানায় ঢোকেনি। দরজা খোলা রাখা এবং পুরনো মল জমা থাকার কারণে ঐ পায়খানায় কেউ থাকতে পারে বলে ওদের তখন বিশ্বাস হয়নি। আর এ অবিশ্বাসের ফলেই আজ আমি জীবিত। বাইরে গোলাগুলি থাকলেও হলের ভিতরটা সারাদিন মোটামুটি শান্ত ছিল। সারাদিন ২/৩ বার কয়েকজন সৈন্যের হলের করিডোর দিয়ে হাঁটাহাঁটির শব্দ শুনলাম মাত্র। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ধরে আসছিল, ভাবতে লাগলাম কখন মুক্তি পাব। কিভাবে এখান থেকে পালাতে পারি চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হল দোতলার পায়খানাগুলোর পিছনের জানালায় গ্রিল দেয়া নাই। পায়খানার পাশের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে পালানো যেতে পারে। দক্ষিণ দিক দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে স্টাফ কোয়ার্টারে আশ্রয় নেব বলে স্থির করলাম। হলের ভিতরটা একদম নীরব মনে হওয়ায় সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে একবার বেরুবার চেষ্টা করলাম পায়খানা থেকে। পায়খানা থেকে তাকিয়ে দেখি ২/৩ জন সৈন্য পূর্ব দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যিস তাদের দৃষ্টি ছিল উত্তর দিকে। এরপর আর সারাদিন বেরুনোর চেষ্টা করিনি।

চিন্তা করলাম, সন্ধার পর যে আজান হয় তখন দোতলার উত্তর দিকের পায়খানায় চলে যাব এবং সুযোগমত পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যাব। আজান যখন পড়ল ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক দৌড়ে সোজা তিনতলায় উঠে গেলাম আমার কক্ষে। দেখলাম কক্ষটা খোলা, ভিতরে ঢুকে দেখলাম আমার বিছানাপত্রসহ চৌকি পুড়ে গিয়েছে। পড়ার টেবিল পোড়েনি। টেবিলের উপর ২টি প্যান্ট ও একটি শার্ট ছিল। ড্রয়ারে ছিল ৩০টি টাকা এবং শেলফে ছিল আমার ঘড়িটা। ঘড়ির কাঁচটা আগুনের তাপে ফুলে উঠেছিল। ঐগুলি নিয়ে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম এবং করিডোর দিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার সাথে সাথে শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ–বেশ ক' জন হবে। দৌড়ে দোতলার উত্তর দিকের পায়খানাগুলির পূর্ব দিকেরটিতে ঢুকে পড়লাম। আগের মতই দরজা খুলে রাখলাম। লোকগুলো (সৈন্য কি সাধারণ লোক বুঝতে পারলাম না) সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। পায়খানায় দাঁড়িয়ে নিচে নামার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। সময়ের অপেক্ষা মাত্র। হলের ভিতরটা শান্ত কিন্তু বাইরে তখনও গোলাগুলির শব্দ, তবে প্রচণ্ডতা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে এদিক–ওদিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। পায়খানার জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেনাদের টহল গাড়ি–বৃটিশ কাউন্সিলের সম্মুখের রাস্তায় এবং হলের উত্তর দিকের রাস্তায়। কিছুক্ষণ পর পর গাড়ির শব্দ। স্থির করলাম উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি চলে যাওয়ার একটু পরেই নেমে পড়বো পাইপ বেয়ে।

একটি গাড়ি চলে গেল। প্রস্তুতি নিলাম। পা বাড়ালাম জানালার বাইরে। হঠাৎ পূর্ব দিক থেকে তীব্র আলোর ঝলকানি, সাথে প্রচণ্ড শব্দ। বিল্ডিং কেঁপে উঠল। মনে ভাবলাম ওরা হয়তো হলের দিকে কামান চালাচ্ছে। পর পর কয়েকবার এরূপ ঘটার পর নিচে নামার আসা ছেড়ে দিলাম। প্রাণে বাঁচার আশা ছেড়ে দিলাম, মনে–প্রাণে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। এক একবার বিল্ডিং এত জোরে কেঁপে উঠতো, মনে হতো যে ওরা বোধ হয় পুরো বিল্ডিংটাকে ধূলিসাৎ করে দেবে। ইটের চাপায় পড়েই মরতে হবে শেষ পর্যন্ত! অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই চরম মুহূর্তের জন্য।

ক্রমে ক্রমে রাত শেষ হয়ে এলো। চারদিক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। নিচে ও বাইরে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক ফাঁকা। লোকজন নেই। গোলাগুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তা দিয়ে একটি মিলিটারী গাড়ি চলে গেল। কেটে গেল আরও বেশ কিছুটা সময়। সকাল আনুমানিক ৮/৯টা হবে। ২/৪ জন সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বের হতে দেখলাম। আস্তে আস্তে রাস্তায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। অনুভব করলাম হলের ভিতরও বহু লোক। কথাবার্তার শব্দও শুনলাম। আস্তে আস্তে জগন্নাথ হলের উত্তর দিকের রাস্তায় লোক চলাচল বেড়ে গেল। তাকিয়ে থাকলাম পরিচিত কাউকে দেখা যায় কিনা। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমাদের কয়েকজন শিক্ষককে এবং পরিচিত কয়েকজনকে উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সাহস পেলাম, হয়ত বিপদ কেটে গেছে। পায়খানা থেকে এবার বেরুবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ের হাঁটুর সন্ধিসমূহে প্রচণ্ড ব্যথা। হাঁটু কুঁচকানো যায় না। অতিকষ্টে হাত দিয়ে হাঁটু আলগিয়ে আলগিয়ে পায়খানা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে দেখি অপর দুটি পায়খানায় প্রচুর রক্ত। মধ্যখানের পায়খানায় দেখলাম একটি সাদা প্যান্ট রক্তে রঞ্জিত। সেনারা বোধ হয় হত্যা করেছে যারা পায়খানা দুটোতে লুকিয়েছিল। ভাগ্যিস ঐ দুটোর কোনটিতে ঢুকিনি। ভয়েই মারা পড়তাম। ভগবানের অশেষ কৃপায় বেঁচে আছি। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বহু লোক আমাকে ঘিরে ধরলো পায়খানার করিডোরেই। নানারূপ প্রশ্ন শুরু করলো, আজ আর সেসব মনে নেই।

আস্তে আস্তে নিচতলায় নেমে এলাম। একজন লোক আমাকে হাঁটতে সাহায্য করলো। গেটের সামনে আসতেই ২০/২২ বছরের একটি মেয়ে (নাম মনে নেই) আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। তার ভাই ২৫শে'র রাতে হলে ছিল, তার কোন খোঁজ আমার জানা আছে কিনা জানতে চাইল। হলের ধ্বংসযজ্ঞে আমারও কান্না পাচ্ছিল। মেয়েটাকে শুধু বললাম ''কিছুই জানি না। শুধু বলতে পারি আমি বেঁচে আছি।''

গেটের সামনে দারোয়ানদের কক্ষে দেখলাম একজন দারোয়ানের অগ্নিদগ্ধ লাশ। বোমার আঘাতে হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। হল থেকে রেরিয়ে দেখলাম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। হল বিল্ডিং-এর গায়ে কামানের-গোলায় বিরাট বিরাট গর্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি। মাঠের মাঝে (যেখানে গণ-কবর চিহ্নিত রয়েছে) দেখলাম বুলডোজার দিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি খুঁড়ে চাপা দেয়ার চিহ্ন। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওখানে হলের ছাত্রদের এবং অন্যদের হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছে। হলের পরিচিত কোন ছাত্রের সাথে দেখা হলো না। তবে সেই দুটি ছেলের সাথে দেখা যাদের ব্যাপারে পূর্বেই লিখেছি। হলের চত্বরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর হল থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়-উদ্দেশ্য কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে করে চলে যাব ময়মনসিংহ, সেখান থেকে গ্রামে। তখন টাংগাইল যেতে হত ক্যান্টনমেন্টের মধ্য দিয়ে এবং বাসও চলছিল না। গুলিস্তান এসে শুনলাম ট্রেন বন্ধ।

রাজপথে মানুষের ঢল। সবাই নদী পার হয়ে বুড়িগঙ্গার ওপারে আশ্রয় নেয়ার জন্য দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হলাম। মেডিক্যালের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমার এক বন্ধু এবং সহপাঠী মাহ্ফুজুর রহমানের সাথে দেখা। সে তো

আমাকে দেখে অবাক। সব খুলে বলতে চাইলে সে বললো–আগে বাসায় চল্, পরে শোনা যাবে। তার সাথে ওদের বকসীবাজারের বাসায় গেলাম। ওর মা, ছোট বোন (সে মেডিক্যালের ছাত্রী ছিল) আমার ভীষণ যত্ন করলেন। হাঁটুও পায়ে গরম সেঁক দিয়ে দিল ওর ছোট বোন। বিকেলে চলে যেতে চাইলাম নদীর অপর পারে। কিন্তু ওর স্নেহময়ী মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেনঃ ''তুমি এভাবে বাড়ি যেতে পারবে না। আমাদের ভাগ্যে যা হয় তোমারও তাই হবে। যতদিন অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক না হয় ততদিন থেকে যাও''। বন্ধুটিও তার মায়ের সাথে যোগ দিল। অগত্যা থেকে গেলাম। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। ১৫ই এপ্রিল বাসে করে বাড়ি চলে গেলাম।

বাদল কান্তি দাস
সহকারী পরিচালক
পরিসংখ্যান বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

[মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে জগন্নাথ হলের ছাত্র বাদল কান্তি দাস বেঁচে গেছেন। আর প্রত্যক্ষ করেছেন সহপাঠীদের মৃত্যুর দৃশ্য। নির্ভেজাল বক্তব্যে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন–যার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আতঙ্ক ও মৃত্যুভীতির ছাপ বিদ্যমান।]

১৯৭১ সালের ঘটনা বলতে গেলে কিছুটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন প্রথমেই। আমি তখন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্ট বাতিল ঘোষণা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সে কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। সে সময় বহু ছেলে হল থেকে বাড়ি চলে যায়। আমার মনে হয় শতকরা ১০ জন ছেলেও তখন হলে ছিল না। আমি যেহেতু একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং দেশে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, সেজন্যই আমি বাড়ি যাইনি। আমরা আইয়ুব-বিরোধী মিছিল-মিটিং করতাম এবং একথা বলতে এখন লজ্জা নেই আমরা কাঠের বন্দুক দিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিংও দিতাম। ২০/২২ জনে মিলে প্যারেড করতাম। একথা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বা দাবী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ কোনমতেই মেনে নেবে না, বরং বড় রকমের একটা গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের একটা ধারণাই হচ্ছিল যে পাকবাহিনী হয় আমাদের আটক করবে, তা না হলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিরীহ জনগণের ওপর। কিন্তু কিভাবে আসবে সে আক্রমণ সে ধারণা আমাদের ছিল না। ২৫ তারিখ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্যারেড করে ফিরছিলাম। সন্ধ্যা ৬টার দিকে মনে যেন কেমন একটা ডাক দিল। রাস্তাঘাটে লোকজন কমে গেল। রাস্তায় একটা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত জোরে চালিয়ে যাচ্ছ কেন? সে বলল, জানেন না গুলিস্তানের দিকে রাস্তাঘাট থমথমে হয়ে গেছে! নিউমার্কেট ও এলিফ্যান্ট

রোডের দিকে মিলিটারীরা দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাইরে বের হয়ে দেখি যে, লোকজন সব চলে যাচ্ছে। সবারই মনে এক ভয়-কি জানি মিলিটারী কখন আক্রমণ করে। তাদেরই অনেকে আবার বলছে মিলিটারী কাছেই দেখা যাচ্ছে। আমার সাথের অনেক ছেলে বলে-চল, আর কি করব আমরা হলের দিকে যাই। আমি তখন বলি, এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই দেখা যায় না। চল, একটু উয়ারীর দিকে যাই। উয়ারীতে আমার একজন পরিচিত লোক ছিলেন; নাম আর. এন. দত্ত। তাঁর সাথে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলাম ওনার সাথে একটু দেখা করে আসি। তাঁর বাসায় গেলাম, উনি বললেন, "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কি? রিকশা-গাড়ি সব চলে যাচ্ছে। বলে কি যেন হবে, কি যেন হবে। তোমরা সাবধানে থেকো।" তিনি আমাকে রাতে তাঁর বাসায় থেকে যেতে বললেন। আমি বললাম ঃ দেখুন একসাথে সন্ধ্যা বেলায় সব মিটিং করলাম, মিছিল করলাম। এখন আমি এখানে থেকে যাবো, বাকীরা সব বিপদে পড়বে, আমিও যাই। আমি ওনাদের নিষেধ না শুনে বাসা থেকে চলে আসি। রাস্তায় নেমে কোন রিকশা না পেয়ে হেঁটে হেঁটেই আসতে থাকি। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে এসে দেখি বহু মিলিটারী। আমি ভেবে পাই না এখানে এত মিলিটারী কেন। আমি প্রেসিডেন্ট ভবনের পাশ দিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। এত মিলিটারী দেখে ভাবলাম, অন্যদিন এখানে পাঁচজন মিলিটারী থাকে না, আজ এখানে এত মিলিটারী কেন? এসব দেখে আমার মন যেন কেমন হয়ে গেল। তারপরও উয়ারীর দিকে না গিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। গুলিস্তানের দিকে এসে দেখি রিকশা-গাড়ি কিছু নেই, লোকজন নেই, যেন একেবারে থমথমে অবস্থা। আমি একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজন নেই কেন? তিনি বললেন ঃ "কি জানি ভাই, কোন ভয়ে সবাই চলে যাচ্ছে, তুমিও চলে যাও।" আমি তখন একটা রিকশা পেয়ে তাতে উঠেই হলের দিকে রওয়ানা দেই। সামনে একটু এগিয়ে দেখি সমস্ত রাস্তায় রিকশা, গাড়ি, মানুষ সব যেন দৌড়াচ্ছে-যেন যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা। আমি যখন মেডিক্যালের কাছে আসি তখন দেখলাম রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা; কোন লোকজনও রাস্তায় হাঁটছে না। আমি রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার? রিকশাওয়ালা বলে, "রেডিওতে বলেছে যে, নিউমার্কেটের ওদিকে ভীষণ গণ্ডগোল; আপনি তাড়াতাড়ি যান গিয়া।" আমি হলের সামনে এসে তাড়াতাড়ি ওকে পয়সাটা দিয়ে হলে চলে আসি। হলে এসে দেখি আমাদের হলে যে হাউজ টিউটরের রুম ছিল সেই রুমে বসে কিছু ছেলে গল্প করছে। ছেলেদের নাম অবশ্য কিছুতেই এখন আর মনে করতে পারবো না। তবে সবাই তখন ছিল পরিচিত। মৃণাল বোস, গণপতি হালদার এবং হরিধন দাস সেখানে ছিল, এটুকু শধু মনে করতে পারি। কালীরঞ্জন শীলকেও বোধ হয় একবার দেখেছি সে জটলায়। আমিও তখন মিশে যাই সে ভিড়ে। দেখি সবাই রেডিও শুনছে, রেডিওতে অবশ্য তখন তেমন কিছুই ছিল না, সবাই মিলে গান শুনছিল। সবাই খেয়েদেয়েই এসেছে। সবারই আলোচনার বিষয় ছিল একটাই-কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কি ঘটবে তা আমরা কেউই ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি রুমে চলে আসি, আমার রুম ছিল গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, রুম নম্বর ৩৩। রুমে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ বিকট গুম গুম শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মনে হল মেশিনগান বা ১০/২০টি স্টেনগান একত্রে মারলে যে শব্দ হয় ঠিক সে রকমই শব্দ। আমার ঘুম তখনও ভালভাবে ভাঙ্গেনি, আধো ঘুম

আধো জাগরণ অবস্থায় আমার মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। পরে দেখলাম যে শব্দ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে এবং আওয়াজও ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তখন আমি ঘুম থেকে উঠে গেলাম এবং বিছানাতে উঠে বসলাম। লাইটের সুইচ অন করে দেখি লাইট জ্বলে না। আমি রুম খুলে বাইরে বের হলাম। বাইরে আওয়াজ হচ্ছে প্রচণ্ড। হঠাৎ আমার মনে হলো আমি একটু তিনতলায় উঠে দেখি। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি কিন্তু কোন ছেলেকেই দেখতে পেলাম না। তিনতলায় উঠে গিয়ে দেখি মিলিটারী সমস্ত হল ঘিরে ফেলেছে। আমাদের পূর্বদিকের দেয়ালের পাশে যে ইউ.ও.টি.সি. সেন্টার ছিল সেখানে আমার মনে হল কামান বা ট্যাংকের মতো কি যেন দেখলাম। সেখানে অনেক শব্দ হচ্ছিল এবং অস্ত্রসহ অনেক মিলিটারী ঢুকে গিয়েছিল সেখানে। কিছু ওদিকে যাচ্ছে, কিছু এদিকে আসছে–এইভাবে ভাগ হয়ে তারা আস্তে আস্তে হলের ভিতরে ঢুকে গেল। এসব দেখে আমি প্রথমটায় খুব ভয় পেয়ে যাই, তারপর দৌড়ে আমার রুমে আসি। আমার রুমে এসে চিন্তা করি কি করা যায়। শুধু এটুকুই চিন্তাতে এলো মিলিটারী হল আক্রমণ করেছে। এটুকু চিন্তায় আসতেই দৌড়ে আমি মেইন গেটে চলে আসি; দেখি মেইন গেট দু'দিক থেকেই বন্ধ, দুটো/তিনটে করে তালা মারা। দারোয়ানের রুমে নক করে দেখি তারাও কেউ নেই, দারোয়ানের রুমের সুইচ অন করে দেখি সে লাইটও জ্বলে না। আমি তখন মনে করলাম আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কেউ কেউ তখনও জেগেই ছিলো। হয়তোবা তারা মিলিটারীর সাড়া পেয়ে আগেই সরে গেছে। আবার মনে হলো কেউ বুঝি মেইন সুইচ বন্ধ করে গেটে তালা মেরে ওখানে বসে আছে বা কোথাও লুকিয়ে আছে। তখন আমার ভয় হলো, ভেবে পেলাম না আজকে আমার কপালে কি আছে। কিন্তু নীরবে আর কতোক্ষণ বসে থাকা যায় এভাবে? হঠাৎই আমার মনে হলো মিলিটারী নিশ্চয়ই এসেছে ইন্টেলিজেন্সের কোন খবরের ওপর ভিত্তি করে। আমার রুমে তো অনেক নেতা এসে থাকতেন। আমার রুমের কোন লিষ্ট হয়তো থাকতে পারে ওদের কাছে। শুধু তখনই আমার মনে হলো রুমে থাকা আমার জন্য নিরাপদ হবে না। এই কথা চিন্তায় আসা মাত্র আমি আমার রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো বাথরুমে যাই, বাথরুমে যেয়ে লুকাই। বাথরুমে যাব এমন সময় দেখলাম বাথরুমের দরজা খোলা। তারা যখন আসবে তখন তো বাথরুমও চেক করবে, কাজেই বাথরুম কি নিরাপদ হবে? এই কথা ভেবে যখন বাথরুম থেকে বের হব এমন সময় বাথরুম থেকে মাধব গোবিন্দ সাহা বের হয়ে এলেন। দেখি তিনি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি–মাধব বাবু, কি হয়েছে? কিন্তু তিনি কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। আমি মনে করলাম, উনি হয়তো অনেক আগে থেকে জেগে ছিলেন, উনি অনেক শব্দ এবং অনেক শুনেছেন কিছুই দেখেছেন, সেজন্য হয়তো তিনি ভয়ে কাঁপছেন। উনি বললেন ঃ "এতক্ষণ বাথরুমে ছিলাম কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে বাথরুমে থাকাটা নিরাপদ নয়।" আমি বললাম, "চলুন আপনার রুমে যাই, সেখানে দু'টো চৌকি আছে, তার নিচে আমরা দু'জন লুকিয়ে থাকি। তারপর কপালে যা আছে তা হবে। মৃত্যু যদি থাকেই তবে তা কেউ ঠেকাতে পারবে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? চলুন আমরা দুই চৌকির নিচে ঢুকে হরির নাম জপ করতে থাকি।" তাঁর রুমে ঢুকে চৌকির নিচে ঢুকছি, এমন সময় নিচে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শুরু হলো। তার মানে মিলিটারী গেটের সামনে চলে এসেছে এবং গেট ভাঙছে। তবে

কি দিয়ে গেট ভাঙছে তা বুঝতে পারছিলাম না, শুধু গেট ভাঙ্গার বিকট আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এই শব্দ শোনার পর হঠাৎই আমার সমস্ত অনুভূতি লোপ পেলো, কিভাবে যে চৌকির নিচে ঢুকলাম তা আর বলতে পারব না। চৌকির নিচ থেকেই বুঝতে পারছিলাম মিলিটারী গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে পড়েছে, তাদের জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি। মানসিক অবস্থা তখন এমন যে বুকের ভেতরে ঢিপ্ ঢিপ্ করে লাফাচ্ছিল হৃৎপিণ্ড, সমস্ত শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেছে, গরম হয়ে যাচ্ছে মাথা। হৃৎপিণ্ডের গতি এত দ্রুত হচ্ছিল যে কোনমতেই তা চেক দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডের গতি বুঝি থেমে যাবে এখনই। মিলিটারীরা গুম গুম করে দরজা ভাঙছে। আমরা দু'জনে চৌকির নিচ থেকে বুঝতে পারছিলাম না কাকে মারছে, কাকে ধরছে। শুধু শুনতে পারছিলাম গুলির শব্দ, গগনবিদারী আর্তচিৎকার আর মৃত্যুপথযাত্রীর আকাশ–বাতাস প্রকম্পিত আকুল আর্তি "বাঁচাও, বাঁচাও"। আমি তখন হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত দ্রুত স্পন্দন কমাতে ১–২–৩ গুনতে মগ্ন। বিশ্ব সংসার আমার কাছে অচল, স্থবির। আমার চিন্তায়–চেতনায় কেবল শব্দ পাচ্ছি আমারই নিজস্ব হৃৎপিণ্ডের, ক্রমাগত লাফিয়ে চলার দুরন্ত শব্দ। সে শব্দ ছাপিয়েও মাঝে মাঝে কানে বাজে আহাজারি আর আমার কেঁপে ওঠে বুক থর থর করে। যতবার পারি জপতে থাকি হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকি, হা কৃষ্ণ, তুমি ছাড়া তো আজকে আর কোন গতি নেই, যদি রাখ তবে আবারও দেখব পৃথিবীর আলো, বুক ভরে নেবো হাওয়া, গন্ধ, বাঁচিয়ে না রাখলে এইতো শেষ। ততক্ষণে মিলিটারী তিনতলায় পৌঁছে গেছে, রুম ভাঙছে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই গুলি করছে এটুকুই শুধু বুঝতে পারি। এ অবস্থায় অনুমান একেবারেই অবাস্তব, কারণ শারীরিক কিম্বা মানসিকভাবে সুস্থ না হলে কারো পক্ষেই অনুমান সম্ভব নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়ালে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করা একেবারেই কল্পনাতীত ব্যাপার। তখন আমার মানসিক বৈকল্যের অবস্থা। কিন্তু তার মাঝেই মনে হলো, মরে তো যাবই একবার পিতা–মাতাকে একটু স্মরণ করে নিই। পিতা–মাতার নাম স্মরণ করে নিলাম আর হরে কৃষ্ণ নাম জপ করতে লাগলাম। আমি শুনতে পেলাম মিলিটারীদের একজন আরেকজনকে উচ্চৈস্বরে কি যেন বলছে। কথাগুলো এখন আর ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে, বলছিল "যেখানে পার বাথরুম, ল্যাট্রিন চেক কর, সবাইকে ধর, মার" এই রকম কি সব যেন। আমরা যে রুমে ছিলাম, সেই রুমের ফার্স্ট ফ্লোরের বাথরুমের কর্ণার থেকে ২/৩টি রুম রেখে তারপর সব রুম চেক করে আসছে। ধুপধাপ শব্দ করে কে যেন দৌড়ে আসছিল। পেছন থেকে তার বজ্রহুংকার ভেসে এলো '' ডোন্ট স্টেপ মোর'' ।তার পরই স্টেনগানের শব্দ। শব্দ হলো কারও পতনের। তখন আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে দ্রুতলয়ে শত–সহস্র গুণ। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো আমরা একটা বোকামি করে ফেলেছি, আমরা আমাদের রুম ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। তখনকার সেই দিশেহারা অবস্থায় এটুকু সাধারণ জ্ঞানও আমাদের লোপ পেয়েছিলো যে কোন রুম যদি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে তবে স্বভাবতই সবাই ধরে নেবে ভেতরে লোক আছে। আমার তখন মনে হলো যেন আমাদের রুমের কাছে মিলিটারী আসল। বন্ধ দরজায় লাথি বা অন্য কোন কিছু দিয়ে বেশ কয়েকবার আঘাত করল। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল আমার মৃত্যুর দূত যেন উদ্যত খাঁড়া হাতে আগুয়ান আমার বন্ধ দরজায়। গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের ধড়ফড় তীব্রতর, ২/৩ কলসি জল একবারেই গিলে ফেলতে পারি। অনেকগুলো

আঘাতের পর হঠাৎ করে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ল, হঠাৎ করে তীব্র, তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানি দিয়ে ঘরে ঢুকল মিলিটারী। আমরা দু'জন যে দুটো চৌকির নিচে শুয়ে ছিলাম সে দুটো চৌকির মাঝখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল লোক চলাচলের। সে ফাঁক দিয়ে হেঁটে গেলো মিলিটারী, আমি শুধু তাদের জুতো দেখতে পেলাম। আমার শুধুই মনে হতে লাগল মিলিটারী যদি মাথা নিচু করে একটু তাকায় চৌকির নিচে, তবেই আমাদের আর কোন কথাই বলতে হবে না কোনদিনও। কৃষ্ণের কৃপায় মিলিটারী আর চৌকির তলার দিকে দেখল না, একজন অপরকে বলল এখানে কোন আদমী নেই। তারপর তারা চলে গেল। অন্যান্য রুমগুলোতে তখনও তাণ্ডবলীলা চলছে তার শব্দ পাচ্ছিলাম। মিলিটারী বের হয়ে যাবার পর আমার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও কম ছিল। যদিও মিলিটারী চলে গেছে আমাদের রুম থেকে কিন্তু তবুও মৃত্যুভয় আমার তখনও কাটেনি।

আমি যখন দৌড়ে গেটের কাছে যাই, তখন হলে কাজ করতো যে দুটো অনাথ ছেলে তাদেরকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। মিলিটারীরা সেই ছেলে দুটোকেও ধরে নিয়ে আসে তাদের সাথে। এতে অবশ্য তাদের সুবিধাই হয়েছিল, হলের ছেলেরা কোথায় বসে বা থাকে এগুলো মিলিটারীর পক্ষে চেনা বা জানা সম্ভব নয়। এদের ধরে নিয়ে এসেছিল সেসব জায়গা চিনিয়ে দিতে। আমাদের ছাদের ওপর কিছু ছেলে লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হয় ছেলে দুটোকে তারা ছাদে যাবার সিঁড়ি দেখিয়ে দিতে বলেছিল, তা না হলে মিলিটারীর পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব ছিল না। কারণ ছাদে যাবার সে সিঁড়িটা ছিল একটা স্টোর রুমের ভিতরে যা তাদের জানার কথা নয়। ছাদে আমাদের অনেক বন্ধুকে তারা খুঁজে বের করে গুলি করে। প্রায় সবাই মারা যায়, তবে তাদের মধ্যে আহত অবস্থায়ও বেঁচে যায় ১ জন। আমার ধারণা মিলিটারীর মস্তিষ্কের সুস্থতা ছিল না কিংবা তারা মদ খেয়ে এসেছিল। এজন্য তারা বারবার চেক করছে এবং কোথায় কোথায় চেক করেছে তা তারা ভুলে যাচ্ছিলো। আমরা যে ঘরে লুকিয়েছিলাম প্রথমবার আমাদের না পেলেও আরও কয়েকবার তারা সে ঘরে পদচারণা করে, কিন্তু তখনও পায়নি। ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠলো ঘরের সবকিছু। তখন ভয় আমার আরও বেড়ে গেলো। ভাবলাম, রাতের বেলা আমাদের দেখেনি ঠিকই কিন্তু এখন তো দিন, এখন নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে। তার মানে এ যাত্রা বাঁচার আশার এখানেই ইতি। যেখানে যে অবস্থায় ছিলাম এখনও ঠিক সে অবস্থাতেই আছি, একটুও নড়াচড়া করার উপায় নেই–কারণ তাহলেই ব্যাগ এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রও নড়ে এবং শব্দ ওঠে কড়কড় করে। সকালবেলা মিলিটারী আবার এলো, আবারও সোজাই চলে গেল, চৌকির নিচে দেখেনি। আশপাশের সমস্ত দামী জিনিস তারা নিয়ে গেছে, বাকী জিনিসপত্র দুই চৌকির মাঝে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন যে জ্বলছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম, ধোঁয়া উড়ছে, নিচে একটা গরম গরম ভাব। যখন দেখি ঘরের সমস্ত কিছুই পুড়ে গেছে এবং পোড়া জিনিস সব পড়ে পড়ে ভাব তখন আমি আমার সাথের লোকটাকে জিজ্ঞেস করি এখন আর কিভাবে থাকা যায়? এরপর আমি আস্তে আস্তে উঠে দরজার কোনায় দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকি। কিন্তু কোন শব্দই পাই না। তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে ফেলি কি করলে আমি সহজে বাঁচতে পারি। চিন্তা করলাম মেডিক্যালের দিকে দৌড় দিলে মিলিটারী দেখে ফেলতে পারে, এস. এম. হলের

দিকেও মিলিটারী থাকা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের হল থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে হলো রোকেয়া হলের হাউস টিউটরের বাসা। কোনমতে এই রাস্তাটা পার হতে পারলেই আমি বেঁচে যাব। যেই ভাবা সেই কাজ, আমি এক দৌড়ে হলের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলে গেলাম। উত্তর দিকে যেয়ে দেখি ৫/৬ সিটের একটা রুম ছিল, সেখানে অনেক ছেলেরা থাকত। সেখানে ৪/৫টা লাশ পড়ে আছে, চারদিকেই রক্তের গঙ্গা। আমি আর চাইতে পারি না, এ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার চোখে জল চলে এল। আমার মনটা এত বিমর্ষ হয়ে গেলো যে আমি আর কিছু চিনতে পারি না, আর কিছু বুঝতে পারি না। আমি যখন দৌড়ে গেছি, তখন নিচে থেকে শুনতে পেলাম একটা জুতার আওয়াজ। আমি ভাবলাম মিলিটারী আসছে। তখন দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম এবং একটা পায়খানার ভেতর ঢুকে সংগে সংগে দরজাটা আটকে দিলাম। পায়খানার জানালা ছিল ভাঙ্গা, সেই ভাঙ্গা জানালার ভেতর গলে জলের পাইপ বেয়ে আমি নিচে নেমে এলাম। নিচে নেমে প্রথমেই আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম কোন মিলিটারী দেখা যায় কিনা। কোন মিলিটারী না দেখে হামাগুড়ি দিয়ে হলের ঐ দেয়াল টপকে রাস্তা পার হলাম। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি রক্ত আমার বিভিন্ন জায়গায় জমাট বেঁধে গেছে, আর জল পিপাসায় জীবন যায় যায় অবস্থা। রাস্তাঘাটে একটা কাক-পক্ষীও নেই। তখন ধীরে ধীরে আমি স্টাফ কোয়ার্টারে গিয়ে নক করলাম জল খাবার জন্য, কিন্তু কোন শব্দ নেই। দরজা-জানালা সব বন্ধ, কেউই দরজা খুললো না। তখন আমার মনে পড়লো উদয়ন স্কুলের কাছে স্টাফ কোয়ার্টারে কেমিষ্টির প্রফেসর আলী মোহাম্মদের ছেলে হালিম নামে এক ছাত্রের কথা। সে আমার সংগে পরিচিত। দরজায় নক করার পর তারা দরজা খুলে দিল। আমার কাছ থেকে তারা সমস্ত ঘটনা শুনল। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও শুধুই তারা টের পেয়েছে গণ্ডগোল হয়েছে, কিন্তু ছাত্রদের মারছে, একেবারেই মেরে ফেলছে তা তারা ধারণাই করতে পারেনি। আমার মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে তারা বুঝতে পারলো জগন্নাথ হলের সব ছেলেকে মেরে ফেলেছে। ২/৪ জন বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো ক'জন বেঁচে আছে? আমি বললাম-ক'জন বেঁচে আছে তা আমি বলতে পারবো না, তবে আমি অনেক কষ্ট করে বেঁচে আছি এটুকুই শুধু বলতে পারি। তারপর তাদের বাথরুমে গিয়ে শরীরের সমস্ত জমাট বাঁধা রক্ত পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। ওদের ঘর থেকে জামা-পাজামা দিল, সেগুলো পরে বিকেল বেলা বাইরে চলে এলাম। উদয়ন স্কুলের কাছে আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সাথে পড়ত, নাম ভুলে গেছি। ওদের ওখানে গেলাম, দরজা নক করলাম, দরজা খুলল। আমার কাছ থেকে সমস্ত শুনল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি জগন্নাথ হলের ছাত্র, আমি থাকলে তাদের বিপদ হতে পারে এই ভয়ে আমি আশ্রয় চাওয়া সত্ত্বেও তারা আমাকে আশ্রয় দিল না। তারা আমাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলল। যেহেতু আমি হিন্দু মানুষ, মিলিটারী যদি জানতে পারে আমি সেখানে, তবে যদি আবার তাদের ওপর আক্রমণ করে, এই ভয়েই তারা আমাকে আশ্রয় দিল না। যাই হোক, আমাকে যখন বের করে দিল তখন আমি ২৬ তারিখ সন্ধ্যার দিকে উদয়ন স্কুলের গেটটা ক্রস করে ভিতরে গেলাম। আমাদের চট্টগ্রামের দীপক নামে একজন ছাত্র, জগন্নাথ হলের ভি. পি. ছিলেন, তাঁর কাছে গেলাম। উনি তখন বাণিজ্য বিভাগের একজন শিক্ষক। উনি ব্যাচেলর ছিলেন। তাঁর ওখানে গেলাম। যেয়ে দেখি উনি নেই, বাসা থেকে বলল তিনি

চলে গেছেন। তখন আমি আর কি কি করব, সমস্ত বাড়িঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। উদয়ন স্কুলের পশ্চিম পাশে যে প্রফেসর কোয়ার্টারগুলো ছিল তার মাঝখানে একটা লাল একতলা বিল্ডিং ছিল। আমি যখন বুঝতে পারছিলাম কোথাও আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভবপর নয়, তখন আমি আর কাউকেই ডিস্টার্ব না করে ঐ লাল বিল্ডিং-এর বারান্দাটা খুব বড় ছিল, সেই বারান্দাটায় গিয়ে খালি দরজার সামনে শুয়ে রইলাম। রাত ১০টার দিকে প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী দরজা খুলে বাইরে বের হলেন এবং হঠাৎই আমাকে দেখে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "আরে এ কী!" তখন সবাই একটা ভয়ের মধ্যে ছিল, এদিকে জগন্নাথ হল, ওদিকে ইকবাল হল। ইকবাল হলে তখনও আওয়াজ হচ্ছিল। স্যারের স্ত্রীর চিৎকারে স্যারও বেরিয়ে এলেন। কোন্ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক তিনি ছিলেন আমার এখন মনে নেই, ফার্মেসীর অথবা এ্যাপলাইড কেমিষ্ট্রির। আমি তাঁকে বললাম, "স্যার, আমি জগন্নাথ হলের ছাত্র, কোনমতে বেঁচে আছি। আমি আপনাদের কোন ডিস্টার্বই করছি না রাতটা আমি এখানে কোনমতে কাটাতে চাই। আপনাদের এখানে তো বারান্দা আছে, আর কোথাও তো বারান্দা নেই।" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাড়ি কোথায়?" আমি বললাম, "আমার বাড়ি চট্টগ্রামে।" তিনি বললেন, "আমার বাড়িও চট্টগ্রামে। এসো, এসো ভেতরে এসো"। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত মীরেশ্বরাই। উনি আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বসালেন। ওনার কাছে বসে আবার সমস্ত ঘটনাটাই খুলে বললাম। ওনার ঘরে ঢুকে দেখলাম মানুষ কেমন ভয় পেয়েছে। ওনার-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে পাংশু বর্ণ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে সামান্য কিছু খাবার দিলেন। সবাই বসে সমস্ত রাত কাটালাম, ঘুমালে আরও বিপদ বেশি হবে। ঘুমও এলো না সারারাত। রাত কাটিয়ে দেয়ার পরে সকালে উঠে আমরা টেলিভিশনের কাছে বসলাম। দেখলাম জেনারেল টিক্কা খান একটার পর একটা কি যেন ঘোষণা দিচ্ছেন। এইসব ঘোষণা দিয়ে তিনি কারফিউ-এর ঘোষণাও দিলেন। কারফিউ দেয়াতে সমস্ত লোকজন আটকা পড়ে গেল। ২৭ তারিখ সকাল ৯টার দিকে কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন স্যার বললেন, "এখানে থাকা আর সম্ভব হবে না। আমি ধানমণ্ডি চলে যাব আমার শ্বশুরের বাড়িতে। কারফিউ এখন নেই, তুমি যেখানে পার পালাও। ঢাকা শহরে আর থেকো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তুমি, শহর ছেড়ে একেবারে চলে যাও"। খালি পায়ে, ছেঁড়া একটা জামা, ছেঁড়া একটা পাজামা পরে বের হলাম, আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। ওখান থেকে বের হয়ে উদয়ন স্কুলের গেট দিয়ে এস. এম. হলের পাশ দিয়ে জগন্নাথ হলে এলাম। আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন হয়ে গেছে যে রাস্তায় হাজার হাজার লোক দেখে আমার মনে হল এ সমস্ত লোক রাস্তায় আটকা পড়ে গেছে। এখন তারা যার যার গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে। তখনও সম্ভবত প্রফেসরস কোয়ার্টারস, হল, বস্তি, শেখ সাহেবের বাড়ি এ সমস্ত ইমপর্টেন্ট জায়গা ছাড়া আর কোথাও আক্রমণ হয়নি। আমার মনে হল জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, এস. এম. হলে কি হয়েছে তা দেখবার জন্য লোকজন রাস্তায় বের হয়েছে। আমি যখন জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি তখন আমার যে কি অনুভূতি। আমি তখনও ভয়ে এত কাতর যে প্রতিজ্ঞা করলাম এখন আর জগন্নাথ হলে ঢুকব না। আমি আর হলেও ঢুকলাম না, আর রুমেও এলাম না। আমার টাকা-পয়সা, সার্টিফিকেট, ঘড়ি ও মশারি সে রকমই রয়ে গেল। আমি সেই অবস্থায় হলের পাশ দিয়ে মেডিক্যাল হয়ে রাস্তায় হাঁটছি। রাস্তায় একটাও রিকশা

নেই। শহীদ মিনারের কাছে গিয়ে দেখলাম শহীদ মিনার ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় রক্তের দাগ, মনে হয় প্রচুর মানুষ মেরেছে। আরেকটু এগিয়ে দেখি মেডিক্যালের সামনে হাজার হাজার মানুষের জটলা। আমি সেখানে ঢুকলাম না। উয়ারীতে আর. এন. দত্ত মহাশয়ের কাছে চলে গেলাম। যাবার পথে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখলাম–গভর্নর ভবনের পাশে যে বস্তিটা ছিল তা পুড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে এখন আর কিছুই নেই। লোকমুখে শুনলাম বস্তির সব লোক পুড়ে মরেছে।

বেনেডিক্ট ডায়াস

[বাণিজ্য বিভাগের কৃতীছাত্র বেনেডিক্ট ডায়াস জগন্নাথ হলের ডাইনিং হলে আত্মগোপন করে '৭১-এর গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পান। ডাইনিং হলের অভ্যন্তর হতে ঘটনাপ্রবাহ যতটুকু দেখেছেন আর বাকিটুকু শুনেছেন সাথী বন্ধুদের নিকট হতে তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি।]

২৫শে'র সে রাক্ষুসে রাতের কাহিনী আমি ভুলব না। সে ভয়াল রাতের নৃশংসতম কাহিনী সবচেয়ে ভয়ের কাহিনীকেও হার মানায়। ১৯৬৯ সালে কুচক্রী আইয়ুব খান আন্দোলনের মুখে গদি ছাড়তে বাধ্য হলেন বটে কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে গেলেন ইয়াহিয়া খানের হাতে। ইয়াহিয়া '৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হলেন। বিজয়ী হলো (১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি) আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্ষমতা ছাড়তে চাইলেন না ইয়াহিয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে। জুলফিকারের ফিকির আমাদের বুঝতে বাকি রইল না। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ঘোষণা করলেন, জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে না। তাঁর এ অবাঞ্ছিত ঘোষণায় সারা পূর্ব বাংলার লোক গর্জে উঠল। অবস্থা যখন ক্রমেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন আলোচনার নামে ইয়াহিয়া কালক্ষেপের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সৈন্য আনতে লাগলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও হলে তখন অলিখিত ছুটি চলছিল। অধিকাংশ ছেলেই বাড়ি চলে গেছে। যে কয়জন রয়ে গেছে, তারা শহরে নানা কাজে জড়িয়ে আছে অথবা আন্দোলন দেখতে দেখতে নেশা ধরে গেছে; এর পরিণতি দেখতে চায়। আমি ছিলাম শেষের দলে। চাটগাঁ থেকে স্নেহময় দাদা (রেমণ্ড ডায়াস) বারবার তাগাদা পত্র দিচ্ছেন, "চলে আয় চাটগাঁ, দেশের অবস্থা ভাল নয়।"

প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিনও আমরা ক'জন হলের লনে বসে আলাপ করছি। এমন সময় ৫-৬ জন ছেলে ঝড়ের বেগে বলে চলে গেল ঃ "পাকিস্তানী আর্মি এদিকে মার্চ করে আসছে, তোমরা পালাও।" কথাটার তত গুরুত্ব দিলাম না।

তখন গুজবে ভর্তি সারা শহর। আমরা খানিক আগে যেমনটি ছিলাম, তেমনটি নিরুদ্বেগে লনে বসে অনাবশ্যক উৎসাহের সংগে গল্প করছি। কিন্তু তাদের সতর্কবাণীর গুরুত্ব দিতেই হল। যখন সে ছেলের দল আবার এসে মরিয়া হয়ে বললে "তোমরা এখনো আছ, সরে যাওনি?" তখন আমাদের টনক নড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রিয়নাথ দারোয়ানের টর্চ নিয়ে মৃণাল বোসকে সাথে করে আমি সলিমুল্লাহ্ হলে গেলাম। দেখি, হল ফাঁকা। গেলাম ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। সে হল ও ফাঁকা। কেবল কর্মরত দারোয়ান পায়চারী করছে। এরাই বললে, "সব ছেলে চলে গেছে হল ছেড়ে।"

দেখি, অবস্থা ভীষণ বেগতিক। ফেরত এলাম হলে। কি করব ভাবছি। হলের পুকুরপাড়ে আমি, সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, সুশীল মোদক সম্ভাব্য করণীয় কাজ সম্পর্কে কথা বলছিলাম। মাখন দারোয়ান টর্চ হাতে আসছিল উত্তর ভবন থেকে। সিলেটের টানে শুধালে, "বাবু হিতা হইছে?" ''কি হয়েছে দেখি।" আমার উত্তর।

পুকুরপাড়ে আমরা ৪জন দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এমন সময় আমাদের লক্ষ্য করে মাঠের অপরদিকে থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হল। এ আওয়াজ জনজীবনে সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। তখন উত্তরবাড়ির দিকে মুখ করে কথা বলছি আমরা। এমন সময় এক ঝাঁক গুলি এল আমাদের দিকে। ভাগ্যিস ডানদিকে একটা ছোট্ট আমগাছ ছিল। গুলি লেগে গাছের ডাল ভেঙ্গে গেল, নইলে তখনই আমরা কুপোকাৎ হতে পারতাম। যা হোক, বুঝতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হল না যে, পাকিস্তানী বাহিনী নৃশংস নির্যাতন শুরু করেছে। তখনই লাফিয়ে পড়ে আমরা পুকুরের খাদের নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গুলি বৃষ্টির মত ধূলাবালি-পাতা উড়িয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। এই মহাসংকট অবস্থায়ও আমি সাহস ও ধৈর্য হারাইনি। স্রষ্টাকে এজন্য ধন্যবাদ। মুহূর্তে আমি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় তেমনি পুকরের খাদ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে হল সেলুনের পাশ দিয়ে উপরে উঠলাম। হলে ঢুকে একটা 'প্যান্ট' ও কেড্‌স জোড়া পড়ে (দৌড়াবার সুবিধার জন্য) ডাইনিং হল লাগোয়া শেষ 'ষ্টোররুমে' ঢুকলাম। সেখানকার অবস্থানটা এরকম ঃ ডাইনিং হলের প্রথমে সব্‌জি কাটাকুটির ঘর, এরপর রান্নাঘর, তারপর আরেকটা ষ্টোররুম, তারপরের ষ্টোররুমে লুকাই আমরা। কারো সঙ্গে কোন আলোচনা নাই, বিবেচনা নাই, অথচ ছবির মত কাজ চলছে। ঐ কক্ষে আমরা চারজন বসে আছি; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি।

এভাবে মৃত্যুর জন্য আমরা যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন এল পাকবাহিনী। টপাটপ তারা একতলা, দোতলা, তেলায় উঠল। সে নিস্তব্ধ ভয়াল রাতে তাদের বুটজুতার প্রচণ্ডতা তীব্রভাবে আমাদের কানে বাজতে লাগল। মনে হচ্ছিল, আমাদের বুকের উপর দিয়ে উঠছিল তারা। বেয়নেটের খোঁচার আঘাতে কাচ ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগুচ্ছে তারা। এটা-ওটায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঘুমন্ত ছাত্রদের গুলি করে মারছে। তাদের মরণ-চিৎকার ভেসে আসছে। হলে ঢুকেই তারা 'সারেণ্ডার, সারেণ্ডার' চিৎকার করছিল। কিন্তু সারেণ্ডার করবে কে? ওদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, এখানে ভারতীয় সৈন্য আছে। গাঁজাখুরির কোন সীমা-পরিসীমা নেই যেন!

যা হোক, তেতলা ও দোতলা থেকে নেমেই মৃত্যুদূতেরা এগিয়ে এসেছিল আমাদের দিকে। বেয়নেটের খোঁচায় ডাইনিং হলের কাঁচ ভাঙছিল অনবরত। যে রুমে আমরা

লুকিয়ে আছি সে ঘরগুলোর প্রথমটা দেখল ফাঁকা; পরেরটাও। ভাবলাম আর কয়েক মুহূর্ত পরে আমরা শেষ। কিন্তু তখন তখনই একটা বুদ্ধির মত বুদ্ধি গজাল মাথায়। তাদের আসবার মুহূর্ত কয় আগেই দরজার দুপাশে রক্ষিত চেয়ারের ভেতর দুজন দুজন করে ঢুকে চুপ করে রইলাম। একজন অবিমিশ্রকারী ছেলে তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। কিন্তু বোল্ট ছিল সোজা। মিলিটারী এসে দরজায় বুট জুতার ঘা দিল জোরে। সোজা করে লাগানো বোল্ট খুলে গেল। টর্চ মেরে ভেতরে দেখল তারা। বললোঃ "সব শালা ভাগ গিয়া হায়"। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।

আমরা তিনজন যেখানে ছিলাম, ওখান থেকে মাঝে মাঝে বাইরে তাকানো, এই করে ২৭শে মার্চের সকাল হলো। তখন রাস্তায় বিজাতীয় কণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকল, "কার্ফিউ, কার্ফিউ, উঠা লিয়া, উঠা লিয়া"। ২৫শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চের সকাল পর্যন্ত কার্ফিউ দিয়ে তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে; নৃশংসতার চরম করেছে তারা। আমাদের নাওয়া নেই, খাওয়া নেই এর মধ্যে। তারপর এল শেখর চন্দ। সে যেন আমাকে ভূত দেখল, আমিও তাই।

যশোদা জীবন সাহা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ, মানিকগঞ্জ

[ইতিহাসের ছাত্র যশোদা জীবন সাহা দেখেছেন মানব ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। তৎকালীন এ্যাসেম্বলীতে ছাত্র হিসেবে অবস্থানরত যশোদা জীবন সাহা জগন্নাথ হল সন্নিহিত এলাকায় গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী।]

২৫শে মার্চ (১৯৭১), সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। আমি, দীপংকর বাবু (পদার্থবিদ্যা প্রিলিমিনারীর ছাত্র) ও ছোট ভাই সুভাষ চন্দ্র সাহা (প্রথম বর্ষ অনার্স, উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র) এই ৩ জন জগন্নাথ হলের অদূরে অর্থাৎ বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারের নিকট নির্মিত মসজিদের সাথে অবস্থিত হাসিনা হোটেলে রাতের খাওয়া শেষ করে জগন্নাথ হলে ফিরে আসি। আমরা আনুমানিক ৯টার দিকে হলের এ্যাসেম্বলী হাউস–এর সামনে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ–আলোচনা করছিলাম। এমন সময় মুকুল বোসের বড় ভাই মৃণাল বোস (যিনি উক্ত রাতে মারা যান) তিন ব্যাটারী একটা টর্চলাইট নিয়ে ইকবাল হল হতে ফিরে এসে বলতে থাকে যে রাতে পাক–বাহিনীর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অতঃপর আমি ও আমার ভাই এ্যাসেম্বলীর–৪ নং কক্ষে চলে যাই। সামনে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা থাকায় আমি লাইট জ্বালিয়ে পড়তে বসি। আমার ছোট ভাই বাড়ি হতে আসার কারণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত

ছিল। তাই সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে বিভিন্ন দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজের শব্দ শুনতে পাই। প্রথমত ভেবেছিলাম হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের তৈরী বোমা বা পটকা ফাটাচ্ছে। আমার রুম হতে সংলগ্ন সড়কে কিছু লোকের কথা শুনা যাচ্ছে। আমি কৌতূহলী হয়ে সেখানে অর্থাৎ দেয়ালের অপর পার্শ্ব হতে লক্ষ্য করলাম বেশ কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক লাইট পোষ্টের বাল্বগুলো ঢিল মেরে ভেংগে ফেলছে এবং ইট, গাছ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি রুমে ফিরে এসে বই নিয়ে আবার পড়তে বসি। বোমা বা পটকার ন্যায় আওয়াজ ক্রমান্বয়ে হলের দিকে আসছে এবং মনে হচ্ছে রেসকোর্স ময়দান হতে হলের দিকে আসছে। প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায় আলোকরশ্মিগুলো আমার রুমের জানালার কাচ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে এবং সাথে সাথে বিকট আওয়াজ ও কিছু লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ইতিমধ্যে আমার ভাই ঘুম হতে উঠে পড়েছে। এবং সে ভয়ে হলের চৌকির নিচে আশ্রয় নিচ্ছে। আমি মনে করলাম চৌকির নিচে আশ্রয় নেয়া নিরাপদ হবে না। তাই রুমে তালা লাগিয়ে ভাইকে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে আশ্রয় নেই। ভাই বাথরুমের দরজা বন্ধ করছিল, কিন্তু আমি তাতে বাধা দেই এই কারণে যে দরজা বন্ধ থাকলে হয়ত সন্দেহ করে দরজা ভেংগে আমাদের ধরে ফেলবে। সুতরাং দরজা বন্ধ না রাখাই উত্তম এবং খোলা দরজার পাশে আমরা লুকিয়ে থাকব। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর দক্ষিণ বাড়ি ও উত্তর বাড়ি হতে শোনা গেল এবং তাতে স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেখানে ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে এবং রুমে রুমে আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ না সুতরাং তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যাওয়াই ভাল বলে মনে করলাম। ভাইসহ আমি তাড়াতাড়ি করে এ্যাসেম্বলী হাউস-এর ছাদে উঠতে থাকি। গেট বন্ধ না, থাকলে হয়ত বাইরে যেতাম। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই পাক-বাহিনীর হাতে পড়ে জীবন দিতে হত। ছাদে ওঠার পথে যে রুমটা তাতে দু'জন ছাত্র ছিল। আমি তাদেরকে বের হয়ে আসতে বলি। কারণ ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। আমার কথায় তাদের একজন রুম হতে বেরিয়ে আসে এবং অপরজন না আসার কারণে সেখানে সে মারা যায়। যে ছেলে আমার সাথে বেরিয়ে আসে সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র এবং গোপালগঞ্জ তার বাড়ি। বর্তমানে সম্ভবত জাপানী মিটসুবিশি কোম্পানীতে চাকুরি করে। পথিমধ্যে আমার ভাই আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি তখন আমার বর্তমান সাথী নিয়ে এ্যাসেম্বলীর ছাদের উঁচু দেয়াল বেয়ে একটা পরিত্যক্ত দরজাবিহীন বাথরুমে আশ্রয় নেই। তারপর সমস্ত রাত সেখানে কাটাই। সেখান হতে সড়ক দিয়ে পাক-বাহিনীর গাড়ির যাতায়াতের শব্দ শোনা যায়। এর ঠিক নিচে প্রভোস্টের অফিস, কয়েকজন শিক্ষকও বসবাস করতেন সেখানে পাকবাহিনীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। তারা দরজা ভাংচুর করছে। ওদের উচ্চারিত ভাষার অংশবিশেষ বুঝা গেল। ওদের ভাষা ছিল "মেইন গেট কিধার হ্যায়'' 'আমি পরিত্যক্ত রুম হতে উত্তর দিকে কেবল আগুন দেখতে পেলাম। ছাদের উপর হতে বুঝতে পারলাম নিচে কিছু লোকের আকুল চিৎকার, হয়ত বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্য, সব চিৎকারই ব্যর্থ-পাক-বাহিনীর নিকট তাদের জীবন দিতে হলো। ২৬শে মার্চ বেলা ১টায় আমি ও আমার

সাথী পাইপ বেয়ে নিচে নেমে হলের বাইরে যাওয়ার পথে মাঠের মধ্যে অসংখ্য লাশ ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। প্রায় সবার শরীরেই শার্ট ছিল। হলের পূর্বদিকের গেট দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পথে গেটের দুই পাশে দুটো লাশ দেখতে পাই। তখন একজনের শরীরে হালকা নীল রংয়ের শার্ট ছিল এবং অপর জনের শরীরে খানিক পুরনো সাদা রং-এর টেট্রনের শার্ট ছিল। লাশ পার হয়ে প্রভোস্ট শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কোয়ার্টারের দিকে যাই। প্রথম তলায় দরজার সামনে প্রচুর পরিমাণ রক্ত। একটা ছোট লম্বা বালিশ রক্তে ভেজা অবস্থায় পড়ে আছে। রক্তের ভেতর কিছু কিছু পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আপ্রাণ ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও ভেতর হতে কোন আওয়াজ পেলাম না। অতঃপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় উঠি। ৪র্থ তলা নতুন তৈরী হওয়ায় সেখানে কখনও কোন শিক্ষক বসবাস করতে যান নাই বা কর্তৃপক্ষ কারও নামে তা মঞ্জুর করেন নাই। এখানে প্রতিটি রুমে রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। রাস্তা হতে ৪র্থ তলার রুমগুলোর অবস্থান সুস্পষ্ট দেখা যায় বলে খানিকটা ভয় পেলাম। উপর হতে পাক-বাহিনীর চলাচলরত জীপগুলো দেখা যাচ্ছিল বলে তাড়াহুড়া করে উপর হতে কোয়ার্টারের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের ঘাটের নিচে বা পুকুরের পাড় ঘেঁষে জংগলের ভেতর আশ্রয় নিতে যাই। সেখানে প্রোভোস্টের গাড়িচালক আমাকে আশ্রয় দিতে নারাজ। কারণ আমি ছাত্র। আমাকে বাঁচতে হবে, তাই ওর কথায় কান না দিয়ে জংগল ঘেঁষে পুকুরের পাড়ে শুয়ে পড়ি। চারদিক তাকিয়ে দেখি আমার ন্যায় বহু ছাত্র সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমি প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ করছিলাম। তখন উক্ত প্রোভোস্টের গাড়িচালক আমাদের উপর ঝুলন্ত কচি একটা আম ছিঁড়ে তা আমাকে খেতে দিল। আমি সেই আম খেলাম বটে তবে আমার মুখ ও গলায় ঘা হয়ে যায়। তখন খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। দিনের বাকি অংশ সেখানেই কাটালাম। রাতে পাক-বাহিনীর অনেক গাড়ি সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছিল। কোন এক সময় ওরা হয়ত শহীদ মিনারের মাঝখানটায় গোলা মেরে নষ্ট করে দিয়েছে। জংগলের ভেতর যারা ছিল তাদের কেউ প্যান্ট পরা আবার কেউ বা লুঙ্গীপরা। আমি ব্যক্তিগতভাবে লুঙ্গী পরা ছিলাম। সমস্ত রাত গাড়ি ছাড়াও মাটি গর্ত করার গাড়িরও আওয়াজ হচ্ছিল। ২৭শে মার্চ পুকুরের পারে কিছু লোক, সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজ হতে আগত, আমাদেরকে বলল ঃ ''আপনারা যে যেখানে আছেন সেখান হতে বের হয়ে আসেন-কারণ কারফিউ তুলে নেয়া হয়েছে''। আমরা প্রথমে এই কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। শেষটায় লোকের যাতায়াত দেখে বের হয়ে আসি। আসার পথে লোকের নিকট শুনলাম জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা তখনও জীবিত, তবে তাঁকে বাঁচাতে হলে রক্তের প্রয়োজন। বের হয়ে হলের দিকে ছুটে যাই। হলের ভেতরে লোক না থাকায় বাইরের কিছু সংখ্যক লোক হলের ভিতর প্রবেশ করার জন্য এদিক-ওদিক করছিল। আমি তাদেরকে বললাম আপনারা আমার সাথে একটু আসবেন কি, কারণ আমার ভাই এখনও হলের ভেতর আছে। সে মৃত্য না জীবীত তা জানি না। তারা আমার সাথে রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসল। জগন্নাথ হলের মাঠের ভেতর ছড়ানো ছিটানো লাশগুলো গর্ত করে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। পাক-বাহিনী তাড়া হুড়া করে মাটি দেয়ার ফলে লাশগুলো সম্পূর্ণ মাটি দেয়া সম্ভব হয় নাই। আমি ভাই ভাই করতে করতে সম্ভাব্য লুকানোর

জায়গার উদ্দেশ্যে এ্যাসেম্বলী হাউসের ছাদে উঠতে থাকি। এক পর্যায়ে ছাদের উপর পানির ট্যাংকের নিচে আমার ভাই, দীপাংকর বাবু ও একটি নাম না জানা মেয়েকে দেখতে পাই। ওদেরকে আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসার জন্য বলি। ওরা আমার সাথে নেমে আশে। জগন্নাথ হলের মাঝ খানের টিনশেডগুলো তখন আর নাই। কারণ পাকবাহিনী আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে দিয়েছে। বেনেডিক্ট ডায়াসকে দেখলাম হাতে একটা পোশাকের বাক্স নিয়ে দক্ষিণবাড়ি হতে বের হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু শিশুপাল (অর্থনীতিতে অনার্স-এর ছাত্র এবং তার বাড়ি সিলেট জেলায়) বিধান বাবু (আমার এক বছর অগ্রজ, ইংরেজী বিভাগের অনার্সের ছাত্র) আরও অনেকে মারা গেছে বলে তখন ধারণা করলাম। এ্যাসেম্বলী হাউসের ১, ২, ৩ এবং ৪ নং কক্ষ তখনও অক্ষত অবস্থায় তালাবদ্ধ ছিল। আর সব রুমগুলোর তালা ভাংগা অবস্থায়-বইপত্র ও অন্যান্য জিনিস সরানো-ছিটানো ও এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পেলাম। অধিকাংশ রুমগুলোর আসবাবপত্র ও বই তখনও জ্বলছিল। বাইরের থেকে আগত অপরিচিত লোকেরা অবশিষ্ট জিনিসপত্র বয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে হারমনিয়াম, কাউকে বাইসাইকেল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে চলে যেতে দেখলাম। বাধা দেয়ার মত কোন লোক তখন হলে ছিল না। আমি তাদেরকে বললাম এই সব জিনিস আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন কেন। উত্তরে ওরা বলল, স্বাভাবিক অবস্থা হলে পুনরায় সব ফেরত দেবো। দুর্ভাগ্য, উক্ত জিনিসপত্র তারা আর ফেরত দেয় নাই। ঐ মুহূর্তে আমরা শুনতে পেলাম ডঃ জি. সি. দেব ও অন্যান্য শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছে। এবং তাদের সবাইকে জগন্নাথ হলের মাঠে গণকবর দেয়া হয়েছে। সড়ক দিয়ে তখনও পাক-বাহিনীর গাড়ি যাতায়াত করছিল। দুই কি তিনজন লোক একত্রে হাঁটতে নিষেধ করা হচ্ছে। তখনও দূর হতে গোলাগুলির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। সাধারণ যানবাহন চলাচল না থাকায় পায়ে হেঁটে লোকেরা এবং আমরা দুই ভাই সদরঘাটের দিকে যাই। দীপংকর বাবু ও নাম না জানা মেয়েটি ডঃ আলিম সাহেবের বাসার উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারের পাশ ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে চলে যায়। সদরঘাট এসে দেখতে পেলাম সেখানে লঞ্চ বা অন্য কোন যানবাহন নেই। আমরা নৌকাযোগে সদরঘাট থেকে অপর পার জিঞ্জিরা চলে যাই। জিঞ্জিরা হতে একটা লঞ্চ (জনশূন্য অবস্থায়) চালু হওয়ার সাথে সাথে অপর পার হতে পাকবাহিনীর সেনারা গুলি করে উহার গতি রোধ করে। অগত্যা পায়ে হেঁটেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার মত অসংখ্য লোক তখন পায়ে হেঁটে নিজ নিজ গ্রাম বা শহরের দিকে যাচ্ছে। তখনও হেলিকপ্টারের সাহায্যে পাক-বাহিনীর লোকেরা টহল ও নিচের দৃশ্যাবলী অবলোকন করছিল। তাতে লোকেরা ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছিল। আমরা শ্রীনগর চেয়ারম্যানের বাড়ি এক রাত এবং ভাগ্যকুলে জনৈক লোকের বাড়িতে আর এক রাত কাটিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছি। পথিমধ্যে আমাদেরকে জনসাধারণ আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। বাড়ি হতে আগত আমার এক শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মোতাহার হোসেন সাহেব বেলা ১১ টার দিকে পথিমধ্যে আমাদেরকে দেখে কেঁদে ফেলেন। পাগলের ন্যায় বাবা, মা, দাদা ও অন্যান্য পাড়া-প্রতিবেশীসহ অগনিত লোকেরা আমাদের দেখে অবাক হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল আমরা নিশ্চিতভাবে ২৫শে মার্চ তারিখে জগন্নাথ হলে মৃত্যুবরণ করেছি।

রানু রায় (দে)
ও অরুণ দে
পিতা–মধু দে

[ছোট্ট মেয়ে রানু ও ছোট্ট ছেলে অরুণের স্মৃতিতে বাবা (মধুদা), মা, দাদা ও বৌদীর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি অম্লান। মধুদাকে জীবন্ত অবস্থায় জগন্নাথ হলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জীবন্ত সমাধি দেয়া হয়। মা, দাদা ও বৌদীর ছিন্নভিন্ন লাশ ১০/১২ দিন ঘরেই পড়েছিল। পরে পৌরসভা এসব গলিত মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। এই অতি বাস্তব, নির্মম ও নিষ্ঠুর ঘটনা বর্ণনা করেছেন মধুদার কন্যা রানু রায় (দে)। পুত্র অরুণ দে ঘটনার কোন কোন অংশ বর্ণনা দিয়েছেন]।

২৫শে মার্চ রাত থেকেই দেখি জগন্নাথ হলের চারদিকে মিলিটারী। আমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলাম, ছোট ছিলাম। বাবা বললেন, "তোমরা কেউ বাইরে তাকাবে না। সবাই ঘরের ভিতরে বসে থাক।" বাবা–মা সবাই চিন্তিত; দাদাও চিন্তিত। নতুন বৌদি ঘরে। চারদিকে দেখি আগুন। জগন্নাথ হলের দিকে, শিববাড়ির রাস্তা, মেডিক্যাল–এর রাস্তায় গাছ পড়ছে, ছাত্ররা চিৎকার করছে। মিলিটারীরা গাড়ি দিয়ে নামছে। আমরা একটু একটু লুকিয়ে দেখলাম। তারপর ভোর হবার সাথে সাথেই দেখি আমাদের দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছে। নিচে মিলিটারী ছিল। দরজায় ধাক্কা দেবার পর বাবা মাকে বলল, "আমি কি করবো?" মা বলল, "তুমি দরজা খুলো না। দরজায় খুব বেশি ও জোরে লাথি দিচ্ছে। বাচ্চারা দরজা খুলুক।" বাবা বলল, "বাচ্চাদের দেখে রাগ করতে পারে। আর ওরা তো কিছু বলতে পারবে না, আমিই খুলি।" বাবা দরজা খুললো, তখন সকাল সাতটা কি আটটা হবে অতটা মনে নেই। বাবা দরজা খোলার সাথে সাথেই দুই হাত উপরে তুলেছে বাবা। হাত তোলার পর বাবাকে টান দিয়ে উর্দুতে কি বলল বুঝি নাই। বাবাকে মিলিটারীরা সিঁড়িঘরে নিয়ে বসালো। হুড়মুড় করে কতগুলো মিলিটারী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারা একদম ভিতরের রুমে চলে গেলো। ঐ ঘরে বৌদি ছিল। বৌদিকে দেখছি চিৎকার করতে। আমি দৌড় দিয়ে এসে দাদাকে বললাম, "দাদা, বৌদিকে মারছে"। তখন দাদা এ ঘর থেকে ঐ ঘরে দৌড়ে যাবার সাথে সাথেই দরজার কাছে দাদাকেও মিলিটারীরা গুলি করলো। দাদা–বৌদির বিয়ে হয়েছে মাত্র পাঁচ মাস। অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হয়েছিল। আমি দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাদার বুকে একটাই গুলি লাগে। ঐ গুলিটা দাদার বুক ভেদ করে এসে আমার গালে লাগে। দাদা সাথে সাথেই দরজার একটু সামনেই পড়ে যায়।

মা অসুস্থ ছিল, মা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মাকে ওরা তখন আর কিছু বলে নাই। আমি দৌড়ে বাবার কাছে চলে গিয়ে বললাম, "বাবা, দাদাকেও ওরা মেরে ফেলেছে।'' বাবা তখন কিছুই বলতে পারছে না। নির্বাক হয়ে আছে। চুপচাপ চেয়ে আছে। মা চিৎকার

করছে। দাদা বৌদির ঘরে পড়ে ছিল। ঘরের সবকিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। দুইটা মিলিটারীই ঘরে আসে আর সবাই সিঁড়িতে ছিল। তারপর বাবাকে তাক করছে, এমন যে বাবাকে মারবে। বাবার মুখে তখনও কোন শব্দ ছিল না। শুধু হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। একবার শুধু বলেছে উর্দুতে যে, ''আমি কি করেছি''? মিলিটারীরা ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ভাঙছে আর বলছে "এবার মুজিব বাপ্‌কো ডাকো।" আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছি আর বলছি, ''আমাদের মারবেন না, বাবাকে মারবেন না''। আমাকে এক লাথি দিয়ে সরিয়ে দিলো মিলিটারীরা। পরে মা এসে তাদের মারতে বারণ করে। বাবাকে তখন দাঁড় করায় মারার জন্য। তখন মা সামনে গিয়ে হাত দিয়ে বাবাকে আগ্‌লে ধরতে যায়। আর সাথে সাথে মিলিটারীরা মায়ের হাত দু'টো কেটে ফেলে রাইফেলের মাথায় যে চাকু থাকে সেটা দিয়ে (বেয়োনেট দিয়ে)। মার হাত দু'টোর মাংস কিমার মত হয়ে যায়।

আমি দরজার সামনে ছিলাম। এসব দেখে আমি দরজা বন্ধ করে দেই। ওরা আবার লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলে। আমি দেখলাম মা পড়ে গেছে। মায়ের উপর মিলিটারীরা অনেক গুলি করছে। মার শরীরের সব জায়গায় গুলি পড়ছে, বুকে, মুখের উপর। বুকে গুলি লাগার সাথে সাথে মায়ের গলার সোনার হারটা তিনটা টুকরা হয়ে যায়। মার জিহ্বা বের হয়ে পড়ে। বাবার উপরে মা তখন পড়ে যায়। মাকে শুইয়ে দিচ্ছে বাবা, কাঁদতেছিল বাবা। আমিও কাঁদতেছিলাম। মিলিটারীরা মনে করেছিলো মায়ের সাথে সাথে বাবাও পড়ে গেছে। মাকে গুলি করার সময় বাবার গায়েও অনেক গুলি লেগেছে। পরে মিলিটারীরা নিচে চলে যায়। বাবার জামা রক্তে একেবারে ভিজে গেছে। আমি যখন দরজা বন্ধ করেছিলাম তখন লাথি দিয়ে দরজা খুলে ওরা আবার অনেকগুলো গুলি ছোঁড়ে। অনেকক্ষণ ধরে বাবা কান্নাকাটি করছে মাকে নিয়ে। বাবা তারপর মাকে রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের কাছে আসে। আমি বাবাকে বললাম, "বাবা, তোমার তো রক্তে জামা ভিজে যাচ্ছে।" বাবা কিছু বলে নাই। বাবা জিজ্ঞাসা করল যে, "তোর দাদা কোথায়?" আমি বললাম যে, "ঐ ঘরে পড়ে আছে।" বাবা সেখানে যায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তখন বাবার গা থেকে শুধু রক্ত পড়ছিল। বাবা দাদাকে ধরে কাঁদতেছিল, বৌদিকে ধরেও কাঁদতেছিল। দাদা-বৌদি দুজনেই মারা গেছে। বাবা তখন আমাকে বলল, "তোর কি হয়েছে?" আমি তখন কথা বলতে পারছিলাম না। গালে গুলি লেগে মুখ ফুলে গেছে। বুকেও লেগেছিল, গুলি এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখন প্রচুর রক্ত পড়তেছিল আমার শরীর হতে। আমাকে বাবা বলল, "তুই বসে থাক মা"। তখন বাবা মা-দাদা-বৌদির নাম ধরে কাঁদতে কাঁদতে আবার সামনের ঘরে আসে। অরুণ ওরাও কাঁদছিল। বাবা তখন ল্যাংড়ার মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছিল, হাঁটতে পারছিল না। ডান হাত এবং ডান পা উঠাতে পারছিল না। একটা গুলি পিঠে লেগেছিল, যা দেখা যাচ্ছিল। আমি টান দিয়ে গুলিটা তুলে ফেলেছি। বাবা কিন্তু তখন মারা যায়নি।

আধ ঘন্টা পর দু'জন বাঙালী লোককে নিয়ে এসে মিলিটারীরা আবার বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। গেঞ্জি পরা ছিল ঐ লোক দুইটা। আমি বললাম, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বাবাকে। তখন ওরা ওদের ভাষায় বলল, ''ভাল করে দিয়ে যাব''। এটুকু বুঝলাম। ঐ লোক দুইটা আর কিছু বলে নাই। বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আবার গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছি। তখন আমাকে টান দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দেয় মিলিটারীরা। ওরা বলেছিল যে, "লেক্‌রি কো হটাও।" বাবা তখন বলছিল যে, ''ওরও তো গুলি লেগেছে'' উর্দুতে বলছে বাবা। ঐ দুইটা লোক ভাল মানুষের মত বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, "বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।" তখন ওরা বললো, "হাসপাতালে। ভাল হলে পাঠিয়ে দেবো।" নিচে নেমে দেখি বাবাকে জগন্নাথ হলের দিকে নিয়ে গেছে। আমি আর

বাবাকে দেখি নাই। তারপর ঐ তিনটা লাশ নিয়ে আমরা ঐ ঘরেই ছিলাম। আমার আর কথা বলার মত শক্তি ছিল না। রাত্রি হয়ে গেলে উপরতলার লোকজন এসে আমাদের নিয়ে যেতে চাইল। আমি বললাম, "ভাইবোনদের নিয়ে যান। আমি থাকি।" ওনারা বললেন, "তোমার ভয় করবে।" তারপর আমাকেও উপরে নিয়ে যায়। ''ওরা তো বলে গেছে যে বাবাকে দিয়ে যাবে। ওরা তো আর এসে বাবাকে দিয়ে গেল না।'' ছোট ভাই–বোনরা কাঁদছিল। গাড়ি যেই আসে, আমি মনে করি এই বুঝি বাবাকে নিয়ে আসছে। গালে গুলি লাগাতে মুখটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বুকে গুলি লাগায় নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। পরের দিন ভোরে কয়েকজন আত্মীয় আসে এবং পাড়ার ছেলেরা পুকুরপাড় দিয়ে গোপনে আমাকে মেডিক্যালে নিয়ে যায়। এদিকে ছোট ভাই–বোনগুলি হারিয়ে যায় ও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মা, বৌদিও দাদার লাশ ১০/১২ দিন ঘরেই পচে। তারপর পাড়ার লোকজন মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দেয়ার পর নাকি গাড়ি এসে ঐ লাশ তিনটা নিয়ে গেছে। একথা অবশ্য আমি অন্য লোকজনদের ও পাড়ার লোকদের কাছে শুনেছি।

চান্দ দেব রায়
মালী, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[ফুল ফোটানো যার কাজ তার সাথে ফুল প্রেমিকের ভাব হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফুল ভালবাসতেন ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আর সেজন্যই উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মালী চান্দ দেব রায়ের সাথে ছিল পরিচয় ও স্নেহের সম্পর্ক। চান্দ দেব জগন্নাথ হলের গণহত্যার শিকার। তিনি ১৯৬৫–এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জগন্নাথ হলে আশ্রয় নেন। ২৬শে মার্চের পর গোবিন্দ দেবের মরদেহ পাক–বাহিনীর আদেশে নিয়ে আসেন জগন্নাথ হলের গণকবরে। তাঁর মতে "গোবিন্দ দেবের রক্তে আমার দেহ ভিজেছে তাই আমার দেহ ও খুবই পবিত্র।" এর পরও পাক–বাহিনী তাকে গুলি করেছিল, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন চান্দ দেব এবং সাক্ষী হয়ে রইলেন জগন্নাথ হলের গণহত্যার।]

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি যেতাম। ওনার সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে এমন ভাব হবার কারণ তিনি ফুল খুব ভালবাসতেন আর ফুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ফুল ছিল রজনীগন্ধা, ২৫ তারিখ বিকেলে যখন আমি তাঁর কাছে যাই, তখন ৫টা বাজে। তখন তাঁর মনটা ছিল খুব গম্ভীর। আমাকে তিনি বললেন যে, কালকে আমাকে একটা রজনীগন্ধার চারা এনে দিতে হবে। আমি বললাম, ''আজ তো লাগবে না, লাগবে কাল ঠিক আছে আমি এনে দেবো আগামীকাল।'' উনি তখন আমাকে বললেন যে, ''দেখ চতুর্দিকে কি রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে, অবস্থা বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না''। আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম ''হ্যাঁ ঠিক তাই।'' তখন বক্‌শী বাজারের দিক থেকে একটা মিছিল এলো, লাঠিসোটা নিয়ে শ্লোগান দিয়ে। উনি আমাকে বললেন যে, চল দেখে আসি। আমরা হেঁটে মেডিক্যালের দিকে বক্‌শী বাজারের মোড় পর্যন্ত

এলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ "চান্দু! অবস্থাটা কেমন যেন খারাপ দেখা যাচ্ছে।" আমি বললাম ঃ "সত্যিই ভাল মনে হচ্ছে না।" তিনি বললেন ঃ "তাহলে চল বাড়িতে ফিরে যাই।" তখন আমরা আবার বাড়িতে ফিরে এলাম। উনি পুনরায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ''কালকে যেন মনে থাকে। আমার রজনীগন্ধা নিয়ে আসা চাই।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আনব।" তিনি আমাকে বললেন ঃ "রাত্রে তোমরা একটু সাবধানে থাকবে, সম্ভবত রোড কারফিউ হতে পারে। তোমরা ঘর থেকে বের হবে না, নিরাপদে থাকবে বাসায়।" এরপর আমি আমার বাসায় চলে আসি।

কয়েক দিন পর্যন্ত সন্ধ্যার পরই ব্ল্যাক-আউট থাকত। সময় সময় বোমা ফাটার শব্দ হত বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমরা বাসার সকলে রাত দশটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত এগারটার দিকে কয়েকজন ছাত্র কুড়াল চাইতে এল, তারা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করবে। সেই সময় রাতের অন্ধকারের জন্য কোন ছাত্রকে চিনতে পারলাম না। কুড়াল আমাদের কাছে না থাকায় হাত-দা দিতে চেয়েছি। তারা বললেন- না, কুড়ালই প্রয়োজন। তারা বললেন যে, ''অবস্থা ভীষণ খারাপ, আপনাদের থাকলে দেন, না হলে দেরী করবেন না।'' পরে ওনারা কুড়াল না পেয়ে চলে গেলেন। চারদিক তখন নীরব, কোন শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে রাত বারোটার সময় বা বারোটা বাজেনি হয়তো তখনো, ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল রেসকোর্সের দিক থেকে। আমরা ভাবলাম হয়ত রোড কারফিউ দিয়েছে তাই এভাবে শব্দ হচ্ছে। সামরিক বাহিনী অথবা নিয়মিত বাহিনী হয়ত গুলি করছে। আমরা চুপ করে থাকলাম। সম্ভবত পাবলিক লাইব্রেরীর দিক থেকে তারা এলো, এসে এই এলাকাটি ঘিরে ফেলল। তখন তারা কি যেন একটা কথা বলল খুব জোরে, মাইকে নয়। এরপর তিনটি বিকট শব্দ হল এবং সমস্ত এলাকাটি লাল হয়ে উঠলো। শব্দে মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। এর সাথে সাথেই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। গুলির শব্দে আমরা ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। রাত যখন তিনটা বাজে তখন এই হলে (জগন্নাথ হল) তারা ঢুকল। গয়ানাথের ছেলে শিবু ছিল তখন হল গেটের দারোয়ান, তাকে গেট থেকে ডেকে নিল। শিবুকে নিয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যরা মারধর করল। তখন তারা বলল উর্দুতে, ''শালে তোমার মুজিবর বাপকো বোলাও। শালে কিধারছে যৈনা সব লেড়কা, সব ছাত্র কিধার হ্যায়, তুম শালা জান্তা বে, ঠিক বাত বোলো, তুম শালা সব জান্তা, বাতলাও।" তখন শিবু বলল, "নেহি ও লোক তো এক মাহিনা আগে সব চলা গিয়া। সব বাড়ি মে চলা গিয়া।" সৈন্যরা জিজ্ঞেস করলো, "ইধারসে কোন হ্যায়"? শিবু বললো ''উসব তো কর্মচারী আছে''। সৈন্যরা বলল "বোলাও সব"। চারদিক নিস্তব্ধ। শিবু তখন এসে হলের কর্মচারী বিহারী দাসের বড় ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেল। ওকে ধরে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারধর করল। উত্তর বাড়ির দিকে গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। তবে ওরা তখনও উত্তর বাড়িতে ঢোকেনি। আমি গরুর ঘর থেকে এসব দেখছিলাম আর খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মাকে ডেকে বললাম" ''মা, অবস্থা বেশ খারাপ দেখা যাচ্ছে, তোমরা বাড়িতেই থেকো, আমি দেখি কি করা যায়।" আমার একটা কালো চাদর ছিল, ওটা গায়ে জড়িয়ে বের হলাম, দেখতে লাগলাম সব। দেখলাম বিরাজদার ঘরের পেছনে কাকে যেন খুব মারধর করছে। আমি দক্ষিণ বাড়ির টিনশেড ডাইনিং হলের দিক দিয়ে বের হতে গিয়েও গেলাম না, ভাবলাম যে হয়ত অসুবিধা হবে। আমি যখন দক্ষিণ বাড়ির দিক থেকে

এসে পড়লাম ঠিক তখনই দু'জনে আমাকে দেখে ফেলল। আমি বুঝলাম যে আমাকে ওরা দেখে ফেলেছে। তাই হেড দারোয়ান মাখনের ঘরের হাঁস–মুরগীর খোঁয়াড় ছিল ওখানেই পিছন দিকে একটু উবু হয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। তখন ওরা আমাকে খুঁজছে আর বলছে, ''আবে, উহ্ কারে এক আদমীকো দেখা, ও কিধার গিয়া, ও শালা কিধার ভাগ গিয়া?'' আমার সামনেই আমাকে খুঁজছে। যখন দেখলাম যে ওরা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে গেল, তখন আমি মাখনের হাঁসের ঘর থেকে বেরিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকলাম। গরুর সাথে চুপচাপ বসে থাকলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সামনের দিকে চলে গেলো। সামনের দিকে যেয়ে যাকে সামনে পাচ্ছিলো তাকেই মারধর করছিলো। মারধর শেষ করে এই ব্যাচটা চলে গেলো, তারপরই নতুন আরেকটা ব্যাচ এলো।

নতুন গ্রুপটা এসেই ডাইনিং হলে আগুন ধরিয়ে দিল। পুরনো ডাইনিং হল অর্থাৎ টিনশেডের ক্যান্টিনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন ধরানোর পর ঐ আর্মিরা বলতে থাকলো,''তুমলোক ইধারসে নিকাল যাও, ইস আদমি তুম লোক সব আলগা আগার সাম চলা যাও।" অর্থাৎ, তারা বলছিল ঐ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য। কি দিয়ে যে তারা আগুন ধরালো আমি তা বলতে পারবো না। সম্ভবত কোন কেমিক্যাল পাউডার দিয়ে ধরিয়েছিল সে আগুন। সেই সময় চারজন সৈন্য এসে বুদ্ধু নামে এক লোককে ধরে তার পেটের মধ্যে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিল। বুদ্ধু বারবার বলছিল, "দেখ, হাম লোক তো এক ভাঙ্গী হ্যায়।" অর্থাৎ আমি একজন মেথর। সৈন্যরা তখন বলল যে, "শালে তুম ভাঙ্গী হ্যায়, ছোড়দে, ছোড়দে, এ শালাতো ভাঙ্গী হ্যায়, উ শালাকো মারতা কিয়া ফায়দা হোতা? চল দোসরা তরফ চল।" এই বলে ওরা চলে গেল। আমি তখনও গোয়ালঘরে লুকিয়ে আছি এবং দেখছি। ওরা সম্ভবত বুঝতে পারলো যে ঘরের ভেতর লোক আছে, আগুন ধরিয়ে দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে। তখন তাই তারা আগুন ধরিয়ে দিলো ঘরে ঘরে। আমি বুঝতে পারলাম এখানে থাকলে জ্বলেপুড়ে মরব, তাই সেই মুহূর্তেই নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। আমার মাকে বললাম, "মা, অবস্থা ভীষণ খারাপ, তুমি এক কাজ কর, দরজা খুলে দাও। তুমি বুড়ো মানুষ তোমাকে দেখলে আর কিছু বলবে না। তুমি দরজার কাছে বসে থাক, তোমাকে দেখলে আর ঘরের ভিতরও আসবে না।" দরজা খোলার শব্দে সৈন্যরা এসে আমার মাকে জিজ্ঞেস করলো, "কৈ হ্যায় ঘরকা অন্দর?" মা বলল, "নেহি সাহাব, সব নিকাল গিয়া, সব পাহাল গিয়া।" সৈন্যরা তখন ওদের ভাষায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় ঃ "তোমরা সব চলে যাও, সরকার তোমাদের সাহায্য করবে। তোমরা সব চলে যাও।" এই বলে তারা মাঠের দিকে চলে এল। তখন আমরা দেখলাম যে, ঘরের মধ্যে থাকলে আমরা জ্বলে–পুড়ে মরবো, আমাদের বাঁচার আর কোন উপায়ই নেই। তাই এ অবস্থায় আমরা ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম বাইরে।

পাঁচটার দিকে যখন পুবের আকাশ একটু একটু ফর্সা হয়ে এলো, তখন সৈন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাদের এবং আমরা যারা বয়সে একটু তরুণ ছিলাম তাদেরকে ধরলো। মাঠের দিকে খগেন এবং শ্যামলালের গোয়ালঘরটা যেখানে ছিল, সেখানে আমাদের দাঁড় করালো। আমরা সংখ্যায় কতজন ছিলাম তা অবশ্য এখন মনে নেই, তবে কিছু ছাত্র আমাদের সাথে ছিল। তাদেরকেও ধরে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখ চেনা থাকলেও এখন আর তাদের নাম মনে নেই। তারা ছেঁড়া

জামা, লুঙ্গি পরে আমাদের মধ্যে বসে থাকল। পাক–সৈন্যদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সম্ভবত মেজর হবেন, তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাল্কা মেশিনগান পুরো ভর্তি আমাদের সামনে তাক করা। আমরা তখন বুঝলাম যে সেখানেই আমাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে শেষ করে দেবে। তখন লক্ষ্য করে দেখলাম ওরা যেন কি বলছে, ওরা বলছে, "শালে, তোমার মুজিবর বাপকো বোলাও"। ওদের মুখ থেকে যা খুশী তাই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওদের কাছে প্রার্থনা করছে কাতর স্বরে, আর সৈন্যরাও সাথে সাথে গালিগালাজ করছে। পাক–সৈন্যরা বলল, "তুম লোক সব ইসকো আন্দর আও।" গোয়ালঘরটা বেশ বড় ছিল, সবাইকে গোয়ালঘরে ঢুকাল। আমি তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে মেশিনগান ঠিক করা হচ্ছে এবং একটু পরেই আমাদের সব শেষ করে দেবে। ছাত্ররাও আমাদের সাথে চুপচাপ করে বসে আছে। সৈন্যরা আবার আমাদের সকলকে বের হয়ে আসতে বলল, "তুম লোক সব বাহার নিকাল যাও, শালা কৈ ধীরসে ভাগনা নেহি ইধারছে"। তখন আমি গোয়ালঘরের ভিতর থেকে দেখছি সামনে মোড়ে একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে শিব বাড়ির রাস্তার মোড়ে। টি. এস. সি'র মোড়েও ট্যাংক,একটা ট্যাংকজগন্নাথ হলের দিকে মুখ করে আছে। একজন হানাদার সৈন্য এসে বলল যে, 'ক্যাপ্টেন সাহাব বোলাতা হ্যায়'। কি একটা অর্ডার আনার জন্য যেন ডাকছে। কালো–কালো, লম্বা–লম্বা মিলিটারী আসল চার–পাঁচ জন। আমাদের সবাইকে বলল লাইন ধরতে। আমরা সবাই লাইন ধরলে পর আমাদের বলল হাঁটতে। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। পাক–সেনারা আমাদের গায়ে স্টেন ঠেকিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। ঐ মাঠের দিকে যেদিকটায় সুধীরদা'র ক্যান্টিন এবং ন্যাশনাল ব্যাংক ছিল সেখানে দেখলাম একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। আমাদেরকে গোয়ালঘরের দিক থেকে নিয়ে এল মাঠের দিকে। পোস্ট অফিস এবং শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের দিকে নিয়ে এসে বসতে বলল আমাদের। আমরা সবাই বসলাম এবং তারা মেশিনগান ঠিকঠাক করতে লাগল। আমি ভাবছিলাম যে সম্ভবত এখানেই আমাদের ব্রাশ ফায়ার করবে। আমাদের ভিতর থেকে একজন বলল, "দেখেন আমরাতো নিরীহ কর্মচারী। আমাদেরকে মেরে আপনাদের কি লাভ হবে?" তখন পাক–সেনাদের মধ্য থেকে একজন বলল যে, "বোল শালা, জয় বাংলা বোল। শালে, তোম লোক কো জয় বাংলা বোল। তুমহারা মুজিবর বাপকো বোলাও উ বাচায়গা। তুম লোগ কো সব শালে কো খতম কর দিয়া।" ক্যাপ্টেনের ওখানে কি যেন ওয়্যারলেস এল, তখনই বলল চল্। আমাদের মাঝে ছাত্ররা সকলেই তখন চুপচাপ। আমাদের কর্মচারীদের মধ্যেই একজন শুধু কথা বলছিল। পাক–বাহিনীর ওরা বলল যে, "চল্ হামারা ক্যাপ্টেন সাব বোলাতা হ্যায়। যো অর্ডার দেগা, উই হোগা।" ওয়ারলেসে আলাপ–আলোচনা হয়ে গেছে। মৃত লাশগুলো বিভিন্ন জায়গায় যে রয়েছে ওগুলো আমাদের দিয়ে তুলবে। ডঃ মতিন চৌধুরীর বাসার দিকে যে দেয়াল ভাঙ্গা আছে আমাদেরকে ওখানে নিয়ে গেল। রাস্তার অপর পাড়ে কতকগুলো পাথরের টুকরার স্তপ ছিল। পাথরের টুকরোগুলোর স্তপের উপর ক্যাপ্টেন বসে আছে চেয়ারে। তখন তিনি আমাদের দেখে হাসলেন এবং জোরে বললেন, "শালে বাঙ্গালী, শালে মাদার চোদ, শালে জয় বাংলা বোল। তুমকো মুজিবর বাপকো বোলাও, উই তুমকো বাচায়ে গা"। আমাদের মধ্যে একজন বলল, "আমরা সব কর্মচারী স্যার, ইউনিভার্সিটি কো কর্মচারী হ্যায়। ছাত্র তো কোই নেহি হ্যায়।

হামারা সব ইউনিভার্সিটিতে কর্মচারী আছে”। ক্যাপ্টেন তখন খুব হাসল এবং বলল, “কর্মচারী, বাইন চোদ শালা, সব শালা ঝুটা বলতা হ্যায়, শালা কর্মচারী হ্যায়, ইনকো শালেকো সব চেক করো।” আমাদের সবাইকে হাঁটু পর্যন্ত চেক করল এবং একজন সিপাহী বলল “তুমলোগ উচ কাম করনা পারে গা”। আমাদের মধ্যে একজন বলল, “কেয়া কাম”। পাকসেনা বলল, “কাম করেগা, তোমলোগ কো ছোড় দেগা।'' ছাড়ার কথা শুনে আমাদের মনের মধ্যে কেমন করল। তখন আমরা ঠিক করলাম যে, কাজ করলে যখন ছেড়ে দেবে, যে কাজই হোক না কেন আমরা করতে প্রস্তুত। আমাদের সকলকে দুইজনের এক একটা গ্রুপ করে ভাগ করল। তখন সকাল হয়ে গেছে। আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় যে মৃত লাশগুলি পড়ে ছিল সেগুলো এক জায়গায় তুলে আনার জন্য আদেশ করল। দু'জন করে এক একটা যে গ্রুপ ছিল তাদের মধ্যে আমার গ্রুপে ছিল শ্যামলাল। শ্যামলাল ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে কাজ করত। অন্য গ্রুপের মধ্যে ছিল মিস্ত্রী। ইলেক্ট্রিক কাজ করত এবং তার সাথে ছিল দাসু। দাসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে কাজ করত। শিবু, গয়ানাথের ছেলে এবং আমার ভাই মুন্নিলাল, যিনি পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং–এ কাজ করতেন। আমার বড় ভাই বুধিরাম একজন ড্রাইভার ছিলেন এবং সাথে জহর ছিল, বেলিয়ার বাবা। জহর বোটানী বিভাগে কাজ করত। আমাদের মধ্যে যে ছাত্ররা ছিল, যাদের পাকসেনারা জানত কর্মচারী হিসেবে তাদেরকেও আমাদের কর্মচারীদের সাথে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য দুইজন করে পাক সেনা ছিল। আমাদের কাজ হলো মৃতদেহ টেনে আনা। আমাদের গ্রুপের ঐ দু'জন যারা আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিল তারা আমাদের পিঠে স্টেনগান ঠেকিয়ে নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসত। সবাই দেখছিল এই নাটকীয় দৃশ্যাবলী এবং লক্ষ্য করছিল এই অচিন্তনীয় ঘটনা। মৃতদেহগুলোর মধ্যে যার যার মৃতদেহ এনেছি তাঁরা হলেন, শিববাড়ির রাস্তার ধারে সি এণ্ড বি–এর একটা গোডাউন ছিল। সেখানে প্রথম নিয়ে যায় আমাদের এবং সেখানে ১০/১২ জনের মৃতদেহ দেখলাম। তাদের সবাই আমার অচেনা, হয়ত তাদেরকে ধরে এনে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছে। গোডাউনের মধ্যে পা দেয়ার সাথে সাথে দেখলাম রক্তে একদম সমস্ত গোডাউন ঘরটা ভিজে গেছে। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল একটি একটি করে নিতে। তখন আমি এবং শ্যামলাল দু'জনে একটা লাশ নিয়ে হলের বর্তমান শহীদ মিনারের চত্বরে এনে রাখলাম। হলের বাইরের সমস্ত লাশগুলোকেও আমাদের গ্রুপের সকলে এনে এনে ঐ জায়গায় রাখছে। সব মাথা একদিকে করে লাশগুলো সাজিয়ে রাখা হলো। এর আগের একটা ঘটনা, সকালবেলায়ই উত্তর বাড়ির ছাদের উপরে পানির ট্যাঙ্কে সম্ভবত পাঁচ/ছয় জন ছাত্র ছিল, তাদেরকে পানির ট্যাংক থেকে উঠিয়ে এনে ছাদের কার্নিশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নিচে ফেলে দিল। আমি তখন হল শহীদ মিনারে ছিলাম। সি এণ্ড বি গোডাউন থেকে ১০টা লাশ নিয়ে এলাম। আমি মিশ্রী এবং শিবু ডঃ জি. সি. দেবের লাশ বয়ে নিয়ে এলাম। শিবু এবং মিশ্রী কেউই এখন আর বেঁচে নেই। এরপর শ্যামলাল এবং আমাকে বলল, 'চল্ উধার যানা হ্যায়'। আমরা বললাম 'কাহা যায়ে গা'? তখন পাক সেনারা বলল, 'হাম লোক ইচ্ছা খুশী'। আমরা গেলাম শিববাড়ির প্রথম দালানটাতে মধুদার বাসায়। যখন আমরা তাঁর বাসায় প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম মধুদা'র গর্ভবতী স্ত্রী মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তার ছোট–মেয়ের বুকে বুলেট বা

বেয়োনেটের আঘাতে রক্ত ঝরছে, তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদছে। মধুদা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন, রক্ত ঝরছে। তখন আমাদের তত্ত্বাবধায়ক পাকসেনারা বলল, "শালে দেরী কিউ করতা। উঠ যাও, দেরী নেহি।" আমরা চোখের সামনে যা দেখলাম তাতে আমাদের হতভম্ব অবস্থা। আমাদেরকেও চেনা যায় না, সমস্ত গায়ে রক্ত লেগে ছিল। তখন আমি বললাম, 'মধুদা চলেন'। মধুদা আমাকে বললেন, 'কোথায় নেবে?' আমি বলতে পারলাম না। তখন মধুদা'র ছোটমেয়ে বলছে, আমার বাবাকে এখান থেকে নেবেন না।' তখন পাকসেনারা বলে উঠল, 'এ্যাই লেড়কি চুপ কর, নয় তো গোলী কর দেগা ' আমি এবং শ্যামলাল মধুদাকে ধরে তাঁর দুই হাতের ডানা দু'দিকে আমাদের কাঁধে ফেলে মধুদাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে যখন হাঁটিয়ে আনছি তখন দেখলাম মধুদা'র বুকে রক্ত, অর্থাৎ তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল। তিনি কোন কথাই আর জিজ্ঞেস করেননি বা কথা বলেননি। পাকসেনারা সকলেই রাস্তার উপরে, কেউ চা গরম করছে, কেউ বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছে। তাদের মুখে ঐ একটি কথা আমাদের গালাগালি করা, তারা বলছে যে, 'শালে জয় বাংলা বোল, তোমহারা মুজিবর বাপকো বোলাও, উ তোমলোক কো বাঁচায়েগা'। এইভাবে আশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। ওদের গায়ে কোন রক্তের দাগ ছিল না। মধুদাকে বর্তমান হল শহীদ মিনারের যেখানে সমস্ত লাশগুলোকে এনে রাখা হয়েছিল সেখানে এনে বললাম, 'মধুদা আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন।' তখন মধুদা আমাকে বলেন যে, "ওরা কারা, এগুলি কি সবই মৃত? " তখন আমি মধুদাকে বললাম "এগুলো কারা আপনি জানেন না? এরা সবাই মৃত। আর কিছুক্ষণ পর আমাদেরও ঐ একই অবস্থা হবে। আপনি এক কাজ করুন, শুয়ে পড়ুন।" রক্ত ঝরতে ঝরতে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। দেখলাম শিববাড়ির শিবমন্দির থেকে চারজন সাধুকে ধরে আনল, আমি তাঁদের মধ্যে একজনকে চিনতাম। যার নাম ছিল ব্রজানন্দ সাধু। ব্রজানন্দ সাধুর প্রিয় ভক্ত ছিল মুকিন্দ্র সাধু। যার সাথে আমার খুব ভাল আলাপ ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় তার সাথে আলাপ করার কোন সুযোগ পেলাম না। তখন কাকে কি বলব সে ভাষা খুঁজে পেলাম না। আমরা সবাই তখন মৃত্যুপথযাত্রী। আমরা কেউই এখান থেকে বাঁচব না তা জানি। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে তাও জানি। আমি তখন স্থিরনিশ্চিত যে আমি মরব। তাই ভাবছিলামও না আমরা কি করে বাঁচব। এত লাশ দেখে কোন কিছু আর চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমরা কেউই কোনভাবে আর পালানোর চেষ্টা করিনি। আমি ভাবলাম যে, আমার মা রয়েছে, বোন রয়েছে, আমি একা প্রাণ নিয়ে কোথায় যাব? মেরে যদি ফেলেই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলুক, একসংগে আমরা মরে যাব। তখন শিববাড়ির সাধু চারজনকে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং পাক সেনারা বলল, "তোমরা ঠায়রো ইয়া পার।"

এভাবে চারদিক থেকে মৃতদেহগুলো আনা হল। কোথায় আর কোন মৃতদেহ নেই, আশপাশে যা ছিল সব আনা হয়েছে বর্তমান শহীদ মিনারের চত্বরে। ডঃ জি. সি. দেবের সমস্ত গায়ে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়েছে। ডঃ দেবের পরনে তখন ছিল ধুতি আর গেঞ্জি। তার নাকে-মুখে কোন গুলি না লাগায় আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তার প্রাণের স্পন্দন পুরোপুরিই থেমে গেছে, তিনি তখন সম্পূর্ণ মৃত। মোটা মানুষ ছিলেন ডঃ দেব, তাই ঐ অবস্থায় তাঁকে ভীষণ অদ্ভুত দেখা যাচ্ছিল। বুলেটের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর শরীর ফুলে গেছে। যখন সকাল সাড়ে আটটা কি নয়টা

বাজে তখন আমার জানামতে সম্ভবত বিশজনের লাশ টেনেছিলাম শ্যমলাল এবং আমি দু'জনে। শ্যামলাল এবং আমার মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। আমি শ্যামলালের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু সে কোন শব্দ করেনি। আমি তাকে বললাম, "আমাদের কোন উপায় নেই, এখনই মরে যেতে হবে। কাজেই তোমার কোন কথা থাকে তো বল, আমরা কিছু আলাপ করে নেই।" কিন্তু তার কাছ থেকে কোন শব্দ পেলাম না। তখন আমি বুঝলাম ভয়ে সে সন্ত্রস্ত, হতবাক। ভয়ে তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে কোন স্বরই বের হচ্ছে না। যখন সব লাশ আনা হলো তখন দেখলাম মেয়ে লোকের কোন লাশ নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শুয়ে আছে সবাই। হিন্দু-মুসলমান বুঝলাম এইভাবে যে, আমি একজন মৌলানা সাহেবকে তার মধ্যে দেখতে পেলাম যার মাথায় টুপি ছিল, মুখে দাড়ি ছিল, তিনি তখনও জীবিত, কলেমা পড়ছেন। আমাদেরকে দিয়ে যারা লাশ টানিয়েছিল তারা এ সময় চলে গেল এবং অন্য ছয়জন পাক-সেনা এলো। তখন আমি ভাবলাম যে ওরা চলে যাচ্ছে কেন? তখন দেখলাম যে ওরা গালাগালি করছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিকমত বের হচ্ছে না। আমি বুঝলাম যে ওরা খুব মদ খেয়েছে এবং এ অবস্থায় ওদের ভাষায় আমাদের বলল যে, 'তুমলোক সব লাইন হো যাও। লাইন হও শালে সব, শালে বাইন চোদ, সব শালে লাইন হো যাও। দেরী মাত কর লাইন হো।" তখন লাইন হবার কথা শুনে আমাদের মধ্যে কী একরকম অবস্থা হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কেউ হাতজোড় করছে, কেউ বলছে যে আমার ছেলে আছে, আমার মা আছে, আমার বোন আছে, আমাদেরকে একবার দেখা করতে দিন আপনারা। এই রকম করুণ আর্তি শুনতে পাচ্ছি আমি, কিন্তু যারা এ রকম বলছে তাদেরকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। সামনে যারা আছে তাদেরকে গুলি করে ফেলে দিচ্ছে। এ সমস্ত দেখে আমি ভাললাম যে, এদের কাছে আবেদন-নিবেদন কোন কথাই কোন কাজে আসবে না। তাই পশুদের কাছে কোন কথাই আমি বলব না। আমি তখন লাইনেই দাঁড়ানো আছি। আমি লাইনে কয়েকজনের পাশে ছিলাম। তিন/চারজনের পিছনেই ছিলাম আমি, আমার পাশেই ছিলেন আমার বড়দা। এর পরে ছিলেন একজন বাইরের লোক, তাকে আমি চিনতে পারিনি। এর পরে ছিলেন ঐ মৌলবী সাহেব। তিনি যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তিনি ভাল মানুষ। তখন অপর দিক থেকে গুলি করছে। গুলি করা দেখে মৌলবী সাহেব কলেমা পড়তে লাগলেন এবং কোরান-হাদিসের বিভিন্ন আয়াত পড়তে লাগলেন। মৌলবী সাহেব হয়ত কিছুদূর এগিয়ে যখন ওদের কাছে গিয়েছিলেন তখনই তাকে গুলি করে। পরপর তিনটা গুলি করল তাকে। এরপরে আমার দিকে পজিশন নিল দেখলাম। যখন একটা গুলি এসে আমার ডান উরুতে লাগল তখন আমি মৃতদেহের পাশে পড়ে গেলাম। আমার বড়দাকে দেখলাম যে তিনি গুলি খেয়ে পড়ে গেলেন। কেউ কেউ একে অপরের কাছে গুলি খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি তখনও সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করতে পারছি, গুলি খেলেও আমার জ্ঞান ছিল সজাগ। গুলি খেয়ে একে অপরের কাছে যাচ্ছে আর হাতজোড় করছে কেউ কেউ। কেউ বলছে, মেরো না আমাদের এভাবে। আমার বড়দা যখন গুলি খেলেন তখন উনি উঠে যেতে চাইলে আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে চেপে রাখি। রক্ত ঝরার শব্দ, যা কোনদিন শোনা সম্ভব নয়, তাও আমি শুনেছি। ফিনকি

রক্ত একসাথে বের হবার শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা পানির ট্যাপ খুললে যদি খুব জোরে পানির চাপ আসে তাহলে যে শব্দ হয় তাই হচ্ছিল। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যা কারুর পক্ষে কোনদিনই শোনা সম্ভব হয়নি। তখন দেখলাম যে পাকসেনারা হালকা মেশিনগান ঘুরিয়ে যারা এদিক-ওদিক করছে বা নড়ছে তাদের উপর পুনরায় গুলি করছে। যাদেরকে ওরা গুলি করেছে তাদের মৃত্যুকে ওরা নিশ্চিত করতেই পুনরায় গুলি করছে। আমার ভীষণ চিন্তা হয়ে গেলো আমার উপর আবার গুলি করে কিনা। যখন দেখলাম যে আবার আমার উপর গুলি করার পদক্ষেপ নিচ্ছে তখনও বড়দাকে আমি চেপে রেখেছি। তিনি উঠতে চাইছেন, আমি তাকে বললাম, 'তুমি একটু ক্ষান্ত হও, উঠতে যেও না।' এই বলে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে চেপে ধরলাম কিন্তু রাখতে পারিনি। যতক্ষণ আমি তাকে চেপে ধরে রেখেছি তাতে আমি দেখেছি যে, আমার হাত আর তার শরীর থেকে উঠছে না। মনে হল যেন চুম্বকের মত আমার হাতটা আটকে আছে। এ অবস্থায় দাদা বলছেন, "আমার মেয়ে আছে, আমার স্ত্রী আছে, আমি কিভাবে তাদের কাছে যাবো? আমার স্ত্রী আর মেয়েটাকে একটু দেখতে চাই।" আমি তখন তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে একটু পরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপর দেখলাম পাক সেনারা চলে যাচ্ছে। যখন পাক সেনারা চলে গেল তখন বড়দা আমাকে বললেন, "আমাকে ছাড় তুমি, আমি যাবো।" আমি দেখলাম যে পাকসেনারা গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে। তখন বড়দা উঠে দৌড় দিলেন, কিন্তু কিছুদুর যাবার পর তিনি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। তখন এই হল এলাকায় কোন সৈন্যই ছিল না; অর্থাৎ শিববাড়ির এলাকা দিয়ে যারা প্রবেশ করেছিল তারা সকলেই চলে গেল। যারা এসেছিল তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জনের মত। সকলেই চলে গেল। তখন আমি দেখলাম যে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সবাই জল নিয়ে দৌড়ে আসছে। ঘটির মধ্যে জল নিয়ে আসছে কারণ যারা গুলি খেয়ে পড়েছিল তারা 'জল দাও' 'জল দাও' চীৎকার করছে। জল নিয়ে যারা দৌড়ে আসছিল তাদের মধ্যে বিন্দুর মা ছিলেন, দাসুরামের স্ত্রী ছিলেন। দাসুরাম ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে মালীর কাজ করত, এখনও তার স্ত্রী ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে মালীর কাজ করে। তখন আর কেউ আসছিল কিনা বলতে পারব না, কারণ তখন আমার চোখ নিস্তেজ হয়ে আসছিল, শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল, চোখে লাল রক্তের মত রং দেখছিলাম। তখনই উপস্থিত হল আমার মা, বোন এবং বৌদি। তারা আমাকে একটু জল খাওয়াল। আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে জল দিও না, আমাকে তুলে নিয়ে চল এখান থেকে। তখন তারা আমাকে নিয়ে এল, কিন্তু বড়দা তখন জীবিত থাকলেও তার খবর কেউ করতে পারেনি বিধায় তাকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। অনেক লাশের মধ্যে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব হয়নি। বিন্দুর মা আর কয়েকজন ছেলে মিলে তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে আসছে। তখনও ওনার স্বামী জীবিত ছিল। হয়ত বাঁচবেন না, কিছুক্ষণ পরই মারা যাবেন এই অবস্থা। আমাদের জগন্নাথ হলের বল খেলার মাঠে বর্তমানে যে গ্যালারী আছে সেখানে নিয়ে এল। তখন দেখলাম হলের ইলেক্ট্রিশিয়ান চিৎবল্লী একদম পাগলের মত ছুটাছুটি করছে। ওদিকে কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমাকে সবাই ধরে ঘরে নিয়ে এলো। আমার শরীরের রক্ত দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেলো, দেখলো যে রক্তে ঘর

যাচ্ছে। আমি দেখলাম যে একটা পানির গামলা নিয়ে ঘরের মধ্যে যে রক্ত পড়ছে তা মাটি থেকে গামলায় তুলছে আমার মা। আমি ভাবলাম যে আমি যখন জীবিত আছি তখন এভাবে এই অবস্থায় আর অপেক্ষা করলে আমাকে মরতে হবে। তাই প্রথমেই ভাবলাম রক্ত যে ঝরছে, তা কিভাবে বন্ধ করা যায়। আমার শরীরে দুর্বলতা এসে যাচ্ছিলো এবং শরীর শিথিল হয়ে আসছিলো তখন। মাকে বললাম, "মা তোমরা কেঁদো না, সবাই এখান থেকে চলে যাও। তোমরা এখানে থাকলে মারা পড়বে।" মা বললেন, "তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, সবাই তো মরে গেছে। কে আমাদের দেখবে, কে আমাদের খাওয়াবে?" আমি বললাম যে "বোন এবং বৌদিকে নিয়ে তোমরা এক্ষুন্নিচলে যাও, আর আমার জন্য এক জগ পানি এখানে রেখে দাও। যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। আর যদি মরেই যাই তাহলে এই ঘরেই আমার কঙ্কাল পাবে এবং এখানেই আমার স্মৃতিটা করে দিও। তোমরা চলে যাও।" সকলেই তখন গাঁট বেঁধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা যেতে চান না, তাকে অনেক বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি তখন একদম একা, আর কারও কোন শব্দ পাচ্ছি না। ভাবলাম যে সত্যিই সকলে চলে গেছে। পানির জগটা তুলে পানি খাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে শক্তিটুকুও নেই যে পানির জগটা তুলে পানি খাব। সমস্ত শরীর আমার ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমার যখন এ অবস্থা তখন দেখলাম মা কয়েকজন লোক নিয়ে ঘরে উপস্থিত। মা সবাইকে বললেন "আমার ছেলেকে তোমরা বাঁচাও। তোমাদের যত টাকা–পয়সা লাগে আমি দেব, তবুও ওকে একটু মেডিক্যালে নিয়ে যাও।" তখন তারা তাড়াতাড়ি করে আমাকে ধরে বাঁশের বেড়ার উপর তোলে। হয়ত কারও ঘরের দরজা ছিল, এই বেড়াটাকে নিয়ে আমাকে তার উপর তুলল এবং আমার উপর কাপড় ঢাকা দিয়ে তারা ছুটলো। বকশীবাজার যাবার পথে মেডিক্যালের পিছনের গেট দিয়ে মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে এল। আর তখনই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। মেডিক্যালের ডাক্তাররা আমাকে ঘিরে থাকল এবং আমাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকল। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো–আপনি কি ছাত্র না অন্য কিছু? আমি বললাম–আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানী বিভাগের একজন কর্মচারী। আমি হলেই থাকি। ডাক্তাররা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে সবাইকেই কি মেরেছে?" আমি তাদেরকে তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করলাম। তখন প্রফেসর সাহেব সবাইকে বললেন, "একে জলদি করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও। ওকে আর বেশি কথা জিজ্ঞেস করার সময় নেই।" আমার শরীরের যেখানেই আঙ্গুল দেয় সেখাহে আঙ্গুল দেবে যায়। এই অবস্থায় আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। এরপরে আমার চিকিৎসা হতে লাগল। পরে শুনেছি যে গুলি করে মেরে যাবার ঘন্টাখানেক পরে ট্রাক্টর, রোলার ইত্যাদি এনেছিল এবং মৃতদেহগুলো যতদূর সম্ভব নিয়েছে ট্রাকে তুলে, আর যেগুলো নিতে পারেনি সেগুলো সব ট্রাক্টর দিয়ে পুঁতে রেখেছিল। শ্যামলালের কোন গুলি লাগেনি, সে ওখান থেকে পাক– সেনারা চলে যাবার পরই চলে এসেছে।

মোহন
পেশা ঃ মালী, বয়স ঃ ২৫।
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[জগন্নাথ হল ও তৎসংলগ্ন এলাকা হতে গণহত্যার শিকার লাশগুলোকে জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো করার পর সবার সাথে লাইনে দাঁড়িয়েছিল মোহন। পায়ে গুলি লেগেও বেঁচে যান মোহন। জীবন-মৃত্যুর সংকটময় সময়ে মানবতার ডাকে সহযোদ্ধাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন তিনি।]

জগন্নাথ হল। ২৫শে মার্চের রাত। তখন আমি জ্বরের জন্য খুব অসুস্থ ছিলাম। আমি ঘুমে অচেতন, হঠাৎ বিকট একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখলাম যে, চারদিকের আকাশে লাল আলো এবং ধোঁয়ার আভা। দেখলাম আরও দুইটি সবুজ রং আকাশে ভেসে উঠল, মোট তিনটা শব্দ হয়েছিল। আমাদের ঘর থেকে দেখি যে জগন্নাথ হলের মাঠের পাশের রাস্তায় গাড়িভর্তি পাক-সৈন্য। মাঠের দেয়াল ভাঙ্গা থাকায় গাড়ি ভর্তি সৈন্য মাঠের মধ্যে ঢুকলো। দেয়ালটা ভাঙ্গা ছিল, কারণ ইউ. ও. টি. সি'র ট্রেনিং এই জগন্নাথ হলে হত। গাড়িভর্তি সৈন্য আমাদের বাসার সামনেই রাখল। আমি এসব ঘর থেকেই দেখছি, বের হচ্ছি না। আমি বাবাকে ডেকে বললাম পাক আর্মিরা দরজা খুলতে বলছে, বাবা তখন উঠে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকেই ওরা আমাদের ঘরের সমস্ত লোকগুলোকে বাইরে বের হতে বলল। আমরা যারা ঘরের মধ্যে ছিলাম তারা সবাই বাইরে বের হয়ে এলাম। আমরা উর্দুতে বলছি ঃ "হাম লোক কৈ কাছুর নেই হ্যায়, হাম লোককা উপর ক্যা জুলুমছে আয়া।" ওরা আমাদের বলল ঃ "তুম লোক উর্দুমে বাত চিতকে বাতায়া সামাজ মে নেহি তো হাম মেজর সাব কো বোলায়া।" রাতে আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল মেজর সাহেবের কাছে, তখন প্রায় রাত চারটা, অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরেই আজান দিয়েছে। টিনশেডের ছাত্রাবাস, ন্যাশনাল ব্যাংক এগুলিতে আগুন লাগানোর পরই আজান দেবে। কি একটা পাউডার দিয়ে ওরা আগুন লাগালো। আমরা প্রথমে মেজরের কাছ থেকে চলে আসার পর আবার আমাদের ডেকে নিয়ে গেল লাশ টানার জন্য এবং লাশ টানার জন্য আমাদের দুটো ভাগ করলো। বাংলাভাষী এবং উর্দুভাষী এই দুটো ভাগে ভাগ করা হলো আমাদের দুইদিকে। দুই গ্রুপ সৈন্য আমাদের ভার নিল কাজ করানোর। বাংলাভাষী গ্রুপ কাজ শুরু করলো হলের ভিতর, আর অন্য গ্রুপ সৈন্য আমাদের নিয়ে গেল শিববাড়ির দিকে। আমার সাথে আরও পাঁচজন লোক ছিল। এদের মধ্যে বুধিরাম, আমি মোহন, মিস্ত্রীর ছেলে, জহরলাল এবং অন্য আর একজনের নাম আমার মনে নেই। আমি এবং আমাদের অন্য ক'জন মিলে দেব বাবুর লাশ টেনে আনি, রক্ত মাখা ভারী শরীর। আমরা যখন দেব বাবুকে আনছি তখন তার পরনের ধুতিটা খুলে গিয়েছিল এবং আমরা পরস্পরের মধ্যে বাংলায় কথা বলছি। আমি তখন দেব বাবুর লাশ মাটিতে রেখে তাঁর কাপড়টা ঠিক করে দিচ্ছি। এর মধ্যেই আমার ঘাড়ে রাইফেলের বাট দিয়ে মারলপাকসৈন্য। বলল ঃ

"তুম ইয়ে লাশকো কিউ রাখতা হ্যায়, এক সাথমে টেনে চল।" আমি তখন লাশটা আবার টেনে তুললাম এবং বর্তমান শহীদ মিনার পর্যন্ত এনে রাখলাম। আমরা যখন দেব বাবুকে আনতে গেলাম, তখন দেখলাম যে সমস্ত ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ। আমাদেরকে আর্মির লোকজন দরজা ভাঙ্গতে বললো কিন্তু আমাদের হাতে কিছু না থাকায় আমরা তা পারিনি। তখন পাক–সৈন্যরা লাথি মেরে তা ভাঙ্গলো। ঘরের ভিতরে আর কোন লোকজন ছিল না। বাইরে থেকে দেব বাবুকে ওরা গুলি করেছে, জানালা দিয়ে দেববাবুর বুকে গুলি করেছে এবং দেববাবু বিছানার কাছে পড়ে আছেন। পরে আমরা দেব বাবুর লাশ টেনে নিয়ে বর্তমান জগন্নাথ হল শহীদ মিনারের কাছে রাখি। চারদিক থেকে আরও লাশ টেনে আনা হচ্ছে, আমি যে সমস্ত লাশ টানিনি তাঁদের মধ্যে পরিচিত মধুদাকে জীবিতাবস্থায় এখানে টেনে আনা হয়েছিল। জগন্নাথ হল থেকে যে সমস্ত লাশ আমি টেনেছি তা সবই শক্ত হয়ে গেছে। উত্তর বাড়ি থেকেও বহু লাশ আমি এনেছি, উত্তর বাড়ির রুমের মধ্যে এবং বাইরে এ সমস্ত লাশ পড়ে ছিল। এরা যে কিভাবে মারা গেল, বোমা না গুলি তা বুঝতে পারা যায় না। পেটের মধ্যের কিছুই নাই, এমনিভাবে মারা হয়েছে। মনে হয় যে পেটের মধ্যের যা তা সবই তুলে নেয়া হয়েছে। যারা প্রথম প্রথম গুলি খেয়েছে তারা শক্ত হয়ে গেছে। পুকুরের পাড় থেকেও আমি অনেক ছাত্রের লাশ টেনেছি। ভোরের দিকেই ঐ সমস্ত জায়গা থেকে আমি ছাত্রদের লাশ টেনেছি। এইভাবে আমাদের দিয়ে অনেক লাশ টানানোর কাজ করালো ওরা। যে সমস্ত ছাত্রের লাশ আমি টেনেছি তাদের সবাইকে আমি চিনি না, তবে যাদের সাথে ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছি কিন্তু নাম জানিনা তাদেরকেও আমি শহীদ মিনারে এনে রেখেছি। এদের মধ্যে আমি একজন ছাত্রকে স্বাধীনতার পরেও দেখেছি। সে এখনও বেঁচে আছে , তবে নাম জানি না। যে সমস্ত ছাত্রদের টেনেছি তাঁদের কেউ কেউ তখনও বেঁচে ছিলেন। , তখনও কথা বলছিলেন। তাঁরা বলছে যে, "আমাদের এখানে রেখো না। অন্য জায়গায় নিয়ে চল। আমাদের অন্য ব্যবস্থা কর।" আমরাও তখন ভয়ে ছিলাম। আমরা বললাম' "একটু চুপ করে থাকেন, ওরা সরে গেলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।" আমাদের তো ওখানে বেশিক্ষণ থাকাও নিষেধ, তাই আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি। তাদের কারও কারও পা ভেঙ্গে গেছে, হাত ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু মারা যায় নাই। এর পরে যখন সমস্ত লাশ টানা হয়ে গেল তখন আমাদের যারা উর্দুতে কথা বলতে পারি তাদেরকে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। এদের মধ্যে আছে আমার কাকাত ভাই মিস্ত্রী, উনি মারা গিয়েছেন। মিস্ত্রী উর্দুতে পাক–সেনাদের সাথে কথায় কথায় বহু কথা জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি যেন তর্ক বেজে গিয়েছিল। মেজর মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপলোক বিহারী হ্যায়?" বুঝতে পারছিলাম মেজর তা বিশ্বাস করছিলেন না। আমরা তবুও কথা বলছি, সকলেই কাতর প্রার্থনা করছি। আমরা বললাম, "আপ জবান কো পয়জাল করনে হ্যায়?" তবুও মেজর আমাদের কিছুই বিশ্বাস করলেন না। বহুক্ষণ পর বললেন, "ঠিক হ্যায়, ইয়ে লোককো লিয়ে যাও।" আমাদেরকে অনেক আগেই মারার আদেশ দিয়েছিল। আমাদেরকে নিয়ে যাবার আদেশ দেবার পরে বর্তমান শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হল। আমরা যারা উর্দু কথা বলতে পারি সেই গ্রুপেই নিয়ে আসা হল শহীদ মিনারে। আমাদের নেবার পর তারা গুলি করার আয়োজনে বন্দুক ঠিক করছে এটাও আমরা দেখছি তখন। অন্যদল তখনও লাশ টানার কাজ করছে এই ন্যাশনাল ব্যাংকের দিক থেকে। চারদিকেই গার্ড দেয়া

আছে যাতে কেউ পালাতে না পারে। আমরা এ সমস্ত দেখে ভীষণ কান্নাকাটি করছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমরা শুধু কান্নাকাটিই করছি আর কোন কথা বলছি না। আমাদেরকে লাইন করতে বললো এবং আমি ছিলাম লাইনের একেবারে প্রথমে। হঠাৎ আমার কিসের যেন একটা চোট লাগল, আমি পড়ে না গিয়ে কয়েকজন লোকের পিছে চলে গেলাম। একজনের পেটে গুলি লাগার পর দেখলাম তার পেটের সমস্ত কিছু চলে গেছে। ওটা দেখেছিলাম বলেই আমার চোট লাগার পর আমি ভেবেছি যে আমি মরে গেছি, আমারও পেটের মধ্যের কিছু নেই। তখন আমি লাফ দিয়ে পুরনো লাশগুলো যা মৃত তাদের মধ্যে গিয়ে লুকালাম, ওখানে লুকিয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তার পরে কি হয়েছে তা আমি কিছুই টের পাইনি। যখন হুঁশ হলো তখন দেখলাম যে আমার গায়ে একটাও গুলি লাগেনি। আমি আমার পা দুটো একটু নাড়াচাড়া করলাম। তখন ওরা আমাকে আবার গুলি করল পা দু'টোকে জোড়া করার সাথে সাথে। আমার পায়ে দুটো গুলির একটা উরুতে এবং অপরটা পায়ের হাঁটুর নিচে লাগে। আমি ভাবলাম যে ওরা যখন এখনও আছে তখন পা দুটোকে ছেড়ে দেই। শেষে দেখলাম আর ওরা গুলি করল না। তখন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি এবং আবার যখন হুঁশ হয় তখন দেখলাম ওরা আর কেউ নেই। আমি দেখলাম যে আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, পা ফুলে গেছে আর লুঙ্গিটুঙ্গি যা ছিল তা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমার কাছেই দেখলাম বুধিরামকে। আমি মাথা উঠাইনি, যখন অনুভব করলাম যে আর্মি সব চলে গেছে। তখনই শুনলাম চারদিক থেকে শুধু পানি, পানি। আমি তখন ভাবলাম পাক আর্মি শুধু মেরেই ফেলে যাবে না, আবার হয়ত লাশগুলোকে কিছু করতে ওরা আসবেই। আমি দেখলাম বুধিরাম উত্তর বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে, আমি তখন তাকে দুলাভাই বলে ডাক দেই। তিনি শুনলেন এবং দাঁড়ালেন, আমিও দেখলাম যে তাঁর পেটের মধ্য থেকে সমস্ত নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসছে। তিনি খুব কষ্ট করে পেট চেপে ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে নিয়ে উত্তর বাড়ির ভেতরের দিকে গেলাম এবং আমাকে তিনি বললেন যে, "আমাকে একটু পানি দাও।" আমি বললাম এখান থেকে বের হয়েই পানি খাওয়াব। উত্তর বাড়ির কাছে যে গেট সেখান থেকে আমরা দু'জনে আস্তে আস্তে শিক্ষকদের কলোনীর দিকে গেলাম এবং বহু কষ্ট করে দেয়ালটা পাড় হলাম দু'জনেই। আমরা দেয়ালের ওপাশে গিয়ে আমাদের বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ জামাল, সাহেবকে ডেকে বললাম যে, "আমি স্যার আপনার বিভাগের একজন মালী। আমাকে বোধ হয় চিনতে পেরেছেন। স্যার আমার পয়ে গুলি লেগেছে, আপনার বাসায় আমি আসব, একটু পায়ে কাপড় বেঁধেই আবার চলে যাব।" তিনি আমাকে কিছু বললেন না। আমি আর স্যারের বাসার দিকে না গিয়ে রোকেয়া হলের দেয়াল টপকে গেলাম। ওপারে গিয়ে দেখলাম ভিতরে কাজের লোকগুলো কাজ করছে। তারা আমাদেরকে দেখল এবং আমরা একটা ডিপোর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। বুধির গায়ের রক্ত সব বের হয়ে যাচ্ছিল, তাই ঢুকেই তাড়াতাড়ি তা বাঁধার চেষ্টা করলাম। এক সময় দেখলাম যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তাকে বহু ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু সে উঠল না। আমি আর অপেক্ষা না করে আমার মাসীর কাছে চলে গেলাম। ভিসির বাড়িতে তিনি মালীর কাজ করেন। তাঁকে ডেকে আনালাম এবং বহুকষ্টে তাঁর সাথে তাঁর বাড়িতে চলে গেলাম। পরের দিন কারফিউ তুলে নেয়ার পর মেডিক্যালে চলে গেলাম। ভিসির বাড়িতে থাকাকালে সবাই বলছে যে, গুলি খাওয়া লোক এখানে এসেছে শুনলে এখানেও আর্মি হানা দেবে। যাই হোক

এখানেও আর্মি হানা দেবে। যাই হোক মেডিক্যালে গিয়ে প্রায় মাস দেড়েক পর সেখান থেকে ভাল হয়ে আসি এই হলে। বুধিরাম ওখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকল আর উঠতে পারল না, হয়ত ওখানেই শেষ। হলের ছাত্র একজন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করত তার সাথে মেডিক্যালে দেখা হলো। তাঁকে ২য় গ্রুপে গুলি করেছে এবং ওনার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। টেলিভিশনে যখন আমার কথা নেয়া হলো তখন আমি আমার স্যারের ব্যবহারের কথা বলেছিলাম, সত্য কথাই বলেছিলাম, ভয় কি? তবে রোকেয়া হলে যাবার পরে লেবাররা জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা হিন্দু না মুসলমান। আমরা বলেছিলাম আমরা মুসলমান, তবুও তারা আমাদেরকে সহায়তা করেননি ভয়ের কারণেই।

শ্যামলাল
মালী, উপাচার্য ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[শ্যামলাল রাজভর ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও মধুদার মৃতদেহ বহন করে জগন্নাথ হলের মাঠে এনেছেন। তার সাথে ছিল চান্দ দেব রায়। তাদের উভয়কেই পরে জগন্নাথ হলের মাঠে লাইনে অন্যান্যদের সাথে গুলি করে। কিন্তু উভয়েই আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছেন। শ্যামলাল রাজভর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।]

আমার শালা কাজ করত নিপা অফিসে। ২৫ তারিখ সে এসে আমাকে বলল তুমি আজকে ঘর ছেড়ে চলে যাও। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–"কেন ঘর ছেড়ে চলে যাব?'' সে বলল, এমন হতে পারে পাক–সেনারা এসে তোমাকে গুলি করতে পারে। আমি বললাম, বেশ ভাল কথা, মরতে হলে আমি আমার ঘরের সামনে মরব, তবু আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব না। নিপায় নাকি এরকম কথা নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে, সে খবর আমার শালা আর চান্দুর ভাই মনিলাল আমাকে এসে বলল। একথা শুনে আমি বাইরে চলে গেলাম, বাসায় বলে গেলাম। তোমরা সবাই খেয়ে দেয়ে রেডি হও। বাইচান্স যদি ঘর ছাড়তে হয় তবেই ছাড়বো। পাক–সেনারা যদি আসেই তাহলে মরতে হলে মরবো। তারপর বাসায় ফিরে খেয়েদেয়ে বসে আছি, এমন সময় রাত এগারটা সাড়ে এগারটার দিকে হলে মিলিটারীর গাড়ি ঢুকল। জগন্নাথ হল এলাকায় মতিন চৌধুরীর বাড়ি ছিল। তার বাড়ির দেয়াল পাক– সৈন্য ট্যাংক দিয়ে ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকল। আমার ঘর ছিল বর্তমান হলের গ্যালারীর সামনে। ১৩টি গাড়ি গোলাবারুদ ভর্তি হলের ভিতরে ঢুকল। গাড়ির চাকায় ছিল হাফ পাম্প। গাড়ি এসে আমার ঘরের সাথে দাঁড়ালো। তারপর একজন একজন করে পুরুষ লোকদের, তারা ঘর থেকে ধরে নিয়ে এসে গোয়ালঘরে আটকে রাখল। পাকিস্তানীরা আমাদের জিজ্ঞাসা

করল–''তোমরা কি জয় বাংলার লোক''? আমরা উর্দুতে জবাব দিলাম, "না স্যার, আমরা জয় বাংলার মানুষ না। হাম লোক মুসলিম লীগ হ্যায়। হাম সব ভাংগী হ্যায়"–মানে সুইপার। "ইধারমে ঢোকো" বলে কয়েকটা বাড়ি দিয়ে ওরা আমাদেরকে বন্ধ করে রাখলো। রাত ১১টা সাড়ে ১১টার সময় অপারেশন শুরু হলো। এই ঘরের মধ্যে ৬০ জন লোক ছিলাম আমরা। দেখলাম ৭ জন কর্মচারী, কিছু রিকশাওয়ালা, কিছু ঠেলাগাড়িওয়ালা, কিন্তু কোন ছাত্রই নেই সেই ঘরের মধ্যে। এর আগেই ৭ জন ছাত্রকে দেখেছি যাদের আমার ঘরের কপাটের সামনে মেরে ফেলেছে। রাত ৪টার দিকে শেষ হলো জগন্নাথ হলের অপারেশন, পুরুষ লোক যেখানে যাকে পেয়েছে মেরেছে। ছাত্রদেরকেও মেরে ফেলেছে। পুরুষ লোক বলতে কোন লোক নেই জগন্নাথ হলের মধ্যে। যা আছে ৬০টি লোক তা এই ঘরের মধ্যে বন্দী। এই ৬০ জনের পিছনেও ৬০ জন পাক–সেনা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিয়ে হলের যেখানে যত লাশ পড়ে ছিল সেগুলো এনে হলের বর্তমান যেখানে শহীদ মিনার সেখানে রাখতে বলল। আমি প্রথমে নিয়ে এলাম দেববাবুর লাশ। আমাদের জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট। [সাক্ষাৎকারদানকারী অবগত ছিলেন না যে গোবিন্দ দেব তখন আর জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট নন।–সম্পাদক]

আমি এবং আমার শালা তাঁকে হেঁচড়িয়ে বাইরে নিয়ে এলাম। এত বড় বডি কিভাবে আনি। স্যারের পরনে একটা ধুতি কাপড় ও গেঞ্জি ছিল। তাকে রেখে আবার গেলাম শিববাড়ির স্টাফ কলোনীতে। ওখানে গিয়ে পেলাম মধুদাকে, মধুদার তখনও জ্ঞান ছিল। মধুদা বললেন, "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" উনি আবারও বললেন ঃ "আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।" আমি বললাম ঃ "আপনার শক্তি থাকলে আপনি অন্য কোথাও চলে যান, না হলে এই লাশের সাথে ঘুমিয়ে থাকুন।" মধুদাকে নিয়ে আমরা বহু লাশের মধ্যে শুইয়ে দিলাম। দেয়ালের উপর স্টেনগান নিয়ে সেনারা বসে আছে, তারা আবার ঐ লাশের উপর গুলি করল। আবার আমরা লাশ আনতে গেলাম। রাস্তার পাশে একটা বড় ঘর ছিল, সেখানেও বহু লাশ ছিল। পাক–সেনারা বলল, "জলদি কর শালারা।" লাশ টানা হয়ে গেলে আমাদের ৬০ জনকে লাইনে দাঁড় করানো হলো। এই লাইনের ভিতরে অনেকেই আমার পরিচিত। আমার এক সম্বন্ধি, এক শালা, সীতানাথের ছেলে শঙ্কর বিহারী, তার দুই ছেলে, খগেন দে ওতার ছেলে মতিলাল আর আমাদের একটা মালী। তারপর দুইটা পাক–সেনা দুই দিক থেকে গুলি করল। গুলি করার আগে কাউকেই কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। কিছুদিন আগে আমি একটা ছবি দেখেছিলাম 'ওয়ার্ল্ড অপারেশন।' সে ছবির একটা কাজ আমি এখানে করেছিলাম। আমাকে যখন ফায়ার করল তখন আমি ডেডবডি নিয়ে মাটির সাথে লেগে গিয়েছিলাম, মাটির সাথে আমি এক হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা অপারেশন শেষ করে শিববাড়ির দিকে চলে গেল, সেখানে ওদের আরও একটা পার্টি ছিল। সেখানে ওদের খাওয়া–দাওয়া সবকিছু রেডি। কলা, বিস্কুট, সিরাপের বোতল অর্থাৎ সবগুলিতেই ব্র্যাণ্ডি, দামী–দামী বোতল সব। যারা অপারেশন করেছে তারা সব বুড়ো লোক, যুবক মিলিটারী একটাও ছিল না। গুলি করে বহু লোক মারা সত্ত্বেও বহু লোক তখনও জীবিত ছিল। আমার বাবা, আমার ভাই, আমার বড় সম্বন্ধি আর চাঁনদেব এরা তখনও জীবিত। ওরা চলে যাবার পর আমি উঠে যে বাসায় কাজ করতাম সেখানে গেলাম। বাড়ির মালিকের নাম এম. এন. হুদা, যিনি কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী (?) হয়েছিলেন। বাড়িতে ঢোকার পর দেখি পাক–সেনারা তাঁর ফ্যামিলিকে গ্রেফতার করে রেখেছে। আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। এম. এন.

হুদার মেয়েকে ধরে বাইরে নিয়ে এল। তখন ওনার মেয়ে বলছিল, "দেখুন, আইয়ুব খান আমার আব্বাকে একটা সোনার মেডেল দিয়েছে।" মেডেলটা পাক-সেনাদের হাতে দেয়া হয়েছিল, প্রাইজটার মধ্যে আরবীতে কি যেন লেখা ছিল। বেগম সাহেবা বললেন ঃ "এখন তোমার আব্বাকে বের করে দাও।'' মেয়েটি বলছিল, ''আম্মা এখন যদি আব্বাকে বের করে দিই তবে ওরা আব্বাকে মেরে ফেলবে। আব্বাকে বের করে দেবো।" ৪টার সময় বেগম সাহেবা নিজে গাড়ি বের করলেন, তাঁদের একটা ভক্সওয়াগন ছিল। ৪টার সময় এক ব্যাগ টাকা সহ সাহেব, তাঁর মেয়ে এবং পাক-সেনা বের হয়ে গেল। জঙ্গলে বসে আমি তখন দেখছি একটা ট্যাঙ্ক জগন্নাথ হলের ভিতর ঢুকল, আর একটি ট্যাংক ডঃ নাফিস আহমেদের বাসার সামনেই থাকল। ট্যাংক ঢুকল ৪টার সময়, ঢুকে বহু লোক মারল। এটা ২৬ তারিখের কথা।

কেশব চন্দ্র পাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[কেশব চন্দ্র পাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে কাজ করেন। চাকুরী পাবার পর পরই জগন্নাথ হলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন কেশব চন্দ্র পাল নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং একইসাথে তৎকালীন পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেশব চন্দ্র পাল বর্তমানেঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বিজ্ঞান শাখায় কর্মরত।]

২৫শে মার্চের বিকেলে কলাবাগানে টিউশনী করে বাসে চেপে বাসায় ফিরছিলাম। পরিচিত লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কোন কথা বলিনি।

জগন্নাথ হলেই আমার বাসা। বাসায় ফিরে ভাত খেলাম। রাত দশটার আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত। চারদিকে থমথমে ভাব। লক্ষ্য করলাম লোকজন সন্ত্রস্ত। যাই হোক শুয়ে পড়লাম। রাত বারোটার দিকে গোলাগুলির শব্দ হতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই জানতে পারিনি। আমার স্ত্রী আমাকে জাগিয়ে তুলল। দেখলাম আমার আত্মীয়স্বজনরা ভীত হয়ে পড়েছে। আমার বাসা ছিল পূর্ব বাড়ির পেছনেই। আত্মীয়রা সবাই বলল তাদেরকে এ্যাসেম্বলীতে রেখে আসতে। আমি রেখে এলাম। তাঁরা এ্যাসেম্বলীতে অবস্থান একটু নিরাপদ মনে করেছিল। এ্যাসেম্বলী হাউস তখন অন্যরকম ছিল। অডিটোরিয়ামটা ছিল সম্পূর্ণ খালি, পেছনের দিকে রাখা ছিল বড় বড় কয়েকটি প্রতিমা।

আমরা যখন এ্যাসেম্বলীতে আসি রাত তখন সাড়ে বারোটা হবে। আসার সময় রাস্তায় একজন নাম না জানা পরিচিত ছাত্রের সাথে দেখা হল। তিনি বললেন, কোন ভয় নেই। জহুরুল হক হলে ছাত্রদের ট্রেনিং হচ্ছে, ভয় পাবেন না। এ্যাসেম্বলীতে

আমার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে শহীদ সুনীলের পরিবারও ছিল। সুনীল ছিল তখন জগন্নাথ হলের দারোয়ান।

বাসায় ফিরেই বুঝতে পারলাম জগন্নাথ হল পাক-সেনাদের আক্রমণ কবলিত হয়েছে। মিলিটারীরা হলের পশ্চিম দিক থেকেই প্রথমে হামলা শুরু করে। আগে পশ্চিম দিকের গেট এতটা পাকাপোক্ত ছিল না। মাঠের পূর্ব দিকের প্রাচীরও ভাঙ্গা ছিল। হল মাঠে ইউ. ও. টি. সি'র ট্রেনিং হত, তাই হয়ত সারা হয়নি। আমি দেখলাম বোমা ফাটিয়ে এবং গুলি করতে করতে পাক-সেনারা পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের দুই দিক থেকে তিন হাত উঁচু দেয়াল থাকায় নিরাপদ ভেবেছিলাম। তখনকার দিনে ওগুলো ছিল স্টাফদের কোয়ার্টার।

বুদ্ধি নামে এক লোক বখ্‌শিবাজারের এক ডাক্তারের ড্রাইভারের কাজ করত। বুদ্ধি ছিল আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের চান্দুর ভাই। হল আক্রান্ত হলে বুদ্ধিদা তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নিল। বুদ্ধিরাম ও আমি ঘরের চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকলাম। আমার মনে হয় জগন্নাথ হল থেকে যদি কোন রকম প্রতিরোধ করা হত তাহলে আক্রমণ আরও তীব্র হত। যাই হোক কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ থেমে গেল। মিলিটারীরা প্রত্যেক হাউসে চেক আরম্ভ করল। এভাবে এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা সময় কেটে গেল। তারপর শুরু হল আমাদের বর্তমান অবস্থান-কর্মচারীদের কোয়ার্টারে তল্লাশী।

এসব কোয়ার্টারে তখন ছয়টা পরিবার থাকত। এই হলের পিয়ন ছিল তখন রবির বাবা। প্রথমেই তার ঘরে তল্লাশী শুরু হল। মিলিটারীরা তার ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপ লোক কি হ্যায়?" একে একে সব তল্লাশী চালালো। অবশ্য রবিদের ঘরের পরেরটা আর তল্লাশী করেনি। জি. সি. দেবের অধীনে কাজ করত খগেনদা। তার ঘরেও তল্লাশী চালায়নি। অবশেষে আমাদের ঘরে হামলা চালাল। দরজা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধি ও আমিচৌকির নিচে লুকিয়ে ছিলাম তা আগেই বলেছি। ঘরের সামনে ছিল আমার শাশুড়ী। এসেই জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপকা লোক কিধার" হ্যায়?" তখন আমাদের লোক যারা সামনে ছিল তারা বলল ঃ "না বাবা কেউ নেই।"

আর্মিদের হাতে একটা টর্চলাইট ছিল। সেটায় খুব বেশি আলো হয় না বলেই আমাদের দেখতে পায়নি। দেখলে আমাদের মেরে ফেলত। মিলিটারীরা আমাদের লোকজনদের জিজ্ঞাসা করল তোমরা এখানে কি কর? তখন ওরা বলল যে, আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করি। অবশেষে কিছু না পেয়ে চলে যাওয়ার সময় মাখনের বড় বড় গরুগুলো দেখে মন্তব্য করল-গরুগুলো বেশ। মাখন আমার ভগ্নিপতি ও এই হলের দারোয়ান ছিল।

ভোর হওয়ার ঠিক পূর্বে ছাত্রদের টিনশেডের আবাস ঘরটাকে ওরা জ্বালিয়ে দিল। এই ঘরটা পুড়তে পুড়তে আমাদের বাসায় আগুন লাগার উপক্রম হল। আমরা ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম কি যেন গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল, তারপর ম্যাচ জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। এরপর কয়েকজন আর্মির একদল এসে বলল "এ আদমী বেরও।" তাড়াতাড়ি ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে আনলাম। জ্বলতে থাকল ঘরগুলো। দাউ দাউ করে ছড়িয়ে যেতে লাগল আগুন। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা ক'জন।

এ্যাসেম্বলী থেকে আমাদের লোকজন খবর নিতে এল। আমরা লক্ষ্য করলাম মাঠে কয়েকশত পাক আর্মি উত্তর-পূর্ব দিকে পজিশন নিয়ে বসে আছে। তাদের ভেতর

থেকে কয়েকজন পর্যায়ক্রমে ডিউটি দিচ্ছে। এই সব গ্রুপ এক একজন মানুষ ধরে আনছে আর জবাব দিতে বাধ্য করছে তাদের জিজ্ঞাসার।

আমাদের পরিবারের যারা এ্যাসেম্বলীতে ছিল তাদের কাছে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, প্রথমে সেখানে কিছু আর্মি এসে কিছু না পেয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘরের ভেতর কোন্ এক বাচ্চার কান্নাকাটি শুনে তালা ভেঙ্গে মিলিটারীরা এ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করে। লোকজন থাকা সত্ত্বেও এ্যাসেম্বলীর বাইরে থেকে তালা দেয়া ছিল। মিলিটারীরা তল্লাশী চালায় এবং দারোয়ান সুনীলকে ধরে নিয়ে যায়। আরো শুনলাম বর্তমানের হল অফিস সংলগ্ন ঘর থেকে হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার সময় তার হাত ধুতি দিয়ে বাঁধা ছিল, আর পরনে ছিল শুধু জাঙ্গিয়া। পাক–সেনারা তাকে মারধোর করেছিল। নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বেশ অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। সুনীলকে নিয়ে বর্তমান সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে গুলি করে। এখানে হত্যা করে অনুদ্বৈপায়ন স্যারকেও।

ভোর হয়ে গেল। আমি আমার পরিচিত হলের ইলেকট্রিশিয়ান চিৎবালীদা, লালবিহারীর সাথে বর্তমান ইষ্ট হাউসের ঠিক পেছনে মাঝামাঝি বরাবর এসে দেখা করলাম। এখানেই তার ঘর ছিল। তার সাথে তখনকার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় উত্তর বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আর্মিরা ছাদের উপর উঠেছে। পানির ট্যাংকে লুকানো ছাত্রদের হাত ধরে টেনে বার করছে। গুলি করে লাথি মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিচ্ছে নিচে। চিৎবালীদাকে এ দৃশ্য দেখালাম। বললাম, এবারে আমাদেরও রক্ষা থাকবে না। এ দৃশ্য দেখার পর আমরা দুজনেই খুব ভীত হয়ে পড়ি।

এমন সময় আমাদের কাছে ২/৩ জন আর্মি এল। আমাদের বলল ঃ "এ আদমি লোক, হামার সাথ আইয়ে।" আমি যাইনি। কৌশল করে নিজেকে বিহারী বলে পরিচয় দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের বস্তির লোকজন ভেবে নিয়েছিল বিহারী বা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে হয়ত আর কিছু হবে না। মহিলারাও কপালের সিঁদুর মুছে ফেলে তৈরি হয়েছিল। আমাদের যুবকরাও বিহারী কিংবা মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে বাঁচার চিন্তা করতে লাগল।

মিলিটারীদের ডাকে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে খগেনদা ও তাঁর ছেলে মতি এবং গয়ানাথের দুই ছেলে ছিল। এই গয়ানাথ ছিল হলের পিয়ন। তার দুই ছেলে শিবু ও শংকরও তাদের সাথে গিয়েছিল। দেহে শক্তি–সামর্থ্যওয়ালা লোকগুলো তখন খুশিমনেই যায়। তারা ভেবেছিল কাজকর্ম করলে তাদের আর মারবে না।

তারপর দেখলাম তাদের প্রতি তিনজনকে এক–একটা গ্রুপে ভাগ করে নিল। সমস্ত লোকজন দক্ষিণ বাড়ির ভেতর থেকে বের করে আনল কয়েকটা লাশ, একের পর এক। আমি এবং লালবিহারীদা তখনও পূর্ব বাড়ির পিছনে। একজন আর্মি এসে বলল ঃ "এই আদমীলোক তোম কেয়া করতা হ? বাঙ্গালী হায় না বিহারী হ্যায়?" আমি থতমত খেয়ে বললাম ঃ "হাম বিহারী হ্যায়।" চিৎবালীদাকে দেখিয়ে বললাম ঃ "ইয়ে হামার ভাই হ্যায়।" কিন্তু আর্মিটি সে কথা শুনল না। বলল ঃ "নেহি, হামরা সাথ আইয়ে।" এবারেও চিৎবালীদার সহায়তায় ছাড়া পেলাম। তারপর পূর্ব বাড়ির পিছনে ভাঙ্গা পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম।

সমস্ত লাশগুলি মাঠে গুছিয়ে রাখা হল। তারপর যারা লাশ টেনেছিল তাদেরকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করল। পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে থেকে সেই গুলির শব্দ আমি শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম সেইসব গুলী খাওয়া মানুষের আত্মীয়স্বজনদের আর্তনাদ। আমি ওখান থেকে ভয়ে বেরিয় পড়লাম। মাখন অর্থাৎ আমার জামাই বাবুর রাত্রে ডিউটি থাকায় তার কোন খোঁজ পাইনি। আমার বাবা ছিলেন অন্ধ মানুষ। তিনি ইষ্ট হাউজের পিছনে আমাদের সাথেই থাকতেন এবং গোলাগুলি হওয়ার সময় তিনি ওখানেই ছিলেন। ওখানে আর্মি ঢুকেছিল কিনা তা জানতে পারিনি।

যাই হোক আমি দাশুরামের ঘরের মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকলাম একটি ছোট্ট বাক্সের মধ্যে, হাত–পা গুটিয়ে। বাক্সটা ছিল সম্ভবত কবুতরের থাকার জায়গা। ঐ বাক্সটার খোলা মুখে দাশুরামের মা আর আমার বোন গোবরের ঘষি দিয়ে ঢেকে দেয়। আমার দারুণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। প্রাণভয়ে তবু বেরুতে পারিনি। একবার বেরিয়ে এসে শুনলাম বিন্দুর বাবা অর্থাৎ দাশুরাম মারা গেছে। "এই হামার ঘরমে কৌন লেড়কা হ্যায়? হামারা ল্যাড়কাকো মার দিয়া" বলে দাশুরামের মা কান্নাকাটি করতে লাগল। চিৎবালীদাকে দেখলাম দৌড়ে ছুটাছুটি করছে আর আবোল–তাবোল বকছে। মনে হল মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে জোড় করে ধরে মাথায় জল দিয়ে শান্ত করতে লাগল।

দেখলাম আহত লোকগুলো গুলিবিদ্ধ ক্ষত নিয়ে 'জল' 'জল' করে চিৎকার করছে। উঠতে চেষ্টা করে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাদের আত্মীয়স্বজন বা বাচ্চারা যারা কাছে ছিল, মরণমুখী মানুষগুলোর মুখে জল দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

দুপুর দেড়টার আগেই আর্মিরা হল ছেড়ে যায়। তার আগেই আমি সুনীলের পরিবার, আমার পরিবার এবং মাখনের পরিবারের সকল বাচ্চাদের নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কারও কোন খবর পেলাম না। বাবা ও মাখনেরও না। যখন এ্যাসেম্বলীর কাছে এলাম তখন কে যেন বলল–আর্মি এসেছে। তাড়াতাড়ি সবাই আবার এ্যাসেম্বেলীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার বোন অর্থাৎ মাখনের স্ত্রী আমাকে একখানা মেয়েলী কাপড় দিল। মেয়েদের মত কাপড়খানা পরে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরুবার সময় ডানদিকে ডঃ মনিরুজ্জামানের লাশ আর বামদিকে এক অপরিচিত ব্যক্তির লাশ দেখতে পেলাম।

বকশীবাজারের মোড়ে যেখানে এখন মসজিদ সেখানে তখন কয়েকটি বইয়ের লাইব্রেরী ছিল। সেখান থেকে একজন লোক কাটারী হাতে হলের দিকে আসছিল। সম্ভবত লুটপাট করার জন্য। সে লোকটা আমাকে দেখে বলল "আপনি আবার শাড়ি পরে মেয়ে সেজেছেন কেন?" তখনই বুঝলাম শাড়ির ফাঁক দিয়ে আমার বড় বড় গোঁফ বেশ দেখা যাচ্ছে। আমি কোন জবাব না দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের জলের পাওয়ার পাম্পের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। মেডিক্যাল কলেজের অডিটরিয়াম হলে বাচ্চাদের রেখে শুনতে পাচ্ছিলাম নয়াবাজারের দিকে গুলির শব্দ । আগুন দেখা যাচ্ছে।

বাচ্চারা তখন খিদেয় কাতর। এক অপরিচিত লোকের কাছে কোথায় খাবার পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মেডিক্যাল কলেজের মেইন গেইটের কথা বললেন। সেখান থেকে বাচ্চা ও নিজেদের জন্য পাউরুটি কিনে আনলাম। মেডিক্যালের ডাক্তার–নার্সরা আমাদের সহানুভূতি জানালেন। বাচ্চাদের ও মেয়েদেরকে খালি রুমগুলোতে রাখতে বললেন। আর পুরুষদের বললেন রুগীদের বেডে শুয়ে থাকার জন্য। বাচ্চাসহ মেয়েদেরকে খালি রুমগুলোতে রাখলাম। পরে শুনেছিলাম মিডফোর্ডে রুগী ছাড়া যাদেরকে পেয়েছে মিলিটারীরা তাদেরকেই গুলি করে মেরেছে।

ইতিমধ্যে আরেক সমস্যা হল। শাহআলম নামে হল কর্মচারীর পরিচিত একজন

এসে আমাকে জানাল সে কোন সিট পায়নি। আমি তাকে আমার সাথে একই বেডে থাকার পরামর্শ দিলাম। রাতটা বড় ভয়ে ভয়ে কাটালাম। দুজন একই সাথে–ঘুম হয়নি। ভেবেছিলাম রাতে যদি আর্মিরা এসে চেক করে তখন একজন বেডে থাকবে, অন্যজন বাথরুমে যাব।

যাক রাতে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। ভোর হল। শাহআলমকে সাথে করে আমি হলে আসলাম। এসেই দেখি এ্যাসেম্বলীর কাছে দক্ষিণ দিকের গেইটে পূর্বদিকে মুখ করে আর্মির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হলে ঢুকে দেখলাম খগেনদার স্ত্রী কান্নাকাটি করছে।

ইস্ট হাউজের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন "মাখন বেঁচে আছে ভয় নেই। সে গোপাল স্যারের বাসায় গেছে।" আমি গোপাল স্যারের বাসায় গেলাম। স্যার আমাকে খেতে দিলেন, কিন্তু কিছুই খেতে পারলাম না। তিনি আমাদের হল ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। আমি মেডিক্যাল কলেজে ফিরে গিয়ে পরিবারবর্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে পড়ছে আমি যখন পরিবার সমেত হল ত্যাগ করি ইস্ট হাউজের পিছনে এক ছাত্র বাবুকে দেখেছিলাম হাত–পা ভেঙ্গে যাওয়ায় শুধু কাতরাচ্ছেন। আমার কাছে তিনি জল খেতে চাইলেন। আমি জল এনে তাকে খাইয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি তখন আমার অপারগতার কথা বলি। জানি না সেই ছাত্র বাবু আজও বেঁচে আছেন কিনা।

আরও একজন ছাত্র বাবু আমাকে বলেছিলেন, "২৫ তারিখে আমি টিনশেডের কাছে আমগাছে ছিলাম। ২৭ তারিখ সকালে আমগাছ থেকে নেমে চলে গিয়েছিলাম।" বিক্রমপুর অবস্থানকালে যুদ্ধের নয়মাস সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহুবার এসেছি। একদিন টি.এস.সি'র সামনে আমাকে আর্মি জিজ্ঞাসা করেছিল, "হিন্দু

সে সব দিন ছিল বড় কষ্টের, বড় ভয়াবহ। অনেক বিপদের মধ্যে তবু বেঁচে–ছিলাম। আজও বেঁচে আছি।

রেনু বালা দে
শহীদ খগেন দে
কর্মচারী, ল্যাবরেটরী স্কুল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[খগেন চন্দ্র দে'র স্ত্রী রেনু বালা দে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন স্বামী ও সন্তানের মৃত্যু একই জল্লাদের গুলিতে। গুলিতে আহত খগেন দে ও তার পুত্র মতিলাল দে'র করুণ আর্তনাদ, বাঁচার চেষ্টা ও জলের তৃষ্ণা–সব তাঁর মনে মারাত্মক আঘাত করেছে। জগন্নাথ হলের মাঠে সারিবদ্ধ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও জনগণের সাথে স্বামী ও সন্তানকে তিনি গুলি খেতে দেখেছেন। সেই পুণ্য স্মৃতিই তার আজ শেষ সম্বল।]

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমি, আমার ছেলে–মেয়েরা, ছেলের বাবা সবাই খাওয়া–দাওয়া করে রাত ১১টা–সাড়ে ১১টার দিকে শুয়ে পড়ি। আমার শরীরটা বেশি ভাল

ছিল না, তাই একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু ছেলেদের বাবা তখনও ঘুমাননি। যখন বাইরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল তখন সে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল ঃ "তুমি তো ঘুমিয়েছ, যদি বেশি রকম শব্দ হয়, তবে আমাকে জাগিও। আমি এখন একটু ঘুমাই, তুমি জেগে থাক।" আমি জেগে থাকি, আমার শিবু তখন ছোট। শিবু খাওয়ার জন্য জেগে উঠল, ওকে দুধের বোতল খাওয়ালাম। কিছুক্ষণ পর ভীষণ শব্দ হচ্ছিল, মনে হয় শব্দগুলো মুসলিম হলের দিকে। বাইরে শুনি লোকজনের শব্দ। আমি তখন লাইট জ্বেলে দরজা খুলে বাইরে আসি। বাইরে লাইট জ্বলছে, সবাই কথাবার্তা বলছে, কোথায় কি যেন ঘটছে। বিয়ের বাজি ফুটছে, না-কি ফায়ার হচ্ছে, কিছুই বুঝা যায় না। একবার আমি ঘরে যাই, একবার বাইরে আসি। যখন শব্দ আরও প্রচণ্ড বেগে হচ্ছিল তখন ওর বাবাকে আমি জাগাই। বললাম ঃ "উঠ, চারদিকের অবস্থা বেশি ভাল না।" সে উঠে বলল ঃ "এগুলো বাজি নয়, ফায়ারের শব্দ, আমি উঠে কি করব? ফায়ার হলেও এগুলো আমাদের এদিকে নয়, অনেক দূরে।" তখন আমি বাইরে এসে দেখি বিন্দুর মা, আরও অনেক লোকজন দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে লাইট চলে গেল। যখন লাইট চলে গেল তখন আমি ঘরে এলাম। শুনলাম জগন্নাথ হলের পশ্চিম পাশ দিয়ে শব্দ ভেসে আসছে। তখন ওর বাবাকে বললাম ঃ "লাইট তো নেই, তুমি উঠ।" আমি বিছানা চৌকির উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিলাম। মতি এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই আবার শুয়ে পড়ল, ওর বাবাও শুয়ে পড়ল। আমি আর শুইনি। আবার বের হলাম। শিবু নামে যে ছেলেটি ছিল, সে দৌড়ে এল। আমি জিজ্ঞেস কলাম ঃ "শিবু! কি ব্যাপার?" সে বলল ঃ "বৌদি! তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন মিলিটারী আমাদের হল অ্যাটাক করেছে। আমাদের বাঁচার তো কোন উপায় নেই, ছাত্র তো নেই, সব বিপদ আমাদের উপর পড়বে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। ফায়ার করলে উপর দিয়ে যাবে, অন্তত এক হাত উপর দিয়ে যাবে, শুয়ে পড়েন।" এই কথা বলতে বলতে শিবু চলে গেলে আমিও ঘরে ঢুকলাম। এ সময় বাইরে আরও প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। আমি আমার স্বামীকে বললাম ঃ "মনে হয় বিহারী এসেছে, রায়ট লেগে গেছে, এবার সব শেষ করে ফেলবে।" আমার স্বামী বলে ঃ "না, কিছুই না।" জগন্নাথ হলের সামনে প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজের সাথে সাথে আমাদের ঘরের সবাই জেগে ওঠে। আমার বড় ছেলে বলে ঃ "বাবা! আমি বারবার আপনাকে বলেছিলাম বাড়ি যেতে, আপনি গেলেন না আর আমাকেও যেতে দিলেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইলাম, তাও আপনি দিলেন না। কাউকে যেতে দিলেন না। আজকে আর কারোরই বাঁচার কোন উপায় নেই, আজ এখানেই মরণ।" তখন ছেলের বাবা তাকে ধমকে বলল ঃ "চুপ থাক! যদি পরমায়ু থাকে তবে তা কেউ কোন দিন নিতে পারে না। কত যুদ্ধ গেল, কত রায়ট গেল, আমার তো কিছুই হলো না। আমি সেই একই রকম আছি।" এ কথা বলতে না বলতেই পাক-সৈন্যরা এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ভাগ্য ভাল আমাদের ঘরে প্রথমে ধাক্কা দেয়নি। যে ঘরে ধাক্কা দিল সে ঘরে লোক পেল। সেটা ছিল মাখনের ঘর। সারারাত আর আমাদের ঘরে ধাক্কা দেয়নি। আমাদের ঘরের পিছনে একটা টিনশেড ছিল, তাতে আগুন দিল। আগুন দেবার সংগে সংগে তা তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। আমি তখন শিবুকে কোলে করে বাসনার হাতে ধরে বের হলাম

মুখবন্ধ

১৯৭১-১৯৯২। প্রায় দুটো যুগ অতিক্রান্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধের ছবি স্পষ্ট থেকে ক্রমশ অস্পষ্ট এবং অস্পষ্টতর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে যা কিছু জানে, তার অধিকাংশই বিকৃত। কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীনতার চিহ্নগুলো। এ দাগ ঘুচবার নয়- এ চিহ্ন চিরচিহ্ন।

স্মরণকালের শ্রেষ্ঠতম চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল। যে জগন্নাথ হল ছিল মহান বিদ্যাপীঠ, তা পরিণত হয়েছে শ্রেণীবদ্ধ শহীদ মিনারে। স্বাধীনতার প্রথম লগ্নে আত্মদানের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ হলের সেই হারানো সাথীরা হলটিকে করে দিয়ে গেছে পূত-পবিত্র। তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী কোন সুখশ্রাব্য কবিতার পংক্তি নয়; বরং ভয়াবহ বিভীষিকাপূর্ণ রাতে হিংস্র পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণ হতে পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টার কঠিন শব্দাবলী।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় সংগঠিত নিষ্ঠুরতম গণহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারকেই প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকারদানকারী সকলেই কোন-না-কোনভাবে প্রত্যক্ষদর্শী। এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও লিখিতরূপ দান করতে প্রায় দশ বছর সময় লেগেছে। এ গ্রন্থে সাক্ষাৎকারদানকারীদের প্রদত্ত তথ্যের ও ভাষার উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। শহীদ ছাত্রদের ছবি সংগ্রহ করতে সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে প্রচুর। উল্লেখ্য যে, এ সময় আমিও জগন্নাথ হলের একজন ছাত্র ছিলাম এবং শহীদ ছাত্রদের বেশ কিছু সংখ্যক ছিলেন আমার পরিচিত। তাই এ কাজ করার পিছনে আমার অব্যক্ত অঙ্গীকার রয়েছে।

জগন্নাথ হলের গণহত্যার শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও অতিথিবৃন্দ। তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি। শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থা শুধু করুণই নয়, হৃদয় বিদারক। অনেকেই বর্তমানে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা শুনলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন তাদের প্রতি, যারা বছরের কোন কোন দিন তাদের কাছে যান শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্য। এই বীতশ্রদ্ধার কারণ অনুসন্ধান করেছি। শহীদ পরিবার দেশ মাতৃকার জন্য তাদের সন্তানদের প্রাণ বিসর্জনের কোন অর্থ বর্তমানে খুঁজে পান না। এই মহান আত্মদানের জন্য সামান্য স্বীকৃতিটুকুও দেয়া হয়নি; হয়নি শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত। আমি অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি যে তারা কি পেতে চান? সবাই একবাক্যে বলেছেনঃ 'স্বীকৃতি'। এই গ্রন্থে প্রদত্ত শহীদ রাখাল রায় (রবীন), শহীদ শিবু কুমার দাস ও শহীদ গণপতি হালদারের পিতার পত্রে কিছুটা আর্থিক সহায়তা প্রদানের উল্লেখ থাকলেও তা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর শহীদ পরিবারগুলোর স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার প্রকাশ,

বাইরে, দেখি আমাদের দরজার সামনে দুইজন পাক–সৈন্য দাঁড়ানো। আমি তাদের দেখে খুব ভয় পেলাম। তারা জিজ্ঞেস করল ঃ "ঘরে কোই ছাত্র লোক হ্যায়?" আমি বললামঃ "ছাত্র লোক কোই নেহি হ্যায়।" তখন তারা বলল ঃ "তোম লোককো হামলোক কুছ নেহি করে গা। তুম কোন্ লোক হ্যায়?" আমি বললাম ঃ "হাম লোক ম্যাথর মে হ্যায়।" এই কথা ওর বাবা চৌকির নিচে বসে শুনল। মিলিটারী যখন বলছে আমাদের কিছুই হবে না, আমাদের মারবে না তখন সে বের হয়ে এলো। পাক আর্মি আমাদের পাশে পাশে ঘুরতে লাগল কিন্তু কিছুই বলল না। তবে ঘরের জিনিসপত্র অর্ধেক পর্যন্ত বের করল এবং মাঠে নিয়ে গিয়ে জমা করল। আর অর্ধেকে আগুন লাগিয়ে দিল। মোহনের ঘরের সামনে আমাদের গোয়ালঘর। সেখানে বসে আমি শিবুকে দুধ দিতে শুরু করেছি, তখন মতি গিয়ে আমার পাশে বসল, আর ওর বাবা গরুর রশি বাঁধছে, ঠিক তখনই মিলিটারী ওর বাবার হাত চেপে ধরল। আমার পাশে বসা ছিল মতি, তাকেও ধরল। দুইজনকে ধরে ঐ গোয়ালঘরের মধ্যে বসালো। আমাদের পাড়ার কিছু ছাত্র আর যত পুরুষ লোক ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে ঐ গোয়ালঘরে ঢোকালো। তাদের বসানোর পর আমরা মেয়েলোক বসে আছি দরজার সামনে। গোয়ালঘর ভর্তি পুরুষ। সামনে বন্দুক উঠিয়ে ধরে মিলিটারীরা বললো ঃ "শুয়ারকে বাচ্চে! 'জয় বাংলা' বল, উল্টা নেহি কহে। বল জয় বাংলা। তোমকো বাপ শেখ মুজিব কাহা হ্যায়, বল।" ওরা যখন এ রকম করছে, আমরা তখন ভাবছি এখনই গুলি করবে। আমরা সবাই হাউ–মাউ করে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। গরুর ঘর থেকে সবাইকে বের করে তখন লাইন করে নিয়ে গেল সুধীরের ক্যান্টিনের দিকে। কিছুক্ষণ পর দেখি তিন–চারজনে ধরে ধরে এক–একটা করে লাশ এনে রাখছে জগন্নাথ হলের মাঠের মধ্যে। আমরা দেখে তো অবাক যে এগুলি কি আনে? দেখতে দেখতে ভেঙ্গে পড়লাম। দেখলাম বাসনার বাবা, মানে আমার স্বামী আর ছেলে মতি কত জনের লাশ নিয়ে এল ধরে ধরে। এনে রাখলো মাঠের মধ্যে। যাদের তখনও দম একেবারে বের হয়নি, তাদের ফায়ার করেছে পিছনের দিক থেকে। তারা শুয়ে পড়েছে সাথে সাথেই। তারপর যারা লাশ টেনে আনল তাদের বলল লাইন ধরে দাঁড়াতে। লাইন করানোর পর তাদের কি বলল তা আমি জানি না। যারা লাইনে ছিল তারা, আর লাইন থেকে যারা বেঁচে ফিরেছে তারা জানে। তারপর লাইনে দাঁড়ানো সবাইকে গুলি করল। আমরা মাঠের কোনায় বসে দেখছি তাদের গুলি করেছে, তারা একবার উঠে বসছে আবার শুয়ে পড়ছে। বিন্দুর মা গিয়ে বিন্দুর বাবাকে নিয়ে এল। সে জল জল করছিল। আমি একটু জল খাওয়ালাম সংগে সংগে তাঁর দম বের হয়ে গেল। আমার স্বামীকে আনবার তো কেউ নেই, আমার বাচ্চা ৬ মাসের শিশু। আমি গেলাম, বাসনা গেল, বাসনার কোলে শিবুকে দিলাম; আমি বললাম ঃ "তুমি উঠ, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।" আমি তখন তার হাতের নীচে দিয়ে হাত দিলাম, মাথা লাশের উপরে, পা লাশের উপরে। আমি দেখলাম পায়ে তাঁর জুতা, হাতের কিছু অংশ নেই। আমাকে দেখেই সে বলল ঃ "আমাকে জল খাওয়াও।" আমি বললাম ঃ "তুমি আগে ঘরে চল। তোমাকে আমি নিয়ে যাব।" তিনি তখন বললেন ঃ "নিতে তো পারবে, কিন্তু আমার তো সব শেষ।" ঠিক তখনই একটা জীপ হলের গেট দিয়ে ঢুকল। আমি তা দেখে ভয়

গেয়ে গেছি। স্বামীর কাছ থেকে চলে এলাম ছেলের কাছে। বললাম "চল, তোর বাবাকে তো নিতে পারলাম না।" ছেলে বলে কি ঃ "মা নেয়ার তো কিছুই নেই। তুমি মনে কোন কষ্ট নিও না। আমি তোমার এক ছেলে, মরে গেলেই কি? তোমার তো লক্ষ লক্ষ ছেলে রইল। দুঃখ করো না। বলেছি বাবাকে বারে বারে। বাবা তখন শোনেননি, এ যে হবে আমি জানতাম। বাবা তখন বোঝেনি, বুঝতে পারেনি। জল, মাগো জল দাও।" আমি বলি, "বাসনা তুই একটু জল খাওয়া।" এই বলে আমি আবার মাঠের পাশে চলে এলাম। বাসনা ওর বাবাকে, মতিকে জল খাইয়ে এল। এসব দেখে আমার পেটের ভিতর থেকে মোচড় দিয়ে রক্ত বমি শুরু হল এমন তীব্রভাবে যে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। আমি যে আবার যাব সে শক্তি আমার আর নেই। বাসনাকে আবার পাঠালাম। "যা, যেয়ে দেখ মতিকে একটু আনতে পারিস কিনা।" বাসনা আবার গেল, আবার জল খাওয়ালো। মতি বাসনাকে বললো, "বাসনা, মাকে চিন্তা করতে মানা করিস, আমি শেষ, আমাকে আর নিতে পারবি না। তুই যা, ওই এসে পড়ল।" অমনি আবার পাক-আর্মির মিনিটে মিনিটে রাউণ্ড দেয়া শুরু হল। তখন মতি কিম্বা মতির বাবা কাউকেই আমরা আর আনতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর হোসেনী দালান থেকে একটা ছেলে এলো। বটতলার লাইব্রেরীতে থাকত ছেলেটা। ঐ ছেলেটা এসে আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল। আমি বললাম ঃ "আমি যাব না, এখানে লাশ পড়ে আছে দু'জনের। তাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" তখন সে বলল ঃ না চলেন, আপনাদের রেখে এসে যদি সময় পাই তবে যতটুকু শক্তিতে কুলায় এদের নিয়ে মেডিক্যালে রেখে আসব। একবার আপনারা চলেন, আপনাদের হোসেনী দালানে রেখে আসি।" তখন সে আমাদেরকে জোর করে হোসেনী দালানে নিয়ে গেল। হোসেনী দালানে যাবার পথে আমাদের গেটের সামনে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে আছেন, সাদা হাফপ্যান্ট পরা। তারপর চলে গেলাম হোসেনী দালানে এবং সেখানেই থাকলাম। ঐ ছেলেটি জল-খাবার যা পারল তা নিয়ে দিল আমাদের। আমরা তো সারারাত কান্নাকাটি করলাম। ছেলেটা আবার সকালে এল আমাদের দেখতে। সে বলল ঃ "মিলিটারী আবার ঢুকেছে হলে, আমি তাই আর এগোতে পারিনি লাশের সামনে।" তারপর দিন-রাত্রি যে কিভাবে গেল তা এখন আর বলতে পারি না। ২৭ তারিখে আমি শিববাড়িতে এলাম, কয়েক ঘন্টার জন্য আমি শিববাড়িতে ছিলাম। শিববাড়ি থেকে পাঁচ-ছয় জন লোককে ধরে নিয়ে যে মেরে ফেলেছে তা শিববাড়ির বাবা জানে না। আমার কাছে সব শুনে বলে ঃ "মা! তোমার এই অবস্থা তাহলে, আমাদের শিববাড়ির যে পাঁচ-ছয় জন ধরে নিয়ে গেছে তাদের কি অবস্থা?" আমি বললাম ঃ "আমি তো দেখেছি আমার সামনে তাদের গুলি করে মেরে ফেলেছে।" বাবা তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তারা কি মিস্ত্রী না সাধু?" আমি বললাম ঃ "মিস্ত্রী ছিল একজন, নাম মুকুন্দ। আর একজন লোক, সে ছিল শিববাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিত। বাড়ি মানিকগঞ্জ। আরও ছিল তিনজন কি চারজন, মোট পাঁচজন।" বাবা এসব কথা শুনে তো অবাক। শিববাড়িতে একদিন ছিলাম। তারপর ঢাকা ত্যাগ করলাম।

রাজকুমারী দেবী (বিন্দুর মা)
স্বামী ঃ শহীদ মনভরন
নিপার কর্মচারী।

[রাজকুমারী দেবী নিজ স্বামীকে সারিবদ্ধ যুবা ও বৃদ্ধের সাথে গুলি খেতে দেখেছেন। বহুসংখ্যক লাশের মধ্য হতে নিজের স্বামীকে বাসায় নিয়ে আসেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। জগন্নাথ হলের মাঠে লাইন করে দাঁড়া করিয়ে গুলি করা ও আহত-নিহতদের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হৃদয়স্পর্শী।]

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। এমনিতেই শুনেছিলাম চারদিকে গোলমাল হবে। আবার শুনলাম যে সকালবেলা জল থাকবে না। তিন দিন এমন অবস্থা চলবে, কেন জল থাকবে না তার কিছুই জানি না। দুই-তিন দিন জল থাকবে না তাই সন্ধ্যার দিকে জল তুলে রেখে ঘরের কাজ সেরে শুয়ে পড়েছি।
রাত তখন এগারটা হবে, দুই-তিন জন ছাত্র এসে ডাকাডাকি করতে লাগল - "বস্তিওয়ালা কেউ জেগে আছ?" কেউ তখন কোন শব্দ করল না। তখন কে যেন বলল, "মরা ঘুম ঘুমাও বাপু, বুঝবা।" ছাত্রদের মধ্য থেকেই বলল কেউ কথাটা। আরও বলল ঃ "ঘুমাও বাপু, বুঝবা। কুড়ালটা চাইতে এসেছিলাম তাও দিলে না। রাস্তা ব্লক করতে হবে, তা আর হল না।" এই কথা বলেই তারা চলে গেল। ঐ কথা শুনে আমি আমার স্বামীকে ডেকে বললাম, "এই শুনেছো, ঘুমিয়ো না, বাইরে কি বলে গেল শুনেছ তো?" তখন আমার স্বামী আমাকে বলল, "চুপ কর, মরলে আমরা শুধু একা মরব না, সবই মরলে আমরাও মরব।" এর প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর শ্রী চাঁদ রাজভর-এর বড় ভাই আমার স্বামীর নাম ধরে ডেকে বলল, "তুই কি করছিসরে, দেখতো নিউমার্কেটের দিকে আগুন দেখা যায়।" এভাবে আরও মিনিট দশেক পরে আমাদের জগন্নাথ হলের মাঠে কিসের যেন একটা জোরে আওয়াজ শুনলাম। বর্তমানে মাঠের গ্যালারীর সামনে যেন বজ্রাঘাত হলো। কে কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পেলাম না। সবারই তাড়াতাড়ি লাইট নিভানো, দরজা বন্ধ করা, এমন একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। তখন বুঝলাম যে একটা কিছু ঘটছে। ঠিক তখনই শুরু হল ঝাঁক-ঝাঁক গুলির শব্দ। আমার স্বামী আমাকে বলল ঃ "দাঁড়িয়ে থেক না, তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়।" বাচ্চা তিনটাকে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে মাটিতে শোয়ালাম। বাচ্চারা বলছে, "মাগো, ভীষণ শব্দ হচ্ছে।" আমি বললাম, "বাবা শুয়ে থাক, উঠো না, উঠলে বাঁচবে না। আমরা সবাই মরব।" বাচ্চাদের সাথে কথা বলায় আমার স্বামী বলল, "তুমি চুপ কর। মিলিটারী ঢুকছে পিছন দিক থেকে, দরজা ভাঙ্গছে, টের পাও? "আমি বললাম, "আমার টের পাওয়ার দরকার নেই, মরণ একদিন তো হবেই। তাতে আর কি?" চারদিকে তখন ধোঁয়া আর গুলির শব্দ, বারুদের গন্ধ। আমরা সবাই শংকিত, কারো কোন হুঁশ

নেই, শরীর কাঁপছিল আমাদের সবার। গুলির শব্দ ভীষণ, আধঘন্টা পর্যন্ত যেন কামান দাগছে। বুঝতে পারলাম যে ছাত্র বাবুরা জানালা খুলে লাফিয়ে মাটিতে পড়ছে এবং বস্তির দিকে দৌড়ে আসছে। উত্তর বাড়ির দিক থেকে অথবা দক্ষিণ বাড়ির দিক থেকে সুধীর বাবুর বর্তমান ক্যান্টিনের ওখানে কয়েকজন ছাত্র বাবু কম্বল গায়ে, কেউ কেউ চাদর গায়ে কেবল পালানোর চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর মিলিটারী আমাদের দরজার সামনে এসে বলল, "কই হ্যায়? দরজা খুল দো, তোম লোককো শুট করনে হোগা।" তখন আমার বুড়ি কাকী বলল, "ঠেরিয়ে সাহাব, দরজা এখন খুল নেহি হে আয়, মাত লেজিয়ে।" তখন ১০/১২ জন মিলিটারী একসাথে তেড়ে এল আমাদের দিকে, আমরা ভয়ে আরও চুপসে গেলাম। আমার স্বামী তার বড় চেহারার শরীরটা নিয়ে আমাদের একটা বড় কাঠের আলমারীর পিছনে লুকাল। সেখান থেকে সে বলতে লাগল ঃ "বলবে না যে আমি এখানে আছি"। ঘরের মধ্যে আমরা রইলাম বুড়ি কাকী, আমি, বাচ্চা দুটো, ভাশুরপো ও শাশুড়ী। তখন মিলিটারীরা ওদের ভাষায় বলল, "এই তুম লোক আদমী কিধার হ্যায়" তখন বুড়ি কাকী বলল, "সামনে হোতা হ্যায়।" পাক–সেনারা আবার বলল, "মাদার চোদ আদমী লোক কিধার গিয়া?" আমি বললাম, "সাহাব এই তো ঘরা হ্যায়।" আমরা আসলে বুঝতে পারছি না কি ওরা বলতে চায়। ওরা আবার বলল, "ইসমে কাহা মিলো, দাওয়া?" বুড়ি কাকী বললঃ "কালকে আমাদের জল থাকবে না তাই তুলে রেখেছি।" আমি বললামঃ "কাহা বোলনা সাহাব হাম লোক সামাস্তা নেহি। ম্যায় কই দাওয়া নেহি।" তখন পাক–সেনারা বলল ঃ জহর নেহি মিলায়া?" আমি বললামঃ "নেহি সাব জহর নেহি মিলায়া; জহর মে হাম নেহি জানতা হো কিধার মিলতা।" পরে আমাকে বলল দু গ্লাস পানি পিলাও। আমি দুটো কাঁচের গ্লাসে পানি দিলাম ওদের হাতে। ওরা আবার বলল ঃ "মিলায়া নেহি তো?" আমি বললাম ঃ "নেহি সাহাব মিলায়া নেহি, জহর হাম নেহি চিনতা।" ওরা জল খেয়ে একটা গ্লাস আমার হাতে দিল, আরেকটা ফেলে দিল। এবার ওরা বলল ঃ "তোমহারা চল।" প্রথমে আমাকে, পিছনে বুড়ি কাকীকে আর ওরা সামনে–পিছনে দুটো মেশিনগান নিয়ে আমাদেরকে বলল ঃ "হাম লোক কো পিছে চল, তুম লোককো মেজর সাহাব বোলাতা হ্যায়, তুম লোক চল।" আমি বললাম ঃ "আপ লোক কিয়া কর দিয়া সাহাব? হামার তিন বাচ্চা হ্যায়।" তখন আমাকে বলল ঃ "উঠ যাও।" আমি তখন পাগলের মত জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার এই বাচ্চা তিনটাকে কি করব? তখন পাক সেনারা বলল, "উধার মে চল্, সামাস্তা হ্যায়, ও বাচ্চা তুম লোক চুপচাপ উধার মে ঠায়রো।" আমার সাথে বুড়ি কাকীকেও নিয়ে চলল, ভাশুরপো কে বলল ঃ 'তুম ভি চল'। আমরা অনেকে যাচ্ছি দেখে আমার মনে একটু সাহস হলো। কিন্তু তবুও আমি বুড়ি কাকীকে বললাম ঃ "তুমি যেয়ো না। আমাকে দেখে হয়তো ওদের মতলব খারাপ হয়েছে। তুমি যেও না, তাহলে আমিও না গিয়ে পারবো।" আমি পুনরায় তাদেরকে বললাম ঃ "দেখিয়ে সাহাব, আপলোক হামারা ভাই হ্যায়, বাপ হ্যায়, সাহাব আপলোক কিধার লিয়ে যাতা হামকো? আপলোক জুলুম নেহি কর।" তখন ওরা বুড়ি কাকীর হাত ধরে জোরে টান দিয়ে বলল ঃ "চল্ চল্ উধারছে চল্।" এ সময় দুজন মেজর গোছের পাঞ্জাবী এল, তারা বলল ঃ "ইস্‌কে কিয়া হোতা হায়?" ওদের ভাষায় আরও অনেক কিছু বলতে লাগলো। এক সময় মেজর গোছের একজন বললো ঃ "লিয়ে যাও কাহা? ঘরমে ছোড় দো।" তখন তারা আমাদেরকে ছেড়ে দিল এবং আমি ছাড়া পেয়ে বুড়ি

কাকীকে বললাম, "কাকী এখানে থাকা নিরাপদ নয়, চল আমরা অন্য কোথাও যাই।" বুড়ি কাকী যেতে চাইলেন না। আমি আমার স্বামীর কথা বলে বললাম "সে তো নিরাপদেই আছে, আমরা অন্য কোথাও যাই।" কিন্তু বুড়ি কাকী গেলেন না। আমি আমার তিন বাচ্চাকে নিয়ে মঞ্জুদের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেই। যাবার সময়ে আমার স্বামী বললেন, "তোমার কাপড়-জামা ছেড়ে মেথরদের জামা-কাপড় পর, নইলে রক্ষা পাবে না।" আমি মঞ্জুদের বাড়িতে ওদের দেয়া কাপড় তাড়াতাড়ি করে পরে নিলাম। এ সময় দেখলাম মিলিটারীরা ঐ বাড়িতেই ঢুকলো। আমি দেখলাম যে মেথরদের বাড়ির অনেক সুন্দর সুন্দর বৌদের নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করতে লাগলো। তখন আমি অন্ধকারে একটা পায়খানার পাশে বাচ্চাদেরকে নিয়ে চুপ করে লুকিয়ে থাকলাম। আমি ভাবছিলাম এ বাঁচাই আমার শেষ বাঁচা। তখনও আমার স্বামী ঘরে আলমারীর পেছনে নিরাপদে আছেন। ইতিমধ্যে সুধীর বাবুর ক্যান্টিনে ওরা আগুন ধরালো। তখন আমার স্বামীর সাথে আমার দেখা হল। আমি তাকে বললাম, "তুমি সাবধানে থেকো।"

রাতটা যে কিভাবে কেটে গেল বলতে পারবো না। পরের দিন ভোরে যখন সবাই লাশ টানছে, তখন আবার আমার সাথে আমার স্বামীর দেখা হল। সকালে লাশ টানছে চান্দু আর শ্যামলাল, সাথে কয়েকজন মিলিটারী। দেখলাম ওরা মধুদাকে নিয়ে আসছে। শুধুমাত্র আমার স্বামীকে দেখার জন্যই আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম ঐ পায়খানার কাছে। ওদিকে যখন বাইরের থেকে লাশগুলো আনছে, তখনই যেন কেমন করে আমার স্বামীকে পায়খানার কাছে পিছন দিক থেকে থাবা দিয়ে ধরলো এবং ঐ বহুলোক, যাদেরকে ধরে এনেছে, তাদের সাথে মিশিয়ে দিল। আমার তখনই মনটার মধ্যে কুডাক ডেকে উঠল। আমি আমার স্বামীকে বললাম ঃ "তুমি কোথায় যাচ্ছ? ওদের সাথে যেও না।" তখন মিলিটারী আমার স্বামীকে বলল ঃ "এই তুমলোক চলো, হামকো কাম কর দেগা।" আমার স্বামী বললেন ঃ "সাহাব হাম কাম কর দেগা তো হামকো ছোড় দেগা"? ওরা বললো ঃ হুম, কাম করেগা তো তুম লোককো হাম ছোড়েগা।" এ সময় দেখলাম এই ব্যাংকের কাছ থেকে প্রিয়নাথের লাশ তুলে নিয়ে গেলো। প্রিয়নাথ এই হলের দারোয়ান ছিল। পরে দু'জন দু'জন করে ভাগ করে লাশ টানার কাজে লাগিয়ে দিল। লাশের পরে লাশ, একের পর এক আসছেই। লাশের স্তূপ হয়ে গেলো।

আগে যখন মধুদাকে নিয়ে এসেছিলো তখন মধুদা যেন কি বলতে চাচ্ছিল। আমি আমার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছি আর ভাবছি যে, সে যদি ছাড়া পেতো তাহলে আমি বাঁচতাম। হঠাৎ দেখি লাশ টানার ওখানে আমার স্বামী নেই। তখন আমি চান্দুকে জিজ্ঞেস করলাম তার কথা। চান্দু বললো ঃ "আছে হয়তো কোথাও, তুমি দেখছ না কিন্তু সে তোমাকে ঠিকই দেখছে, লাশ টানছে।" এ সময় দেখলাম শিববাড়ির এক সাধুকে নিয়ে এলো দুইজন। সাধুকে সম্পূর্ণ সুস্থই দেখলাম। তাকে নিয়ে এল মাধবদা আর মনীন্দ্রদা। দেখলাম খগেনদা আর তার ছেলেটাকে ধরে এনে লাশ টানার কাজে লাগালো। খগেনদা ছিলেন আর্টস্ বিল্ডিংয়ের (দর্শন বিভাগের) পিয়ন। মাথায় চুল ছিল না খগেনদার। তিনি পুরা সুস্থ। তিনি লাশ টানেননি কিন্তু লাশ যারা টানছিল তাদের সাথে সাথে থাকছেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম যারা লাশ টানছিল তাদেরকে লাশের

মধ্যে তিন লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ হাতজোড় করে কিছু বলতে চাইছে। আমি তখন ছিলাম মাঠের মধ্যে। দূরত্বটা হবে বর্তমান জগন্নাথ হল আর মাঠের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব হবে ততটুকু। আমার তখন কোন ভয়ভীতি ছিল না, কোন জ্ঞানও ছিল না। এ সময় দেখলাম দক্ষিণ বাড়ির গেটের কাছে সৈন্য ভর্তি একটা গাড়ি এল। আমি ওদের কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তখনই চান্দুর বড় বৌদি কাছে এসে দাঁড়ালো, দেখলাম চান্দুর বড় ভাই আর কে যেন একটা লাশ নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে তিনজন মিলিটারী ত্রিকোণে দাঁড়িয়ে লাইনের লোকগুলোকে মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি কি করে দেখব এই দৃশ্য! আর কোন দিশা না পেয়ে পুনরায় মেথরদের বাড়িতে এসে পড়ে গেলাম। এইভাবে আমি এখানে পড়ে যাবার ঠিক ২/৩ মিনিটের মধ্যেই একটা বিরাট শব্দ হল। তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। রাধে বলে একটা লোক ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠলো ঃ "আহা বিন্দুকা বাপ, বাপকো সব খতম কর দেয়া।" যখনই সে বললো যে, 'সব খতম কর দেয়া' সাথে সাথে আমি এক দৌড়ে আবার সেই মাঠের কাছে গেলাম, দেখলাম যে পুতুলের মত সমস্ত লাইন দিয়ে লোকগুলো পড়ে আছে। খগেনদা গুলি খেয়ে একবার উঠতে চান আবার পড়ে যান। এইভাবে বার বার উঠতে চেষ্টা করছেন তিনি। মিলিটারীরা পিছন ফিরে গিয়ে আবার তিন দিক থেকে আগের মতন গুলি করতে লাগল। শুধু ধূলায় ধূলায় ভর্তি হয়ে গেলো সব। যখন দ্বিতীয় বার আবার গুলি করে তখন ঐ লাশগুলো থেকে মাত্র ২০/২৫ হাত দূরে থেকে সব দেখতে লাগলাম। খগেনদার তখনও একটা হাত নড়ছে, কি যেন বলতে চাইছেন তিনি। এদিকে দেখলাম আমার স্বামীর কোন দেখা নেই, ভাবলাম নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তখন আমার বাসা থেকে দশ হাত দূরে জগন্নাথ হলের মাঠের মধ্যে বর্তমান শহীদ মিনারের ১২/১৪ গজের মধ্যে থেকে সবই দেখছি। কেউ আর নড়ে না। গুলি করে মিলিটারী চলে গেলে সবাই ঐ লাশের দিকে ছুটছে। এইসময় বক্‌শী বাজার মোড়ের মসজিদের ওখানকার ইদু নামে একজন লোক এসে বললো ঃ "এই তোমরা কি করছ? এখনই সরে যাও যদি বাঁচতে চাও।" তখন আমি কোন কথা চিন্তা না করেই লাশের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হলাম। বুড়া কাকা বলল আমার স্বামীর কথা যে ঃ "চল দেখে আসি ও বেঁচে আছে কিনা।" কাকা আর আমি তখন লাশের কাছে গেলাম। সেখানে তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে দেখছে তাদের পরিচিত লোকজন বেঁচে আছে কিনা। আমি আমার স্বামীকে পেয়ে লাশের মধ্যে থেকে তাকে পা ধরে টেনে বের করলাম। ঘরে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলাম। পাশে দেখলাম চান্দুর বড় ভাই গোঙাচ্ছে। তার পেটে গুলি লেগেছে এবং সমস্ত নাড়ি–ভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে আসছে। তাঁর বউ জল নিয়ে দৌড়ে আসছে। কিন্তু সে তাকে বারণ করে বলছে ঃ "আসিস্‌ না, আসিস্‌ না, তোরা সব ফিরে যা।" এইভাবে বলতে বলতে সে রোকেয়া হলের দেয়াল টপকে চলে গেল। এদিকে চান্দুর ছোট ভাই মুন্নীলাল, সে–ও বহুকষ্টে উঠতে চেষ্টা করছে। কিন্তু উঠে আবার পড়ে গিয়ে একেবারে নিস্তেজ। এখন ছাত্র বাবুরা যেখানে 'রিং' ঝোলে সেখানেই সবাই পড়ে ছিল। যাহোক আমি এবং আরও কয়েকজন মিলে আমার স্বামীকে বাসায় নিয়ে এলাম। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে তার কতটুকু

ক্ষতি হয়েছে। মনে হচ্ছিল বাসায় এলেই তিনি দাঁড়াতে পারবেন, কিন্তু বাসায় এনে দেখি যে সমস্ত শরীরটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমি তখন প্রায় পাগলের মত। তাকে ঘরে নিয়ে আসাতে কেউ কেউ বলছে যে দেখো এই লাশের জন্য আবার এই বস্তিতে হামলা না চালায়। যাই হোক আমার স্বামী আমাকে বলল ঃ "আমার মাথার বালিশটা দাও, আমার মাথায় জল দাও, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।" তখনও তিনি আমার সাথে সচেতনভাবে কথা বলছেন। তার শরীরের রক্তে আমার সমস্ত শরীর ভেসে গেছে। বুড়া বাসু নামের একজনের রক্তও আমার শরীরে লেগেছে। এই বুড়ার তিনটি গুলি লেগেছিল তবুও সে তখনও বেঁচে ছিল। আমার স্বামী আমাকে বলল ঃ "আমার যেন কেমন লাগছে, আমি আর বাঁচব না, আমি মরে গেলাম।" আমি বললাম ঃ "তোমাকে আমি মরতে দেব না, মিলিটারী একটু সরে গেলেই তোমাকে আমি মেডিক্যালে নিয়ে যাব।" তখন তিনি আমাকে আবার বললেন ঃ "দেখ আমার পা দুটো নেই, আমার পিঠটা খুলে দেখ। তখন আমি আমার শাশুড়ীকে ডেকে দেখতে বললাম। তিনি দেখে বললেন ঃ "এখান থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে যাচ্ছে, সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাবে।" স্বামী আমাকে বললেন ঃ "বড় ভাইকে ডাক।" বড় ভাইকে ডেকে তিনি বললেন ঃ "আমার বাচ্চা-কাচ্চা সব রেখে গেলাম, তুই দেখিস।" আমাকে বললেন ঃ "তুমি হলে থেকো না, নারায়ণগঞ্জে তোমার বোন- জামাইয়ের কাছে যাবে। উনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।" আমার শাশুড়ী বললেন ঃ "একি হল! তুই চলে গেলি? আমার কি হবে, তোর বাচ্চা-কাচ্চার কি হবে?" তিনি বললেন ঃ "বড় ভাই ত আছে, ও দেখবে। তুমি আর কি করবে, তুমি ভগবানকে ডাক যেন আমার আত্মাটা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।" আমার মেয়েটার বয়স সাড়ে পাঁচ বছর, ও এ সমস্ত দেখে চোখ বুজে আছে আর খোলে না। কেবল বলে ঃ "লাশ ফেলো।" তখন আমি শাশুড়ীকে দিয়ে মেয়েটাকে মাঠে পাঠিয়ে দিতে গেলাম, ভাবলাম এসে ক্ষতস্থান বেঁধে দেবো এবং মেডিক্যালে নিয়ে যাব। মেয়েকে রেখে এসে দেখি ওর বাবা কোন কথা বলছে না। আমি খুব ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ভাবলাম এই মাত্র এত কথা বলল, এখন নেই? আমি দিশেহারা হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলাম। সমস্ত লোক যারা ছিল তারা সবাই ছুটে এল। আমাকে কেউ কেউ বলল, "তুমি চীৎকার কোর না, আর কিছু তো করার নেই, এখন চুপ করে থাক। তোমার চীৎকার শুনলে মিলিটারী এসে আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে।" তখন আমার বড় ভাশুর আমার স্বামীর লাশটাকে মাঠের মধ্যে রেখে এল। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করছি দেখে মঞ্জুর বাবা আমাকে ধরে দূরে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে সবাই হল ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি মাখনের বৌকে বললাম ঃ "সবাই তো চলে যাচ্ছে, আমি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? চল না একবার ওদের বাবাকে দেখে আসি।" তখন মাখনের বৌকে সাথে নিয়ে আমি লাশের পাশে এলাম। লাশের পাশে বসে নমস্কার করে চলে এলাম আবার। বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও যাবার জন্য বাইরে বের হলাম। পূর্বদিকের গেটের কাছে দেখলাম গলায় কাপড় দিয়ে টেনে আনছে ছাত্রদের লাশ সবাই মিলে। আমি তখন একা, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তাও পার হতে পারছি না। কয়েকজন ধোপা আমাকে

রাস্তা পার করে দিলো। আমি বাচ্চাদের নিয়ে হল ত্যাগ করে কিছুদূরে রাস্তায় সবার সাথে মিলিত হলাম। চলে গেলাম সবাই মিলে হোসেনী দালানে। হোসেনী দালান থেকে প্রায় চারদিন পর বেলীর মাকে সাথে নিয়ে মেডিক্যালে এলাম। সেখানে এসেই শুনলাম জ্যোতি বাবু স্যার এই মাত্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেলীর মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি স্যারকে দেখতে গেলাম।

চিৎবল্লী
প্রাক্তন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[অতি পরিচিত চিৎবল্লী এত মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ দেখে নিজের মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে পারেননি। পাগলের মত সারা হল দৌড়াদৌড়ি করেছেন। বিহারী মনে করে পাক বাহিনী তাকে হত্যা করেনি। জগন্নাথ হল গণহত্যা সম্পর্কে তার বর্ণনা মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক।]

২৫শে মার্চ দিনের বেলা মিছিল, মিটিং ইত্যাদি সমস্ত শহরে। রাত ১১টার দিকে আমরা খবর পেলাম যে লোকজন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে নবাবপুরের দিকে যাচ্ছে। আমরা হলের কর্মচারীরা সকলেই ছিলাম, কেউই আমরা যাইনি। একজন লোক বলল যে এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই এদিকের সমস্ত লোক শহরের দিকে যাচ্ছে। আমি তখন ভাবলাম যে আমরা যাব না, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। আমি, দাশু, মোহন, বুধিরাম মিলে মহাভারত পড়ছিলাম সন্ধ্যা থেকে। তারপরে আমরা সবাই মিলে খাওয়া–দাওয়ার জন্য যে যার বাড়ি চলে গেলাম। আমি বাসায় গিয়ে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমাইনি তখনও। কিছু কিছু আওয়াজ পেলাম চারদিকে। আমি তখন একটু বাইরে বের হয়ে এলাম এবং শিববাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে জগন্নাথ হলের চারদিকে যে দেয়াল তাতে শুধু বন্দুকের নল তাক করা আছে। লোক দেখা যায় না শুধুই বন্দুকের নল দেখা যাচ্ছে। আমি তখন ঘরের দিকে আসি এবং বলি যে, তোমরা কেউ বাইরে যেও না, অবস্থা ভাল দেখা যাচ্ছে না। গুলি চললে আমরা কেউ বাঁচব না। এইভাবে আমরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং বাসায় বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরেই চারদিক থেকে শুধু গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। অবিরাম গুলির শব্দ শুনে আমি আবার বাইরে চলে এলাম। আমার বাসাটা ছিল বর্তমান পূর্ব বাড়ির উত্তর দিকে। আমার ঐখানে বাসা থাকার জন্য রাস্তা, শিববাড়ি স্পষ্টই দেখতে পেতাম। এমন সময় দেখলাম দুইজন লোক হল থেকে শিববাড়ির দিকে যাবার জন্য দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল হলের মধ্যে। তখনই আমি বুঝলাম মিলিটারী এর মধ্যেই এসে পড়েছে। আমি ঘরেই থাকলাম। আবার শুরু হলো গুলির শব্দ। ক্রমাগত গুলির শব্দে আমি ঘরেই বসে থাকলাম চুপচাপ, কিছুই করার নেই। তখনই চারদিকে মিলিটারী এসে পড়ল। আমার বাসার দিকেও মিলিটারী চলে এল। আমি ঘরের মধ্যে ভয়ে কাঁপছি। কি হয়, কি হয় এই ভেবে। আমাদের বাসার

মধ্যে দুইজন মিলিটারী আসল। তখন আমি আমার মেয়েকে কোলে নিয়া দাঁড়িয়ে আছি। ওরা আমাকে বললো ঃ "ইধার আও, বাচ্চা উতার কো।" আমি গেলাম ওদের কাছে। আবার বললো ঃ "বাচ্চা কো উতার কো।" আমি বাচ্চা নামিয়ে দিলাম। ওরা বলল ঃ "চল, হামারা সাথ চল।" আমি চলালাম ওদের সাথে, জানি না কোথায় যাব, কেন যাব, কিছুই জানি না। ওদের একজন আমার পিঠে বন্দুক ধরে রাখল আর অপর জন সামনে। ডাইভার হাতে চললাম ওদের সাথে। কিছুদুর গিয়েই একটা মেথর বাড়ি ছিল, বুদ্ধুদের বাড়ি। ওদের তিনটা রুম ভাগ ভাগ করা ছিল চারটা। ওরা একজন একটা রুমে ঢুকল এবং পরে অন্য তিনটা রুমেও ঢুকল, কি যেন দেখল। সেখান থেকে আমি ফিরে আসলাম বাসায়। বাসায় আসার পর ওরা আবার এলো এসে বলল ঃ "উ কিধার গিয়া?" তখণ আমার বৌদি বলল ঃ "ও তো আপকা সাথ গিয়া"। তখন ওরা আবার বললো ঃ "ঠিক হ্যায় হাম দেখে গা।" এই বলে ওরা চলে গেল। এর মধ্যে সারা রাত ওরা আর আমার বাসায় আসেনি। তারপর ওরা চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিল। ক্যান্টিন, ক্যান্টিনের সাথে ছাত্রাবাস ছিল তাতে, হলের কর্মচারীদের বাসাগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দিল। যখন চারদিক থেকে আগুন আমার বাসার দিকে আসছে, তখন আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। আমরা আমাদের ঘরের সামনের একটু জায়গায় তিনটি ঘরে আমাদের তিন পরিবারের লোকজন জড় হলাম। আমার বাসা, বুদ্ধুরামের বাসা, দাসুরামের বাসা, নরেশের বাসা এই চার বাসার লোকজন জড় হলাম, ওদের মধ্যে আমরা পুরুষরা যারা ছিলাম আমি, বলিরাম, দাসু, কেশব, রতন এরা সবাই বসে ছিলাম। আমি শেষ রাতে যখন দেখলাম যে চারদিক থেকে লাশগুলো টেনে আনছে, সে লোকগুলো তো একটা নেকের কাজ করছে। আমি ভাবলাম যে, আমিও যাই একটু লাশ ধোলাই করি গিয়ে, ধোলাই মানে টেনে টেনে এনে মাঠে জড়ো করি গিয়া। শিববাড়ি, জগন্নাথ হলের ভিতর থেকে মিলিটারীর সাথে এ কাজ করছে। যারা লাশ টানছে তাদের মধ্যে ছিল মিস্ত্রী, মনভরন, শিবু, শঙ্কর, বুধিরাম, মুন্নীলাল, জওয়াহর, বাসু, মোহন (২), শ্যামলাল আরও অনেকে। এদের মধ্যে চান্দুও ছিল। আমি তখন মনে মনে বললাম যে, "আমাদের হলের এতগুলো লোক লাশ ধোলাই করছে, ওরা নেকের কাজ করছে, আমিও যাই। আমার স্ত্রী আমাকে বাধা দিয়ে বলে ঃ "না তুমি যাবে না।" আমি রাগ হয়ে বললাম ঃ ওরা তো ধর্মের কাজ করছে, আমি যাব। তুই আমার ধর্মের কাজে নিষেধ করিস্ না। তোর কথায় আমি যাব না?" এই বলেই যখন রওয়ানা করলাম তখনই দরজায় একটা ধাক্কা খেলাম, মানে বাধা পেলাম। বাধা পাওয়ার পরে একটু বসলাম পাঁচ মিনিট, আবার উঠে যাওয়ার জন্য বের হতে গিয়ে আবার বাধা পেলাম দরজায়, এবারে আমি বললাম ঃ "বার বার বাধা পড়ছে, থাক যাব না।" তখন মাঠে গিয়ে বসে থাকলাম। তখন দেখছি যে আমাদের লোকজন লাশ ধোলাই করছে। এমন সময় দেখলাম পূর্ব দিক থেকে তিন/চারজন মিলিটারী আর আমাদের কয়েকজন দক্ষিণ বাড়ির দিকে লাশ আনার জন্য যাচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা বলল "এই, ইধার আও।" তখন আমি, কেশব, দাসু, বলিরাম সবাই একসাথে গেলাম। একটু দূরে একটি তুলাগাছ ছিল, সেখানে এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "এই তুম বাঙ্গালী হ্যায়?" তখন আমি বললাম ঃ " নেহি সাব, হাম বাঙালী নেহি হ্যায়, পশ্চিমা হ্যায়।" ওরা আবার বলল ঃ "ইয়ে তো শালা কৌন আদমী হ্যায়?" আমি বললাম ঃ "ইয়ে তো হামারা পশ্চিম ঘরনে ওয়ালা। হাম মুলকী আদমী হ্যায়।" আবার বলল যে ঃ "তুম ইসকে আন্দার কিয়া আয়া?" আমি বললাম ঃ "সাহাব, হাম তো নোকরী করতা হ্যায়। ছোট ছোট বাচ্চা হ্যায় তো হাম নোকরী করতা হ্যায়।" ওরা বলল, "তুম লোক কো মারতা নেহি হ্যায়।" আমি বললাম, "কভি কভি যদি কসুর হোতা কভি ধাক্কা লাগা দেতা হ্যায়। জরুর নোকরী করতা

আবার বলল ঃ "আবি বাঙালী মার সাক্তা হ্যায়?" আমি বললাম ঃ "জরুর মার সাক্তা হ্যায়।" ওরা আবার বলল, "ঠিক হ্যায় তুম লোক যাও, বাঙালী মারো পোচকে, আউর ফিরবি তুযে জবরদাস্ত হ্যায়, হাম কো বোলা, মারো ঠিক হ্যায়।" আমি বললাম, "হ্যা সাহাব ঠিক বল সাক্তা।" আমি তখন আমার সাথে অন্য যারা অর্থাৎ কেশব ও বলিরামকে বললাম ঃ "এই আবে চল, দাউর আর লাকড়ি নে, তো দেখা যায়ে তো।" এই কথা আমি বলার পর মিলিটারীরা হাসল এবং ওদিকে চলে গেল। আমি তখন বললাম যে, "দেখ ভাই এবারে জীবনে বাঁচা গেল। এর পরে আর সুযোগ হবে না তাই যে যেভাবে পারো শীঘ্রই ভাগো। যে যেখানে পারো চলে যাও, আর দেখা দিও না।" কে কোন দিকে যে গেল, তার খবর আমি আর জানি না। আমি আমার বাসায় চলে আসলাম। আমার ঘরের উত্তর দিকে একটা জানালা ছিল, সেই জানালা দিয়ে দেখি যে মানুষগুলি লাশ আনছে, রাখছে। শেষের দিকে শিববাড়ি থেকে কয়েকটা লাশ এনে ওদের অফিসারের কাছে রাখছে, আর খবর বলছে। শিববাড়ি থেকে যে লাশ আনছে তাদের মধ্যে, মনে হয় মধুর ক্যান্টিনের মধুকে দুইজনে কাঁধে ধরে হাঁটিয়ে এনেছে। পরে মেজর মিলিটারীদের কি যেন বলল। তারপর লাইন ধরতে বলল। যারা লাশ টানছিল তারা সব লাইনে দাঁড়ালো। ঐ লাইনের শেষে মিস্ত্রী ছিল। মিস্ত্রী মিলিটারীদের দিকে হাতজোড় করে কি যেন বলল, আর সাথে সাথে তাকে গুলি করে মারল। মিস্ত্রী পড়ে গেল আর সাথে সাথে ব্রাশ ফায়ার করল। ব্রাশ ফায়ার করাতে সকলে পড়ে গেল। মারার পরে মিলিটারী ৪জন হাসল এবং হাসতে হাসতে আমাদের বাসার দিকে এল। তখন আমি ভাবলাম ওদেরকে মারল এইবার আমাদের দিকে যখন আসছে, আমরা যে কয়জন তখন আছি আমাদেরই ডাকবে কবর দেয়ার জন্য। আমি দেখলাম যে কেউ নেই তাহলে আমিও ঘর থেকে বের হয়ে যাই। আমাদের এ্যাসেম্বেলীর যে গেট আছে সেখান থেকে বের হয়ে যাব। ভাবলাম। কিন্তু দেখি সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বন্দুক হাতে। মিলিটারীরা পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তখন আবার পিছনে ফিরে গেলাম। আমি ভাবছি যে আমাকে যদি সামনে দেখে তাহলে আমার আর রক্ষা নেই। পিছনে যদি যাই ওরা আসছে এদিকে তাহলেও একই অবস্থা হবে। আমি এখন কি করি? আমি যে ঘরগুলি পুড়ছে সে ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকলাম। কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই আগুনের তাপে। বাথরুমে গেলাম, আমার পায়ে জুতা না থাকায় পা ধোয়ার জায়গায় যে দুটো ইট দেয়া ছিল তা তখনও গরম হয়নি তার উপরে দাঁড়ালাম। ডানে-বাঁয়ে সব জায়গায় আগুন জ্বলছে। তিন-চার মিনিট পর হঠাৎ আমার ভীষণ জল পিপাসা লাগল, জীবন বের হয়ে যাবার মতন। জলের কল ছেড়ে জল আসছে দেখে স্বস্তি পেলাম, কিন্তু জলের মধ্যে হাত দিতেই গরম জলে আমার হাত পুড়ে গেল। জলের ট্যাংক আগুনে গরম হয়ে গিয়েছিল। হাত সরিয়ে নিলাম, ভাবলাম বাসায় গিয়ে জল খাব, মারে যদি তো মরব। জল পিপাসায় মরে যাই আর কি! আরেক বাথরুমে গিয়েও জল খেতে পারলাম না। আরও দুই-তিন মিনিট অপেক্ষা করে বাসার দিকে গেলাম। আমার তখন হুঁশ ছিল না। আমি কে? কেন এখানে? সেসব কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। বাসায় গিয়ে দেখলাম আমার ভাই, বৌদি, আমার স্ত্রীকে। তারা দেখেছে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, তাই ওরা ভাবলো যে আমি গুলি খেয়েছি। কিন্তু সেসব সম্বন্ধে আমার কোন হুঁশই ছিল না। তারপর নাকি আমি মাঠে গিয়ে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করেছি। কারণ আমি হয় গুলি খেয়েছি, না হয় আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। পরে আমার মনে পড়েছে, আমার শরীরে যে রক্ত তা হল আমি পাগলের মত এদিক-ওদিক করে যখন ক্যান্টিনে ঢুকতে চেয়েছি, তখন কোনো দরজা না পেয়ে জানালার কাঁচ মাথা দিয়ে ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার সময়ই মাথা কেটে গিয়েছিল। আমি যখন মাঠে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি

করছি, তখন আমার বড় ভাই আমাকে ধরতে গেল, কারণ কেউ যায় না দেখে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে আমার কোমড় ধরে আমাকে অন্য ঘরে ঢুকিয়ে মাথায় জল দিতে লাগল এবং এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যে আমার সমস্ত শরীর ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনজন লোক এল আমাদের ওখানে। তাদের একজন বুদ্ধুর ছেলে শিবু, বক্‌শীবাজার মোড়ের মসজিদের কাছের ইতু মিয়া, অপর জনকে চিনতে পারিনি। তারা বলল ঃ "আমরা দেখতে এলাম তোমাদের মধ্যে কে গুলি খেয়ে মারা গেছ বা জীবিত আছ। এখন রোডে মিলিটারী নেই, তারা সব নামাজ পড়তে গেছে, রোড খালি। তোমরা জীবন বাঁচাতে চাইলে এখনই হল ছেড়ে চলে যাও।" তাই ওদের কথা মতন আমরা সবাই রওয়ানা হলাম। হোসেনী দালানে তিনদিন থাকার পর আবার আমরা কেউ কেউ মেডিক্যালে, কেউ কেউ এদিক সেদিক চলে গেলাম আমাদের বাচ্চা–কাচ্চাসহ। রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়ে আছে। আমার পা পুড়ে যাওয়ায় পোড়া পা নিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

প্রয়াত মাখন লাল রায়
পেশা ঃ হেড দারোয়ান,
জগন্নাথ হল।
(সাক্ষাৎকার দানের পর মারা যান)

[প্রধান দারোয়ান হিসেবে মাখন লাল রায় হলকে রক্ষা করতে পারেনি, কোনমতে আত্মরক্ষা করেছেন মাত্র। গণহত্যার বড় একটি অংশ তিনি নিজেই দেখেছেন দক্ষিণ বাড়ির দিক হতে। কিন্তু বয়স বেশি হওয়ায় সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারেননি। তবু যা বলেছেন তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।]

২৫শে মার্চ রাতে ছাত্র বাবুরা রাস্তায় ব্যারিকেড দেবার জন্য হলের পুরনো সব পানির ট্যাংক নিয়ে যায়। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। ছাত্র বাবুদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা ঐ সমস্ত ট্যাংক দিয়ে কি করবেন। তাঁরা বললেন ঃ "মিলিটারী আসার পথ বন্ধ করতে হবে। আমাদের হলে যাতে গাড়ি আসতে না পারে তাই রাস্তা বন্ধ করতে হবে।" জগন্নাথ হলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গোডাউন ছিল তা থেকেই এই পুরনো পানির ট্যাংকগুলি নিচ্ছে। আমি বললাম ঃ "মিলিটালী আসবেই, এগুলো দিয়ে কি আর আসা বন্ধ করা যাবে?" ছাত্র বাবুরা বললেন ঃ "এগুলো সরিয়ে আসতে আসতে আমরা সবাই চলে যাব বা সরে যেতে পারব।" ইকবাল হলে গোলাগুলি চলছে। রাত তখন সাড়ে এগারটা বাজে, ইকবাল হলের মাঠে যে শব্দ হচ্ছে এ সম্পর্কে ছাত্র বাবুদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন যে, "না, ওতো আমাদের ছেলেরা করছে।" আমি বললাম, "এত গোলাগুলি ছাত্ররা করছে বলে আমার মনে হয় না।" তখন তারাই বলল যে, "দেখি তো কি ব্যাপার!" তখন দুই–তিনজন বৃটিশ কাউন্সিলের দিকে গেল এবং দৌড়ে এসে বলল যে "মিলিটারীরা ইকবাল হলে গোলাগুলি করছে। এখন কি করতে পারি?" এই কথা বলতেই মিলিটারীরা এসে

আমাদের হল ঘিরে ফেলেছে। আর্মি জগন্নাথ হলে ঢুকে পড়েছে ঐ ভাঙ্গা দেয়ালের দিক থেকে। মতিন স্যারের বাসার দিক থেকে মাঠের দেয়াল ভাঙ্গা ছিল। পাক-সৈন্যরা ঢুকেই গুলি করতে শুরু করল। আমি তখন পুকুরের ঘাটে দাঁড়ানো। যখন ৩০/৩৫ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে তখনই গুলি শুরু হয়। সবাই উত্তর বাড়ি, দক্ষিণ বাড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, কে কোথায় গেল ঠিক করা যায়নি। তখন পাক-সৈন্য উত্তর বাড়িতে গুলি করছে। বোঝা গেল যে উত্তর বাড়ির উপরই সৈন্যদের আক্রোশ। এদিকে যে ছাত্র ছিল তা ওদের ধারণা ছিল না। আমি এবং প্রিয়নাথ ছিলাম দক্ষিণ বাড়ির গেটে। প্রিয়নাথকে বললাম, তোমার খাকি পোশাক থাকলে পরে নাও, আমি পোশাক পরছি। এমন সময় উত্তর বাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ি এসে থামল। ওরা নেমে আমাদের ঠাকুর ঘরটার দিকে আসছে। তখন আমি দক্ষিণ বাড়ির গেটে ছিলাম। এসেই প্রিয়নাথের ঘাড়টা ধরলো। আমাকেও ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পরে শুনেছি এদিক সেদিক ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে ওকেই আগে গুলি করে। যতদূর জানা যায় যে, সুধীরের ক্যান্টিনের কাছে বড়ই গাছের নিচে প্রিয়নাথকে গুলি করে। আমি ছুটে দক্ষিণ বাড়ির ডাইনিং-এর পাশে একটা ছোট্ট রুম ছিল সেখানে লুকিয়ে পড়ি। ঐ রুমে একটা লাইট ছিল সেটা নিভিয়ে ফেলি। দক্ষিণ বাড়ির ডাইনিং হলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দুইটা রুম ছিল। আমি দক্ষিণ দিকের রুমে গিয়ে ঢুকলাম। ঐ রুমে ছাত্ররা ছিল যাদের নাম আমার মনে নেই। তখন ওখানে আরও চারজন মিলিটারী এসে খুঁজতে লাগল। আর বলতে লাগল ঃ "শালে লোক কি ধার হ্যায়, কি ধার গিয়া"। আমরা তো ভাঙ্গা চেয়ার মাথায় দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। রুমটাতে ভাঙ্গা কতকগুলো চেয়ার ছিল। সৈন্যরা খুঁজে এদিকে চলে এসেছে আর যায় নাই ওদিকে। আমরা আস্তে আস্তে কথা বলছি যে, "বাবু ওরা এভাবে হামলা করছে এখন কি হবে?" এভাবে বসে বসে কথা বলছি আর এদিকে খুব গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি। এত শব্দ হচ্ছে যে সমস্ত হলটাই কাঁপছে। ছাত্র বাবুরা বলছে "কি আর করবে, ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে, মারধর করবে, পরে ছেড়ে দিবে।" এইটুকু আশ্বস্ত করল ছাত্র বাবুরা আমাকে। রাত যখন ভোর পাঁচটা সৈন্যদের আরো একটা গাড়ী এসে হলে ঢুকল। গাড়িটা দক্ষিণ বাড়ির পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢুকেছে। তখন আমি বললাম, "বাবুরা এখন তো বাঁচার সম্ভাবনা নাই। রাত্রিবেলা ওরা খুঁজে পায়নি, কিন্তু দিনের আলোয় তো আমাদের পরিষ্কার দেখতে পাবে। কি করব, এখন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু, কোথায় যাব?" তখন জানালা দিয়ে দেখলাম ওরা তিনতলা পর্যন্ত উঠেছে এবং নেমে গেল। ডাইনিং-এর দিকে আর এল না। কোন রকমে সেবারেও প্রাণে বেঁচে গেলাম। দুপুর প্রায় বারোটার দিকেও আমরা এখানেই আছি, এরপরে আমরা বাইরে গেলাম। আমি এদিকে বাসায় আসতে পারি না। ছাত্র বাবুরা বের হয়ে কে কোন্ দিকে গেল তা বলতে পারি না। দক্ষিণ বাড়ির মধ্যে লণ্ডীর কাছ থেকে মাঠের মধ্যে আমি সব দেখেছি। বেলা যখন প্রায় তিনটা (আনুমানিক) তখন আবার ওরা ট্রাক্টর নিয়ে আসে। একটা ট্রাক্টর এসে গর্ত করে বর্তমান শহীদ মিনারে এবং পরে ঐ গর্তের মধ্যে সমস্ত লাশগুলিকে ফেলে। কারো হয়ত হাতে গুলি লাগায় না মরে বাঁচত, তাকেও জোর করে মাটি চাপা দেয়া হল।

আহত লাশগুলি হাত দিয়ে বারণ করে, কিন্তু তারা শোনেনি, ঠেলে মাটি দিয়ে দিল। এমনভাবে গর্তের মধ্যে ফেলল যে কারও হাত, পা, মাথা, কাপড়, লুঙ্গি বেরিয়ে আছে। এইভাবে মাটি দিয়ে চলে গেল।

ইদু মিয়া
পুস্তক বিক্রেতা
ঢাকা।

[জগন্নাথ হলের অক্টোবর ভবনের বিপরীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদটি বর্তমানে যেখানে, সেখানেই ছিল ইদু মিয়ার দোকান। ইদু মিয়া খুব শিক্ষিত নন, কিন্তু যে কর্ম তিনি সম্পাদন করেছেন তা তাকে মহত্ত্বের শীর্ষে তুলে দিয়েছে। জগন্নাথ হলের ছাত্র-শিক্ষকদের এবং পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারের শিক্ষক ও তার স্বজনদের হত্যার পর লাশগুলো যখন জগন্নাথ হলের মাঠে এনে পাক বাহিনী ক্ষণিকের জন্য বুলডোজার সংগ্রহ করতে হল ত্যাগ করে, ইদু মিয়া তখন জগন্নাথ হলের মাঠ হতে আহতদের মেডিক্যালে নিয়ে গেছেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য। ইদু মিয়ার জন্যই হয়তো অনেকে বেঁচে গেছেন।]

২৫শে মার্চ রাত আটটায় সংবাদ পেলাম ইউনিভার্সিটি এলাকায় মিলিটারী আক্রমণ করবে। আমরা তখন তাস খেলছিলাম, মনভরন, বুদ্ধুরাম এবং আর একজন, মোট চারজন তাস খেলছিলাম। আমি তখন মনভরনকে বললাম "তোমরা আজ হলে থেকো না, বিপদ হতে পারে।" আমরা তখন ওখানেই ঘোরাঘুরি করছিলাম। রাত ১১টার সময় মিলিটারী আসল। জগন্নাথ হলের রাস্তার সামনে নুড়ি বিছানো ছিল, নতুন করে রাস্তা বানানো হবে। সেখানে এসে মিলিটারীরা থামল। এমন সময় দেখি জগন্নাথ হলের পূর্বদিক দিয়ে হলুদ বাতির মতো কি যেন কতগুলো উপর দিয়ে উড়ে গেল। তারপরই গুলির আওয়াজ হল কামানের মত। কিছু সময় পর আওয়াজ থেমে গেল, জগন্নাথ হলের পূর্ব দিক দিয়ে মিলিটারী ঢুকে গেল। জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির সামনে গিয়ে বলল, "Come down all person" দুই-তিনবার বলার পর গুলি ছোঁড়া আরম্ভ হল। তখন চারদিক থেকে শুরু হল কান্নাকাটি। কিছুক্ষণ পর দেখি এ্যাসেম্বলীর সামনে আমার খুব অন্তরঙ্গ লোক শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে। তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এলো। এনে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে ফেলে দিয়ে কয়েকটা লাথি মারলো। তারপর তাঁকে ওরা নিয়ে গেল। তাঁর পরনে ছিল ধুতি, আর তাঁর পৈতাটা ঝুলছিল। তাঁকে ধরে নিয়ে পূর্বদিক দিয়ে মিলিটারী চলে গেলো। আমি জগন্নাথ হলের বিপরীতে একটি মসজিদ ছিল সেখানে বসে সব দেখছিলাম। এর মধ্যেই কান্নাকাটি, চীৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। একজন ছাত্র এ্যাসেম্বলির পাশ দিয়ে দেয়াল টপকে দৌড়ে শহীদ মিনারের কাছাকাছি পৌছাবার সাথে সাথে তাকে গুলি করল। গুলি খাবার সাথে সাথে সে ছিটকে পড়ল এবং 'পানি দাও', 'পানি দাও'

বলে চীৎকার করতে লাগল। সারারাত এরকম গুলি চলেছে আমরা দেখেছি। জগন্নাথ হলে টিনের চালের যে একটা ছাত্রাবাস ছিল তাতে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর তারা শিবু, শঙ্কর আর কয়েকজনকে নিয়ে বের হল বাইরে লাশ তুলে আনতে। শহীদ মিনারের সামনে যে ছেলেটিকে গুলি করেছিল তাকে নিয়ে গেল। এরপর তারা চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর বাড়িতে। সেখানে যেয়ে বের করে নিয়ে এলো মনিরুজ্জামান সাহেবকে, পরিসংখ্যানের প্রফেসর। পরনে লুঙ্গি, হাতে ঘড়ি তাঁকে বের করে এনে জগন্নাথ হলের গেটের কাছে রাখা হল। পরে আর একটা ছেলেকে নিয়ে এলো। পরে আমি চিনতে পেরেছি সেটা ছিল মনিরুজ্জামান স্যারের ছেলে। যারা লাশ টেনে নিয়ে এলো তাদের জগন্নাথ হলের মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করল। সব লোকগুলো পড়ে গেল। আবার আরেক দল নিয়ে এল। তাদের যখন গুলি করে তখন যে ধোঁয়া ওঠে, সে ধোঁয়া ছিল লাল। কিছু সময় পর মিলিটারী সব চলে গেল। মিলিটারী চলে যাবার পর আমি হলে ঢুকি। ঢুকেই সর্বপ্রথম আমাদের যে ষ্টাফ কর্মচারী ছিল তাদের ওখানে গেলাম। তাদেরকে বললাম, "তোমরা তাড়াতাড়ি বের হও। তোমাদের যে টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না আছে সব নিয়ে বের হও, আমার সংগে চল।" তারপর মাঠের মধ্যে গেলাম, যেয়ে দেখি আমার এক পরিচিত ছাত্র কালীদা, মাঠে পড়ে আছেন। তিনি বললেন, "আমার গুলি লাগেনি, আমাকে নিয়ে যান। আমাকে যখন গুলি করেছে তখন আমি শুয়ে পড়েছি।" তাঁর ওঠার ক্ষমতা নেই। তাকে আমি ধরে নিয়ে যাই। আমি তাঁকে একটা ফুলপ্যান্ট আর শার্ট পরিয়ে বলি, "জলদি আপনি ভাগেন। চলে যান এখান থেকে।" তারপর দেখি মনভরনের লাশ, মনভরনের মা, তার স্ত্রী নিয়ে আসছে। তারপর পেলাম চাঁনদেব ভাইকে আহত অবস্থায়, তাকে নিয়ে এলাম। এসে তার বাড়ির কাছে রাখলাম। তখন আমার শুধু মনে হল আমার এখন একটাই কর্তব্য, তা হল যারা জীবিত আছে তাদের বের করে নিয়ে আসা। খগেনের স্ত্রী মানে মতির মা, তিনি আমাকে বললেন, "আমার মতির নাকি হাতে গুলি লেগেছে, ওকে যেয়ে একটু নিয়ে আসেন।" তখন আমি আবার গেলাম মাঠে, যেয়ে দেখি মতি জীবিত নাই, সে কথা আমি আর তার মাকে বললাম না। চাঁনদেবকে নিয়ে প্রথমে একটা কন্ট্রাকটরের গোডাউনে রাখলাম। উনি আমার কাছে পানি খেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি দেইনি, কারণ আমি জানি আহত অবস্থায় পানি খেলে মানুষ মারা যায়। আমি তাঁকে বললাম "আপনি এখানে থাকেন।" তারপর আর একজন বুড়ো লোকের হাতে গুলি লেগেছিলো। তাঁকে বের করে নিয়ে এলাম, তাঁর পরিবার সব নিয়ে চলে এলাম নিরাপদে। আমি যখন সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি তখন বহু লোক আমাকে নিষেধ করেছে যে তুমি আর যেয়ো না, গেলে মারা পড়বে। আমার সাথীরাও আমাকে নিষেধ করেছে, চাপ দিয়েছে আর জগন্নাথ হলে না যেতে। কিন্তু তবু সে নিষেধ অমান্য করেই আমি গেছি মানুষগুলোকে বাঁচাতে। আমি সবার নিষেধ অমান্য করে জগন্নাথ হলের পুকুরপাড় দিয়ে যাবার সময় দেখি পুকুরে একটা মাথা, তার সমস্ত শরীর জলে ডোবা। কাছে যেয়ে চিনতে পারলাম, হরিধন দাস, ফিজিক্সে অনার্স পড়ে। তাকে যেয়ে টেনে তুললাম, দেখি লোকটা অজ্ঞান। আমি একা খুব কষ্ট করে কাঁধে তুলে পূর্ব দিকের গেট দিয়ে মেডিক্যালে নিয়ে গেলাম। তাঁকে মেডিক্যালে রেখে চাঁনদেব ভাইকেও নিয়ে গেলাম মেডিক্যালে। এই করেই সারারাত কেটে গেছে, একটুও ঘুমাইনি। কি করে ঘুমাই? আমার আত্মীয়ের মতোই কতকগুলো

লোক পড়ে আছে। বিপদের মুখে তাদের রেখে তো ঘুম আসে না! তাই মেডিক্যালে এদের দিয়েই আবার ফিরে এলাম হলে আরও কেউ আছে কিনা দেখতে। এসে দেখি, এ্যাসেম্বলির ভিতরে যশোদা জীবন সাহা। বাইরে এসে আমাকে চিনতে পারল। বলল ঃ "আমি আর আমার ভাই আটকা পড়ে আছি। আমাদের নিয়ে চল।" তাঁদের বের করে নিয়ে এসে আমার এখানে রাখলাম। তারপর বুদ্ধুরামের স্ত্রীর সাথে দেখা, তার সাথে একটি বাচ্চা। সে বলল তার বাচ্চার বাপের নাকি গুলি লেগেছে, যদি একটু খোঁজ করে আনতে পারি। আবার মাঠে গেলাম, দেখলাম অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে, তাঁকে মাঠে এনে গুলি করেছে। তখনও বহু লোক জীবিত আছে, কেউ কেউ কথাও বলতে পারে। একত্রে এত লাশ আমি জীবনেও দেখিনি। অবশ্য আমার গোনা নেই। তবে ষাট–পঁয়ষট্টি জনের লাশ তো হবেই।ড্রেনে দেখলাম একটা লাশ পড়ে আছে, আমার পরিচিত। নিরঞ্জন হালদার, বাড়ি বরিশাল, ফিজিক্সে অনার্স পড়তেন। খুব পরিচিত। আমরা একসাথে উঠেছি বসেছি। উত্তর বাড়িতে দেখলাম দুটো লাশ। সে দুটো কুকুরে খেয়েছে। রেজিস্ট্রার বিল্ডিং থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম, সে পরিসংখ্যানে পড়ত। আমার সংগে ছিলেন ধীরেন বাবু, জগন্নাথ হলের স্টাফ। আমরা পরে ৩৪ নং বাড়িতে এলাম। ৩৪ নম্বর বাড়ির নিচতলায় ছিল হাই সাহেবের পরিবার; তাদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে এলাম। তারপর এলাম জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসায়। স্যারের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার কোথায়? তিনি বললেনঃ "স্যারকে মিলিটারীরা জখম করেছে, তাঁকে মেডিক্যালে ভর্তি করেছি।" স্যারের কাছে গেলাম। স্যার আমাকে বললেন ঃ "তুমি হয়তো মনে করেছো আমি ভাল, কিন্তু আমি থাকবো না। আমি মেডিক্যালে শুনেছি তুমি নাকি হলের অনেক ছাত্রকে বাঁচিয়েছ, আমি যদি থাকতাম তবে সে কথা আমি প্রকাশ করতে পারতাম।" তিনি তারপর আর মাত্র তিন/চার দিন জীবিত ছিলেন। স্যারের স্ত্রীর কাছে গেলাম স্যার মারা যাবার পর। বললাম, "আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?" তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আপনাকে স্যারের লাশটা যে করেই হোক এনে দিতে হবে। মিলিটারীরা যদি স্যারের লাশ নিয়ে যায় তবে আমি খুব দুঃখ পাব।" আমি বললাম, "আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, স্যারের লাশ কোনমতেই আমি মিলিটারীকে নিতে দেব না।" মেডিক্যালে অনেক ছাত্র আছে আমার পরিচিত, তাদেরকে দিয়ে স্যারের লাশ আমি খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে
প্রাক্তন কর্মচারী, প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়,
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে জগন্নাথ হলের অতি পরিচিত ব্যক্তি। তার বাসা ছিল জগন্নাথ হলেই। তিনি উত্তর বাড়ির পেছন হতে এবং পুকুরের পশ্চিম দিক হতে গণহত্যার নারকীয় ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। সুরেশ দাস গুলি খেয়ে ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে'র বাসায় আশ্রয় নেন। তার সাক্ষাৎকারে রয়েছে এসব ঘটনার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ।]

আমি প্রতিদিনই সন্ধ্যার দিকে হল থেকে বের হয়ে বাসায় যেতাম। বাসায় আমার অনেক গরু–বাছুর ছিল, তাদের খাবার দিতাম। তারপর ঘরে যেতাম, ঘরে গিয়ে চা–টা খেয়ে বাইরে যেতাম। বাইরে থেকে ৯টা–১০টার দিকে ফিরে আসতাম। ২৫ তারিখেও ঠিক তাই করেছি। আসার পথে দেখলাম আমার ছোট ভাই, ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। সে আর তার এক বন্ধু মাঠের মধ্যে যে বেঞ্চ ছিল সেই বেঞ্চে বসা। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে বাসায় গেলিনা?" সে বললঃ "হ্যাঁ যাই। এ কথা জিজ্ঞেস করে আমি চলে গেলাম বাসায়। কিছুক্ষণ পর সেও বাসায় গেল। আমার গরু–বাছুর যা ছিল সবগুলো ঘরে নিয়ে বাঁধলাম। গরু–বাছুর বেঁধে হাত–পা ধুয়ে খেতে বসলাম। যখন খেতে বসেছি সে সময়ই গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। তখন বাজে প্রায় ১১টা, সাড়ে এগারটা। তাড়াতাড়ি খেলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম তুমি তাড়াতাড়ি খাওয়া–দাওয়া সারো আমি একটু বাইরে দেখে আসি। রাস্তায় অনেক হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। গাছ কাটার আওয়াজ, রাস্তায় অনেক পুরনো ট্যাংক ছিল সেগুলো ধাক্কিয়ে নেবার আওয়াজ। যখন ইউনিভার্সিটির গুদামের সামনে গেলাম, দেখলাম মৃণাল বোস। তার সংগে আর একটি ছেলে ছিল তার নাম আমার মনে নেই। তারা বের হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কোথায় যান?" উত্তরে তারা বলল "একটু দেখে আসি।" মিনিট পাঁচের মধ্যে তারা ফিরে এল। ফিরে আসার পর তাদের সঙ্গে আমার দেখা হল গেটের সামনে। জিজ্ঞেস করলাম "কি দেখে এলেন"? তারা বললেন, "কিছু না, আমাদের লোকই" এর আগে একটা লোক রাস্তায় দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে যে মিলিটারী বের হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি রাস্তাঘাট বন্ধ কর, তা না হলে সব মেরে ফেলবে। এ কথাবার্তার পর মিনিট দুই–তিনের মধ্যে আমি বাসায় ফিরে গেলাম। বাসায় ফিরে গিয়ে আমি দরজার সামনে গেছি, আর আমার স্ত্রী বাসন পত্র ধুয়ে বাসায় ফিরছিল। এমন সময় বিকট একটা আওয়াজ হলো, আওয়াজ হবার সংগে সংগে আমার স্ত্রীর হাত থেকে সমস্ত থালা–বাসন সব পড়ে গেল। দুইজনে একত্রে থালা–বাসন কুড়িয়ে ঘরের লাইট বন্ধ করে দিলাম। এমন সময় দেখি সীতানাথদা দৌড়ে হলে যাচ্ছেন। বলে গেলেন দেখে আসি দুঃখীরাম কি করে। আমি

সীতানাথকে ডেকে বললাম "হলে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ কখন কোন দিক থেকে কোন গুলিগোলা এসে গায়ে পড়ে, দুঃখীরাম ঠিকই আছে" রাত ২ টা–৩ টার দিকে দুজন ছাত্র এসে আমার ঘরে ঢুকল। নামগুলো আমার মনে নেই। তখন হলে প্রচণ্ড গুলি হচ্ছিল এবং ২–৩ টা রুমে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। নর্থ–হাউজের কোন কোন ঘরে আমি দেখলাম আগুন জ্বলছে। রাত্রে আমি একটুও ঘুমাইনি, সব ছেলেমেয়েদের লেপের নিচে শুইয়ে দিলাম। কাউকেই চলাফেরা করতে দেইনি। রাত দুইটা–তিনটার দিকে ৩ জন ছাত্র এসে আমার ঘরে ঢুকল। একটা ছাত্র আমাদের বিপদে ফেলতে শুরু করল। যখন গুলির বড় বড় আওয়াজ হতো তখনই সে চীৎকার করে উঠতো। আর দুইজন ছেলেকে নিয়ে আমি তার মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলাম। আর যেন সে কোন চীৎকার করতে না পারে। বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে অনেক বুঝানোর পর সে চীৎকার করা বন্ধ করল। যখন ভোর হয়ে গেছে, আমি ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম বেশকিছু মিলিটারী ছাদে উঠে গেছে। উঠে কোথায় কি আছে না আছে সবকিছু খুঁজছে। যেখানে মানুষজন পাচ্ছে তাদের টেনে টেনে আনছে। এনে লাইন করে দাঁড় করাচ্ছে। পূর্ব দিকে মুখ করে লাইন করছে। সামনে মিলিটারী দাঁড়ানো এবং চারদিকে মিলিটারী ঘুরছে। ছাদের ওপর লাইন করেছে কিন্তু ছাদের এত কিনারে যেন সবাই নিচে পড়ে যায়। সেখান থেকে একটা ছেলে লাফ দিয়ে পড়ে গেল, নাম রণদা। তারপর তাকে গুলি করা হল। তিন তিন জন করে লাইন দিয়ে হাত উঁচু করে তাদের গুলি করা হল। ঘর থেকে আমি কোন আওয়াজ পাইনি। যখন পিছন দিকে গুলি করছিল তখন রণদা পিছন থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে। লাফ দেয়ার সাথে সাথেই একজন মিলিটারী ছাদের কিনারে যেয়ে তাকে গুলি করে। সেগুলি লেগেছিল রণদার। ২৭ তারিখ আমি রক্ত পেয়েছিলাম সেখানটায়। ২৬ তারিখ দুপুরের দিকে ছাদের উপর যাদেরকে গুলি করেছিল, সুরেশ দাস বলে এক ছাত্র ছিল, এম. এড. পড়ত, সে ঐ লাইনে ছিল। তার গুলি লেগেছিল গলায়, অনেকক্ষণ তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। যখন দেখলেন ছাদে কোন মিলিটারী নেই তখন তিনি নিচে নেমে আসেন। দোতলা পর্যন্ত নেমে এলেন তারপর দোতলার বাথরুমের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে জলের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে আসেন বাগানে। তারপর বাগানের গাছের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমার ঘরের ভিতর এল। আমার ঘরের সামনে এসেই আমাকে ডাকতে আরম্ভ করল। আমি দেখলাম যে তার জামা–গেঞ্জি রক্তে মাখা। আমি তাকে ঘরে নিয়ে এলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথায় ছিলেন"? তিনি বললেন, "আমাকে ছাদে লাইনে গুলি করেছে"। এতটা রক্ত তার ঝরছে যে আমি তা প্রথমে লক্ষ্য করিনি। তখন আমাদের একটা পানের দোকান ছিল। দোকানের সমস্ত মালপত্র ঘরেই ছিল। সেখানে সালফার ডাইজিনসহ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছিল, অনেক খোঁজাখুঁজি করে বের করে নিয়ে তাকে দিলাম। বললাম ঃ "দেখুন কোন্‌টা দিলে আপনার উপকার হবে।" নিজে নিজে খুঁজে একটা ওষুধ বের করে তিনি বললেন ঃ "এটাই আমার ভাল হবে।" যখন দেখলাম সমস্ত জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে ছাদের উপরে গুলি করল তখন ভাবলাম আমাদের আর বাঁচা হবে না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, সারারাত ছেলেমেয়ে নিয়ে কিছুই খেতে চাইনি,এখন তুমি আমাদের চা করে খাওয়াও। ঘরের ভিতর কল ছিল, কল থেকে জল নিয়ে খুব আস্তে আস্তে চা করল। বিস্কুট ছিল, বিস্কুট দিল, সবাই চা–বিস্কুট খেলাম।

২৭ তারিখ যখন কারফিউ ছেড়ে দিল তখন আমরা ঘর থেকে বের হয়ে চারদিক দেখছি। আমি সরাসরি বের হয়ে উত্তর বাড়ির দিকে ঢুকলাম। প্রথমেই দুখীরামের ঘরের ভিতর ঢুকলাম, ঢুকে দেখি দুখীরাম পিছনের একটা চৌকির উপর শোয়া, হাত-পা, মুখ সব পোড়া। দেখে মাথাটা ঘুরে গেলো। আমি একটা দরজার সাথে দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ পর আমি ঘর থেকে বের হয়ে আসি, এসে একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত দেখলাম। দেখি দোতলার বারান্দায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, পা ফেলবার জায়গা নেই। ৭৫ নম্বর ঘর, ঘরটার সামনে বাগান। ঘরটা দোতলায়। ঘরটার সামনে বাগানে ঘাসের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু রক্ত বেশকিছু জায়গায়। তার উল্টা দিকে পুকুরের কাছে একটা গর্ত আছে সেখানে এই রকম রক্ত জমানো আছে। এসব দেখে আবার সাইকেল নিয়ে বের হলাম স্যারদের বাসায় বাসায় খোঁজ নিতে। প্রথমে গেলাম যতীন ঘোষের বাসায়, তারপর গেলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। তারপর গোবিন্দ বাবু, গোপাল বাবু, পরেশ বাবু, প্রশান্ত বাবুর বাসায় গেলাম। সবাইকে জাগালাম। যতীন বাবুর মেয়ের গুলি লেগেছে। মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন তিনি। ডাক্তার সাহেবের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো তিনি মারা গেছেন। সন্তোষ বাবুর বাড়িটা একটু ভিতর দিকে, তিনি এতটা অনুভব করেননি। গুলিগোলার আওয়াজ পেয়েছেন যথেষ্টই। আমি গিয়ে দেখি উনি স্নান করে গামছা পরে বের হয়েছেন মাত্র, তখনই আমি গেছি। গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। উনি বললেন ঃ "বলিস কিরে, এই সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল, এখন কি করবি?" আমি বললাম ঃ "আমি বলতে পারি না। সামনে আরও কি কি হবে না হবে তাও জানি না। আপনারা যার যার খুশিমত কাজ করুন।" একথা বলে আমি তাঁর ওখান থেকে চলে এলাম। আমার ভাগিনা ছিল একটা, এখানে কেন্টিনে ঘুমাত, সময় সময় কেন্টিনে কাজও করত। ওর কথা হঠাৎ মনে হয়ে গেল যে ওরে তো কোথাও দেখলাম না! মহল্লায় ফিরে এসে সবাইকেই জিজ্ঞেস করলাম আমার সেই ভাগনে সুশীলের কথা। কেউ কেউ বলল- আমরা ঠিক বলতে পারি না, সকাল বেলা আমাদের সংগে সে এখানেই ছিলো। কোথায় যে সে গেছে আমরা ঠিক বলতে পারি না, তবে মেডিক্যালে খোঁজ করে দেখতে পারেন সেখানে আমাদের অনেক লোকজন আছে। গেলাম মেডিক্যালে এক সেখানে একঘন্টা দেড়ঘন্টা খুঁজলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পেলাম না, ফিরে এলাম। ফিরে যখন হলে ঢুকলাম, পুকুরের কোনায় একটা লব্ডি ছিল সেখানে আসতেই একটা আওয়াজ পেলাম, গুলির আওয়াজ। তখন দেখলাম ইউনিভার্সিটির একটি বড় গুদাম আছে সেখান থেকে একটা লোক দৌড়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। গুদামের পশ্চিম কোণে একটি সেগুন গাছ ছিল, সেগুন গাছটির কাছে গিয়ে লোকটি পড়ে গেল। বুঝলাম লোকটিকে গুলি করেছে। আমি ঐখানে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি লোক ছুটে গেল। ঐ লোকটা সেখানে মারা গেল। দেখে আমি সংগে সংগে বাসায় গেলাম। আমি বাসায় গিয়া দেখি আমাদের নেবার জন্য দুইজন লোক, ডিজি অফিসে চাকরি করতো একজনের নাম সন্তোষ সরকার আর একজনের নাম হাজী আবদুর রব বসে আছেন। তাঁরা বললেন এখানে তুমি থাকতে পারবে না তুমি আমাদের সাথে চল। তাদের সাথে আমি হাজী সাহেবের বাড়ি চলে গেলাম।

২৭ তারিখ যখন মাঠে গেছি তখন দেখলাম ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ে সবাইকে পুঁতে

রেখেছে। আমার তখন মাথার ঠিক নেই। যে ভাগ্নেকে খুঁজছিলাম তাকে পাইনি, সে মারা গেছে। জগন্নাথ হল মাঠে সে শহীদ হয়েছিল। লাশ টানার কাজে নাকি সে ছিল। লাইনে দাঁড়ান অবস্থায় তাকে গুলি করে। দেব বাবুর বাসার সামনে ষ্টাফ কোয়ার্টার ছিল। দোতলা তেতলায় যারা ছিলেন তারা হয়ত সবই দেখেছে সেদিনের পাক-বাহিনীর সে বীভৎসতা। তাদের কাছ থেকে শুনেছি দেববাবুর ডেডবডি নাকি বিছানার পাশে পাওয়া গেছে। দরজা বন্ধ ছিল, দরজা ভেঙ্গে ডেডবডি আনার জন্য ঢুকতে হয়েছিল। জানালা দিয়ে তাঁকে গুলি করে। তাঁর একটি বিবাহিতা পালিতা কন্যা ছিল। নাম রোকেয়া সুলতানা। তার দুটো বাচ্চা। তার স্বামী বলল ঃ "আমরা মুসলমান, আমাদের কিছু হবে না।" কিন্তু দরজা খোলার সংগে সংগে তাকে বাইরে এনে গুলি করে। রোকেয়া সুলতানা তখন ঐ বাসাতেই, তার সংগে নাকি পাক-সেনাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। ডঃ দেবকে গুলি করার পর ঐ অল্প একটু জায়গার মধ্যে রক্ত পড়ে ছিল। আমি ২৭ তারিখ ৯টার দিকে তাঁর বাসায় যাই। যেয়ে দেখি বাসা খালি, দরজা খোলা। ঘরের ভিতর একটা টেবিলের উপর তালা ছিল ঐ তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই। কারণ খোলা ঘর লুট হবার সম্ভাবনা আছে। যদিও তাঁর ঘর তখনই লুট হয়ে গেছে। ঘরের মূল্যবান আসবাব যেমন সেলাই মেশিন ইত্যাদি আর্মিরা নিয়ে গেছে।

প্রয়াত ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর
প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ
জগন্নাথ হল

(সাক্ষাৎকার দানের পর অধ্যাপক ঘোষ ঠাকুর পরলোক গমন করেন)

[প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর ছিলেন সে সময় একজন আবাসিক শিক্ষক। জ্ঞানদীপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর চোখের সামনে তাঁর ছাত্রদের গুলি করে মারতে দেখেছেন; শুনেছেন তার সহকর্মীদের মৃত্যুর সংবাদ। নিজে বেঁচে গেছেন প্রাণে কিন্তু তাঁর স্মৃতি ছিল এইসব শিক্ষক ও ছাত্রদের মৃত্যুর চিত্রে পূর্ণ।]

১৯৭১ সনের মার্চ মাস, তখন মুজিবুর রহমান সাহেবের কথায় ইউনিভারসিটির সবাই একত্রিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল স্ট্রাইক। আমরা হলের ভিতরে খাদ্য মজুত করছিলাম, যাতে না খেয়ে মরতে না হয়। তারপরই তো শুরু ১৯৭১ সনের সেই ভয়াল দিন, যেদিন পাক-সৈন্য আক্রমণ করলো বাঙ্গালী ব্যারাক। তার কিঞ্চিৎ পূর্বাভাসেই বাংলার দামাল সন্তান মুক্তিফৌজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ব্যারিকেড সৃষ্টি করছিল আপামর জনসাধারণ, বড় বড় রাস্তায় গাছ কেটে রেখে ট্রাক-লরি যাতে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু তবুও তো হঠাৎই আক্রমণ হয়, আর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলই ছিল জগন্নাথ হল। পাক-বাহিনীর ধারণা ছিল সমস্ত ছাত্র

একত্রিত হয়ে আক্রমণ চালাবে এখান থেকেই। পূর্ব দিকের রাস্তায় এসে পাক সৈন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়েই, কোন হুঁশিয়ারি ছাড়াই শুরু করলো কামান ছোড়া। যত রকম সাঁজোয়া যান ছিল ওদের, সমস্ত গাড়ি থেকেই শুরু করলো গুলি ছোঁড়া। তখন আমি ছিলাম হাউজ টিউটর্স কোয়ার্টার্সের তিনতলায়। ঐ দালান থেকে হলের ভিতরের সব দেখা যেত। সেখান থেকে দেখলাম জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির দিকে সমস্ত গুলি গুলো পড়ছে। বহু পরিচিত লোক মারা গেল, সব নাম এই অপ্রস্তুত অবস্থায় স্মরণ করা মুশকিল। আশেপাশের বহু শিক্ষকও নিহত হলেন। যখন দেখলাম আর কোন উপায়ই নেই, তখন আমি আমার দরজায় তালা দিয়ে ভিতরে কোনক্রমে ঢুকে পালিয়েছিলাম। বারান্দাটার নিচে শুয়ে ছিলাম এক রাত্রি। পাক সৈন্য এসে আমার দরজার বাইরে থেকে তালা দেখে বলল ঃ "এ শালা, আদমী ভাগ গিয়া।" এ কথা বলতে বলতেই তারা নেমে যায় সেটা টের পাই। তারপর আর কিছুই টের পাইনি, পরদিনও এভাবে গেল। পরের দিন যখন কারফিউ উঠিয়ে নিল, তখন চলে আসি ঢাকারই এক কোণে। সেখান থেকে নদী পার হয়ে পালাই। বহু গ্রাম ঘুরে ঘুরে কাটে কয়েক মাস। তারপর একজন বড় পলিটিক্যাল লিডার শওকত আলী, যখন বহু মুক্তিফৌজ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যাই আসাম।

এখন শুধু মনে হয়, ভগবানই হোক আর ভাগ্যই হোক বাইরে থেকে তালা দেয়ার হঠাৎবুদ্ধিটা মাথায় এনেই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে সেই বিভীষিকাময় রাত্রে। তালাটা দিয়ে আমার মনে হয় ভুল হয়েছে কিন্তু সেই ভুলটাই যে কতবড় শুদ্ধে পরিণত হয়। বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমি ভিতরে ঢুকলাম কিন্তু দরজার ছিটকিনি ফেলিনি, দরজায় ফাঁক ছিল। আমরা অন্য ঘর থেকে লক্ষ্য করলাম পাক সৈন্য প্রথমে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখল কিন্তু সমস্ত স্বাভাবিক দেখে তারা ফিরে গেল। ছিটকিনি দিতে আমার মনে ছিল না কিন্তু এই মনে না থাকা ভুলটাই আবারও শুদ্ধিতে পরিণত হল। যদি ঘরের ছিটকিনি দেয়া থাকত তবে ওরা বুঝতে পারত ঘরে লোক আছে। তালা ভেঙ্গে তবে ওরা ঘরে ঢুকত, আর জি.সি. দেব, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মতো আমারও সে রাতই শেষ রাত হতো এই সুন্দর পৃথিবীতে। স্মৃতিতে তাই আজ সেসব দিনের কথা ভেসে উঠলে মনে পড়ে স্বর্গীয় সহযোদ্ধাদের কথা। অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, তিনি এসিষ্ট্যান্ট হাউজ টিউটর ছিলেন? তাঁকে পাক সৈন্য গুলি করে। তবে আমি তাঁদের কারও মৃতদেহই দেখিনি। ডঃ জি, সি, দেবের এক পালিতা কন্য ছিল নাম রোকেয়া, পরে আমি তার মুখে শুনেছি ডঃ দেবের ঘরে যখন পাক বাহিনী ঢোকে তখন এক ক্যাপ্টেন ঢুকে প্রথমেই রোকেয়ার স্বামীকে সামনে পেয়ে গুলি করে বুকের মধ্যে। তারপর তারা ভিতরে গেল ডঃ দেব যেখানে ছিলেন সেখানে। তাঁকে সেখানেই তারা গুলি করে, পরে পায়ের মধ্যে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে জগন্নাথ হল মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে বাইরে ডেকে নিয়ে ওরা গুলি করে। গুলিটা তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে যায় ফলে তাঁর আর বেঁচে থাকা সম্ভব হলো না। হাসপাতালে চার দিনে মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি পাঞ্জা লড়ে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য এসব কথা তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে শোনা। তাঁকে যে জায়গায় কবর দেয়া হয়েছিল সে জায়গাটাও আমি দেখেছি। রাত্রে শব্দ পেয়েছি জগন্নাথ হলের মাঠে কবর খোঁড়ার। পেট পর্যন্ত হয়তবা বুক পর্যন্ত মাটি খুঁড়েছে, তারপর মৃতদেহগুলো সেই গর্তে ঠেলে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছে। ৫৬টি

মৃতদেহ গুনেছিলাম জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে। তার পরের দিন কবর দিয়ে ওরা চলে গেল। মৃতদেহ মাঠে নেই বটে কিন্তু অতোটুকু গর্তে এতোগুলো মৃতদেহের স্থান সঙ্কুলান হয়নি, ফলে কারও হাত, কারও পা, কারও বা কাপড়ের একটু অংশ জানান দিচ্ছিলোঃ "এই তোমরা দেখো, আমরা অনেকগুলো মানুষ একত্রে এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত।" কালীরঞ্জন শীলকে লাশের সংগে শুয়ে পড়তে দেখেছি। তারপর সুযোগ বুঝে যখন কোন লোকজন নেই চারিধারে কোথাও তখন উঠে পালিয়েও যেতে দেখেছি। নর্থ হাউজের ছাদের উপর কতগুলো ছাত্র লুকিয়েছিল। তাদের সেখান থেকে খুঁজে বের করে সারি দিয়ে গুলি করে। তাদের মধ্যে তখনও কয়েকজন জীবিত। লোকজন দিয়ে সমস্ত আহত এবং নিহত ছাত্রদের ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে এল মাঠে। তারপর তাদেরকেও গুলি করে। তাদের মধ্যে একজন দারোয়ান ছিল খুব লম্বা, প্রিয়লাল, তাকে গুলি করে প্রথমেই মারে।

ডঃ অজয় রায়
প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অজয় রায় ২৭শে মার্চ জগন্নাথ হলে এসেছিলেন। তিনি দেখেছেন বীভৎস দৃশ্য, গণসমাধি, নিহত বিকৃত লাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জগন্নাথ হলের চিত্র। তাঁর নিজের রচনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই অংশটি তৈরি করা হ.য়ছে।]

২৬শে মার্চ সারাদিন গুলিগোলা চলল। গৃহবন্দী সমগ্র ঢাকাবাসী। দূরে এস. এম. হল, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল থেকে কালো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু এত নিরাশার মধ্যেও আশার আলোর ঝলকানি বয়ে আনল 'আকাশ বাণী'। আকাশবাণী জানায় ঃ পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঢাকার আশেপাশে, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তিফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাও শোনাল একই বার্তা। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, আশ্বস্ত হলাম না, বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পরদিন ২৭শে মার্চ। কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ছুটে বেরিয়ে পড়লাম পরিচিতজনদের খোঁজে। আমি ২৭শে মার্চ সকালবেলা জগন্নাথ হলে ঢুকি। আমার এক সহকর্মী সঙ্গে ছিলেন। নাম রফিকুল্লাহ সাহেব। জগন্নাথ হলে দুই ট্রাক মিলিটারী দেখে আমরা বৃটিশ কাউন্সিলের ওখানে গিয়ে ঢুকলাম। সেখান থেকে ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। মিলিটারী চলে গেলে আবার আমরা জগন্নাথ হলে ঢুকলাম। জগন্নাথ হলের অবস্থা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এটা একটা বীভৎস দৃশ্য। কখনও যুদ্ধক্ষেত্র দেখি নাই, তবে এটা দেখে মনে হলো যে, যুদ্ধক্ষেত্র কাকে বলে তার একটা

পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রথমেই গেলাম জগন্নাথ হলে, আমার ছোট ভাইয়ের খবরের জন্য। সারা হল এলাকা জনশূন্য, হল-ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধযজ্ঞের সাক্ষ্য হিসেবে তখনও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়োনেটবিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী। নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। সামনে বিশাল মাঠের এক পাশে দেখলাম সদ্য খোদিত এক বিশাল গণসমাধি-অনেকেরই হাত-পা তখনও বেরিয়ে রয়েছে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে সন্তর্পণে উঠে এলাম উত্তর ভবনের দোতলায় ছোট ভাইয়ের কক্ষে। সারা ঘর বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত। কিন্তু মৃতদেহের কোন সন্ধান পেলাম না। বুঝতে কষ্ট হল না, অনেকের সাথে সেও ঐ গণকবরে শায়িত। এরপর আমি উত্তর দিকে গেলাম। সেখানে দক্ষিণ বাড়ির দারোয়ান মাখনের সাথে আমার প্রথম দেখা হল। একটা জীবিত মানুষ প্রথম আমি দেখলাম।

তারপরে আমি গোপাল বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক। তাঁর একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। সবাইকে খুঁজলাম। গোপাল বাবু আমাকে বললেন, "কি করবো?" আমি বললাম যে, "এখানে তো আর থাকা যাবে না। আপনি আমাদের টিচারদের পাড়াতে চলে যান।" আমাদের তখন ভাবনাই হয়নি যে ওখান থেকে আমাদেরও চলে যেতে হবে।

আমি দোতলায় উঠলাম। ঠিক দোতলার উঠবার মুখেই একটা ডেড-বডি দেখলাম। একেবারে বেয়োনেট দিয়ে মারা। সে দৃশ্য এখনও মনে আছে। ছেলেটি লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি ছিল। কিন্তু রক্তে কালো হয়ে গেছে তার পোশাক, আর রক্তের ধারাটা নিচে নেমে গেছে একটা বিরাট স্রোতের মত। এটি ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর মহাশয়ের দরজার সাথে লাগানো। ঘোষঠাকুরের বাসায় ওঠার আগেই ঘোষঠাকুর মহাশয়কে দেখা যাচ্ছিল। সাদা চেহারা কিন্তু বিবর্ণ। আমি ওখান থেকে বলার চেষ্টা করলাম যে, আপনারা কেমন আছেন। উনি এমন ধারণা ঈঙ্গিতে দিলেন যেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তিনি দরজা খুলে দিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরুচ্ছে না। মনে হচ্ছিল যে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, "আপনার জানামতে হলে কি রকম ছাত্র আছে?" উনি বললেন, "আমি তো গিয়ে দেখি নাই, গোপাল বাবুও হলে ঢোকেন নাই। আমি ঠিক জানি না। তবে আমাদের হলের ছেলেরা তো বেশির ভাগই প্রাইভেট টিউশনী করে, সেজন্য অনেক ছাত্রই ছিল।" আসলেই সেদিন জগন্নাথ হলে বেশি ছাত্র ছিল। আর একটা অসুবিধা হলো যদিও এর আগের দিন রাত ১১টায় নানা জায়গা থেকে হলে খবর পৌঁছে গেছে যে মিলিটারী আসবে, তবে হলের ছেলেরা ব্যাপারটা অতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। কারণ তারা মনে করেছে যে, হলে এলেও হয়তো সিরিয়াস কিছু হবে না। বেশি হলে কয়েকজন গ্রেপ্তার হতে পারে। এ কারণে ছাত্রদের অনেকেই হল ছেড়ে চলে যায়নি।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমি ডঃ দেবের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করি। পথেই হুদা সাহেবের বাসা। ওদের বাসায় গিয়ে স্যারের কাছে শুনলাম যে, বাসায় ঢুকে বাসার সব তছনছ করে ফেলেছে। সেখান হতে বেরিয়ে আমি শিববাড়ির দিকে গেলাম। সেখানে যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়। ওখানে আট/দশ জন লোক দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম যে, আর সকল কোথায়। কেউ বলল, "সব পালিয়েছে।" আবার বলল, "কিছু কিছু আছে, আর সব মারা গেছে।" আমি ওখানে গিয়েছিলাম দু'টি কারণে। ডঃ দেবের আর গুহঠাকুরতার খবর নেবো। জিজ্ঞেস করায় ওরা উত্তর দিল যে, সকলকে মেরে ফেলেছে। আবার কেউ বলল যে, সবাই পালিয়ে গেছে। এখান থেকে সঠিক খবর পেলাম না। ডঃ দেবের কথা বলল যে, ওদের সকলকে মেরে ফেলেছে। তারপর ডঃ দেবের বাসায় গিয়ে দেখলাম যে, সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলেছে। জায়গায় জায়গায় গুলির দাগ। বুঝতে পারলাম যে বাসায় ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ঢুকেছে। দরজায় যে লাথি মেরেছে, সেখানে বুটের ছাপগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। সেখান থেকে আমি ডঃ মফিজুল্লাহ কবির সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখলাম যে, তিনি চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আবার পথে বের হলাম। পথে হাঁটতে হাঁটতে একজনের সাথে দেখা। সে বলল যে, ইন্নাস আলী সাহেব আহত হয়েছেন। উনার বাসায় গিয়ে দেখলাম কেউ নেই, বাসার চাকরকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল সবাই হলিক্রস হাসপাতালে গেছে।

আব্দুল বারী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল
অফিসের কর্মচারী।

[আব্দুল বারী গণহত্যার পরবর্তী অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তিনি খোঁজ করেছেন জগন্নাথ হলের ছাত্র হরিধন দাসকে। তার বর্ণনায় গণহত্যার পর জগন্নাথ হলের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কেবল মর্মান্তিকই নয়, বিভীষিকাময়ও।]

আমাদের বাড়ির পাশের একটি ছেলে থাকত জগন্নাথ হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। নাম হরিধন দাস, পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি তার রুমে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতাম। ২৬ তারিখ শুনলাম মিলিটারী গোলাগুলি করে সমস্ত হল ভেঙ্গে ফেলেছে। এর আগে আমি তাকে বলেছি, চল আমরা বাড়ি যাই। সে বলল, আমি এখন যেতে পারব না, আমি থাকব। আমি তাকে রেখেই বাড়িতে চলে গেলাম। তার বাবা-মা আমার কাছে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল-আর তো ঢাকায় যেতে কাউকে পেলাম না, আপনাকেই যেতে হবে। তখন আমি বললাম-ঠিক আছে, আমি যাব। আমি তখন ২৩ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হই। ফুলবাড়িয়া এসে যখন পৌঁছি তখন দেখি অবস্থা বেশি ভাল নয়। আমি এসে জগন্নাথ হলে ঢুকলাম, ঢুকে দেখি চারদিকে শুধু মরা মানুষ। নর্দমার মধ্যে মানুষ পড়ে আছে, কুকুর-গরু মরে আছে। এসব দেখে ভাবলাম, যাকে খুঁজতে এসেছি তার অবস্থা না জানি কি!
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, তাঁর বাসায় আগে আসতাম। আমার এক ক্লাসমেইট ছিল সুধীর কুমার চক্রবর্তী। সন্তোষ ভট্টাচার্য ইতিহাসের শিক্ষক আমার ক্লাসমেইট সুধীর চক্রবর্তীর ক্লাস মেইট। তিনি ছিলেন জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষক। এই হিসেবে আমি তাঁর রুমে আসতাম। এই ভদ্রলোকের রুমে বসে গল্প করতাম, এই সময় ছোট একটা বাচ্চা তাঁর রুমে

কাজ করত, বাচ্চার নামটা আমার মনে নেই। যখন হেঁটে আসছি মেডিক্যালের কাছে এসে দেখি একটা আম গাছ, সেই গাছের একটা মাত্র ডাল আর কোন ডাল নেই। দেখি ঐ ছোট বাচ্চাটা আম গাছে ঝুলছে। বাচ্চাটা আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল। সে আমাকে চিনতে পেরেছে। কেঁদে কেঁদেই বলল–বাবুকে মেরে ফেলেছে। তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তার কাছে বাড়ি যাওয়ার কোন টাকা–পয়সা নেই। আমার কাছে দুই টাকা ছিল। তার থেকে একটা ভাঙ্গিয়ে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা করে দিলাম। বললাম–তুই যেভাবে পারিস খেয়ে বাড়িতে যা। তারপর আমি এ্যাসেম্বলির গেট দিয়ে জ্যোতির্ময় বাবুর বাসায় গেলাম। দেখলাম তিনি যে লুঙ্গিটা পরতেন সে লুঙ্গিটা ছেঁড়া, পড়ে আছে। তাঁদের রুমে ঢুকে দেখি রুমের জানালা–কপাট খোলা, কোন লোকজন নেই। সেখান থেকে আমি গেলাম উত্তর বাড়িতে। পুকুরের ঐ কোনার রুমটায় থাকত হরিধন। রুমের জানালায় গিয়ে দেখি যে রক্ত পিছনের দিক দিয়ে নিচে পড়েছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম, কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি একটা লোক পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সে যে কে তা বোঝার কোন উপায় নাই। তারপর হরিধনের রুমে এসে ঢুকি দেখি সে রুমের ভিতর রক্ত এবং চারদিকে রক্ত। তখন বাঁ হাত দিয়ে রক্তগুলো দেখলাম যে হয়তো কাল অথবা আজকের কোন ঘটনা কিনা। পুকুরের ঘাটের কাছে একটা লোককে মরা অবস্থায় দেখলাম। কাছে যেয়ে চিনতে পারলাম, সে ছিল এখানকার দারোয়ান। তারপর যে দৃশ্য দেখলাম তা বর্ণনা করা কঠিন। মাঠের মধ্যে দেখলাম গণকবর। এই গণকবরের মধ্যে দেখলাম পাগুলো উপরে এবং মাথা নিচে রয়েছে, কোন কোন লোকের হাত দেখা যায়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় বহুকিছু দেখলাম। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সেখান থেকে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। আমি যখন হলের ভিতর আসি তখন একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিলাম। তখনও দেখি হলের মধ্যে চারদিকে লেপ–তোষক পুড়ছে। এই বিশ্রী গন্ধের কারণে আমি বাড়িতে গিয়ে বমি করলাম। এখান থেকে বের হয়ে গেলাম এস.এম. হলের মধ্যে, সেখানে যেয়ে কোন লোককে দেখতে পেলাম না। তারপর আমি ভাবলাম হরিধনের কথা, সে মরল না বাঁচল– তার মা–বাবার কাছে কি জবাব দেবো! এরপর গেলাম মেডিক্যালের দিকে। মেডিক্যালের দিকে যাওয়ার পথে শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখা হল এক হিন্দু ভদ্রলোকের সাথে। সে এখনও রেডিওতে গীতা পাঠ করে। এই ভদ্রলোকের কাছে কোন টাকা–পয়সা নেই, সে কি করে বাড়ি যাবে চিন্তা করছে। সে এই জগন্নাথ হলেরই ছাত্র। এই ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ছাত্রদের কোন খবর সে জানে কিনা, কিংবা হরিধনকে দেখেছে কিনা। সে বলল, কতকগুলো লোক মেডিক্যালে ভর্তি রয়েছে সেখানে যেয়ে দেখতে পারেন। এই ভদ্রলোককে মেডিক্যালের সামনে দাঁড় করিয়ে আমি মেডিক্যালের ভিতর ঢুকলাম। মেডিক্যালের দোতলায় যাওয়ার পর দেখা হলো মেডিক্যালের একজন ডাক্তার ছাত্রের সাথে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম হরিধনের কথা। সে বলল এখানে কিছু লোক ভর্তি আছে, একটু খুঁজে দেখেন পান কিনা। ১৯ নম্বর না যেন কত নম্বর ওয়ার্ডে যেয়ে পেলাম হরিধনকে। তাকে ডাক দিলাম, সে 'দাদা' বলে কেঁদে ফেলল। তখন আমি ভাবলাম তাকে কিভাবে নিয়ে যাই। সে বলল "আমি যেতে পারব না। এখানে চিকিৎসায় আছি। বাড়িতে যেয়ে মাকে এসব বলবেন না। তাদের কাছে বলবেন আমি ভাল আছি। তারা যেন ঢাকা না আসেন।" আমিই তারপর মাঝে মাঝে ঢাকা এসে তাকে দেখাশুনা করতাম।

মাহমুদ হাসান
প্রাক্তন সভাপতি,
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

[২৮শে মার্চ তিনি ছুটে এসেছিলেন ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে। জগন্নাথ হলের নারকীয় ঘটনা পত্যক্ষ করে তিনি মুহ্যমান হয়ে যান। তাঁর সাক্ষাৎকার ঢাকা শহরের সার্বিক অবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবলমাত্র জগন্নাথ হলের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ায় তার সাক্ষাৎকারের সংশ্লিষ্ট অংশই তুলে দেয়া হলো।]

২৬শে মার্চ কারফিউ তুলে নেয়া হলো আড়াই ঘন্টার জন্যে। আমার গাড়ি ছিল, আর একটি মটর সাইকেলও ছিল। আমি বুদ্ধি করে আমার সাইকেল নিয়ে আমার ছোট ভাইকে সাথে করে বেরিয়ে পড়ি দেখার জন্য। জগন্নাথ হল পর্যন্ত পৌছতে আমার কষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যারিকেড এড়িয়ে মটর সাইকেল কোন জায়গায় উঁচু করে নিয়ে, কোন জায়গায় চালিয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখলাম থমথমে ভাব। আমার ভীষণ ভয় লাগল। লোকজনও কম, দু'একজন দেখা যায়। সবাই তো পালিয়ে গেছে। কেউ বাসার মধ্যে থাকলেও শব্দ নাই। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তা হৃদয়বিদারক। জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টের বাসার সামনে যে মাঠটা সেই মাঠের মধ্যে দেখলাম এক দৃশ্য। মনে হয় নতুন করে মাটি উঠানো হয়েছে। মানুষ চাপা দেয়ার দৃশ্যটা আমাকে খুব বেশি মর্মাহত করেছে। মনে হলো এলোপাতাড়ি মাটিচাপা দেয়াতে কারো হাতের কব্জি পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। কারো হাঁটু দেখা যাচ্ছে। কারো চুল, মাথার কপাল ও কারো নাক দেখা যাচ্ছে। ঠিক এইভাবে ওরা মাটিচাপা দিয়ে চলে গেছে। অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আমি এটা দেখলাম। আমার মনে হয় আধা ঘন্টার মত সময় পার হয়ে গেছে। আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা। এইভাবে এই অত্যাচার! তারপর সেখান থেকে আমি চলে যাই।

গোপাল চন্দ্র দে
বয়স–৪৫
কর্মচারী, প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[গোপাল চন্দ্র দে তখন ছিলেন ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার গাড়ির ড্রাইভার। ২৫শে মার্চ তিনি ছিলেন বর্তমান শহীদ মিনারের উত্তরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাসভবন এলাকায়। সেখান হতে গোপাল চন্দ্র দে গণহত্যার নৃশংস ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। গোপাল চন্দ্র দে বর্ণিত পাক–বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ মর্মস্পর্শী। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার শেষ পরিণতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় গোপাল চন্দ্র দে'র বর্ণনায়।]

২৫শে মার্চ রাতে আমি ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসায় কর্মরত ছিলাম। এ সময় হল প্রায় খালিই ছিল। এই সময় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং হয়েছিল এবং আমাদের কর্মচারীদেরও এই ট্রেনিং নিতে হয়েছে। এ সমস্ত ট্রেনিং আমাদের জগন্নাথ হল মাঠেই হয়েছিল। আমি ঐদিন ট্রেনিং নিতে যাইনি। বিহারীদা অর্থাৎ রবির বাবা গিয়েছিলেন। আমার ঐদিন বাসায় কাজ থাকায় যাইনি। রাত যখন অনুমান বারোটা তখনই দেখলাম যে, রাস্তায় লোকজন বড় বড় গাছ এবং ইট–পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে গাড়ি চলাচল করতে না পারে। আমি এবং স্যার (ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা– সম্পাদক) এগুলো দেখছি। এতে আমাদের হলের প্রায় ১০/১৫ জন ছাত্র ছিল। তারা রাস্তার উপরে একটা বটগাছ ছিল তা কেটে ফেলেছে এবং রাস্তায় ফেলে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে। এগুলো দেখে স্যার ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং হলের গেটে এসে সমস্ত দারোয়ানদের সাবধানে থাকার নির্দেশ দিলেন। বর্তমানে জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ৫২ নং টিচারস কোয়ার্টারে তখন ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ চলছিল। স্যার থাকতেন এই ৫২ নং কোয়ার্টারের একতলায়। স্যার আমাকে বললেন তাদের কোয়ার্টারের মেইন গেটে একটা তালা লাগাতে। তখনই তালা দিয়ে দিলাম। আমি তখন স্যারের বাসায় থাকতাম এবং স্যারের গাড়ির ড্রাইভার ছিলাম। গেটে তালা দেয়া হলে আমি স্যারের অনুমতি নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ি। স্যারের বাসায় তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে ছিল। কাজের জন্য একটা মেয়েলোক ছিল, সে এখনও আছে। আমি যে রুমে থাকতাম তার পাশের রুমে ২/৩ জন লোক ছিল। রাত তখন অনুমান ২/৩টা বাজে, হঠাৎ শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, উঠে দেখি সমস্ত বাংলো মিলিটারীরা ঘিরে ফেলেছে। আমার পাশের রুমে একটা ছেলে ছিল বাংলা একাডেমীর। আমি তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "এ অবস্থায় কি করি"? সে তখন বলল যে ঃ "ঘুমিয়ে পড়, আর কি করার আছে।" তখন আমি আবার গিয়ে শুয়ে পড়ি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই

সে আমাকে তন্দ্রালু অবস্থা থেকে ডেকে উঠিয়ে বলল–"মিলিটারী এসে গেছে"। আমি তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম মিলিটারী রাস্তার কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে। স্যারের ঘরে গিয়ে দেখলাম স্যারের স্ত্রী এবং মেয়ে খুব তাড়াহুড়া করছেন কি করবেন। চারদিকে খুব শব্দ হচ্ছে, বিল্ডিং–এর বহুজনকে মেরেছে। আমি পাশের বিল্ডিং–এ গিয়ে বললাম ঃ "খোল খোল।" তাঁরা খুলে দিলেন। কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, তিনতলার ৪/৫ জনকে রুমেই মেরেছে। কোন্ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন জানি না। মনিরুজ্জামান সাহেবকেও মেরেছে, তার ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। আমি উপর থেকে দেখছি মিলিটারীরা স্যারের বাসার দরজায় লাথি মারছে এবং দরজা খোলার জন্য বলছে। পিছনে একটা বটগাছ ছিল সেখান দিয়ে একটা মিলিটারী ঘরের মধ্যে ঢুকছে। এমন সময় কাজের মেয়ে লোকটা (নাম 'স্বর্ণ') এসে আমাকে বলল যে ঃ "আমাকে একটু জল দে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "কি হয়েছে?" স্বর্ণ বলল ঃ "বাবুকে মেরে ফেলেছে।" আসলে ও তখন হতাশ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে, মিলিটারী ঘরে ঢোকার সময় ওর গায়ে ধাক্কা লেগেছে, ও দেখে নাই যে বাবুকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত স্বর্ণ বলছে যে ঃ "বাবুকে মেরে ফেলেছে, তুই আমাকে জল দে, খাব।" এর ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম গাড়ি ভর্তি সৈন্য ঘিরে ফেলেছে সমস্ত এলাকা এবং সমস্ত বাসায় বাসায় খুঁজে বের করছে সবাইকে। আমি স্যারের ঘরে যাবার সাথে সাথে স্যারের স্ত্রী আমাকে বললেন ঃ "তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমাকে দেখলে ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" তখন দিদিমণি বললেন ঃ "তোমার স্যারকে তো ধরে নিয়ে গেছে, এখন এই রাত্রে আর কি করব, দেখি কালকে কি করা যায়। তুমি এখান থেকে চলে যাও। তিনতলার লোকজনদের মেডিক্যালে পাঠাতে টেলিফোনে এ্যাম্বুলেন্সের কথা বলব, কিন্তু লাইন পাচ্ছি না।" স্যারের স্ত্রী বুঝতে পারেন নাই যে লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন এ্যাম্বুলেন্স এনে আহতদের সবাইকে হাসপাতালে পাঠাবেন। আমি বললাম যে সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। স্যারের স্ত্রী আমার দিদিমণি বললেন ঃ "তুমি গিয়ে স্বর্ণকে পাঠিয়ে দাও।" আমি উপরে গিয়ে স্বর্ণকে বললাম ঃ "দিদিমণি তোমাকে ডাকছে, তুমি নিচে যাও।" স্বর্ণ নিচে দিদিমণির কাছে গেল। আমি তখন এই কোয়ার্টারের পিছনে একটা পুকুর ছিল সেই পুকুরের পাড়ে গিয়ে চিন্তা করছি–কি হল? কি করব? ইত্যাদি। এইভাবে পুকুর পাড় দিয়ে ঘরের দিকে গেছি এবং তখন আমার সাথের যে লোকটি ছিল তাকে আর দেখিনি। তখন লক্ষ্য করলাম যে সে মেডিক্যালের রাস্তায় আর্মি ছিল না দেখেই লুঙ্গি পরা অবস্থায়ই রাস্তা পার হয়ে বাইরে চলে গেছে। আর্মি তখনও ঐ রাস্তায় যায়নি, এই সুযোগে লুঙ্গিটাকে কাঁছা বেঁধে এক দৌড়ে সে মেডিক্যালের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আমি তখনও একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি প্রায় ১০/১৫ মিনিট, আর একটা তামাশা দেখছি যে আগুনের গোলাগুলি সবই আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। এমন সময় দিদিমণি আমাকে ডাকলেন ঃ "গোপাল তাড়াতাড়ি আস, বাবুকে রেখে গেছে।" আমি যাবার পরে শুনলাম যে বাবুকে গুলি করে রেখে গেছে ঘরের পিছনে। প্রফেসর রাজ্জাক এসে বলেছেন। দিদিমণি জানতেন না এই কথা। রাজ্জাক স্যারও এই কোয়ার্টারেই

থাকতেন, তিনি দেখে এসে দিদিমণিকে বলেছেন যে স্যারকে গুলি করে রেখে গেছে কোয়ার্টারের পিছনে। আমি, স্যারের মেয়ে দোলা সবাই গিয়ে দেখি যে স্যার পড়ে আছেন, তখনও তাঁর জ্ঞান ছিল। দেখলাম যে দুটো গুলি লেগেছে এবং ভারী মানুষ পড়ে আছেন। আমরা যাবার পর স্যার তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ "বাসন্তী, তোমাকে ডাকলাম এতক্ষণ শোননি?" দিদিমণি বললেন ঃ "আমাকে ডেকেছো শুনিনি। চারদিকে গুলির শব্দে কিছু শোনা যায় না।" আমরা সকলে ধরাধরি করে আনতে চেষ্টা করলাম স্যারকে, কিন্তু ভীষণ ভারী মানুষ এবং গা ছেড়ে দিয়েছেন তাই আনতে পারছিলাম না। বর্তমানে ৩৪ নং কোয়ার্টারের ঠিক সামনেই স্যারকে গুলি করে ফেলে রেখেছিলো ওরা। আমরা ওনাকে বাসায় আনার জন্য একখানা খাট নিয়ে গেলাম, কিন্তু তাতেও উঠাতে পারি না। এইভাবে আমি যখন বাইরে গিয়েছি তখন দেখেছি মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তার ভাইকে গুলি করে মেরে গিয়েছে, বাচ্চাগুলি কান্নাকাটি করছে। রক্তে সমস্ত মোজাইক করা বাইরের জায়গাটুকু লাল হয়ে গেছে। সিঁড়ির কাছে একটা ছেলে গুলি খেয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে তখনও, 'পানি' 'পানি' করছে। আমাদের এই অবস্থাতেও দিদিমণি বললেন ঃ "স্বর্ণ! একটু পানি দাওতো ওকে।" স্বর্ণ পানি এনে দিলে পরে মারা গেল ছেলেটা। স্যারকে খাটেও যখন আনতে পারলাম না তখন বহু কষ্টে হাঁটাহাঁটি করে ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম। দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মাথা ঠিক আছে তোমার?" তখন স্যার বললেন ঃ "মাথা ঠিক আছে, ডাক্তার ডাক।" ডাক্তার পাবে কোথায়, গুলি চলছে সমানে চারদিকে। স্যারের গলা হতে গুলিটা বের হয়ে গিয়েছিল কিনা আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি। গুলিটা আসলে ছিল, বের হয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় দেখলাম যে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার না পেয়ে ঘরের ফ্রিজ থেকে বরফ এনে দিতে থাকলাম। কিন্তু গুলিটা কেউ লক্ষ্য করিনি। স্যারের পাজামা-পাঞ্জাবী খুলে দিলাম, সে রাতটা তো গেল। এরপর স্যার এবং দিদিমণি আমাকে বললেন যে ঃ "গোপাল, তুমি থেক না এখানে, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে, তুমি সরে যাও।" আমি তখন ঐ পুকুর পাড়ে আমগাছের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে কোথায় যাব। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ। আমি আর কোথাও যাইনি। পরের দিন সকাল ৭/৮ টার দিকে এসে দেখি যে স্যারের জ্ঞান আছে। দিদিমণি বললেন, "দেখ ডাক্তার ডাকা যায় কিনা।" আমি তখনও বলছি-"গুলি চলছে, কোথায় বের হব ডাক্তার আনতে"? তখন স্বর্ণ কাঁদছে, আমাকে বললো, 'আবার মিলিটারী আসছে।' আমি বাথরুমে যেয়ে লুকিয়ে থাকলাম। মিলিটারী আবার এলো চেক করতে। ৫/৭ জন মিলিটারী এলো, সাথে আমাদের জগন্নাথ হলের কে যেন ছিল তা আমি ঠিক করতে পারিনি। কারও পরনে লুঙ্গি, পাজামা, শার্ট ইত্যাদি। ওদের নিয়ে চারতলায় গেল, লাশ টানার জন্য ওদের নিয়ে এসেছে। আমি তখন আরও ভয় পেয়ে গেলাম, দিদিমণিকে বললাম বাইরে বের করে দেয়ার জন্য। আমি আবার বাইরে গিয়ে পুকুর পাড়ে ঐ আমগাছ তলায় চুপ করে বসে থাকলাম। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, চারদিক ঘেরাও করা। প্রায় ১২টার দিকে দেখলাম শহীদ মিনারে ডিনামাইট ফিট করছে এবং উড়িয়ে দেবে শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের পাশে কাঁচের ঘরগুলিতে যে লোকজন ছিল তাদেরকেও তারা মেরে ফেললো, সম্ভবত ৩/৪ জনকে। তবে তাদের মধ্যে একজন,

মিলিটারী যখন লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছে এবং ভেঙ্গে ফেলার সাথে সাথে, এমন জোরে দৌড় দিল এবং দৌড়ে আমাদের কাছে পুকুর পাড়ে এসে চুপচাপ বসে পড়লো, কোন নড়াচড়া নেই। আমি যখন দেখলাম শহীদ মিনারে ওদেরকে মারল তখন ভাবলাম যে, আমাদেরও রক্ষা নেই, মেরে ফেলবেই আমাদেরও। এর মধ্যেই বিকট আওয়াজে শহীদ মিনার ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে গেল। আমি তখন দেখলাম যে আমরা যেখানে লুকিয়ে আছি ঠিক তার ২০/৩০ হাত দূরে একজনের হাতে গুলির বাক্স আর অপর জনের হাতে মেশিনগান। তখন পুকুরের মধ্যে কোন জল না থাকায় পুকুরের মধ্যে ওদের চোখ এড়িয়ে নেমে সেখানে মরার মত শুয়ে থাকলাম আমরা তিনজন। দারোয়ান, আমি এবং শহীদ মিনার থেকে পালিয়ে আসা লোকটা। সেখান দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ঐ গুলির বাক্স হাতে মিলিটারী বলল ঃ "চল চল ইধার কৈ নেহি হ্যায়।" ঐ পুকুরের মধ্যেই থাকলাম। একরাত্র কোন খাবার নেই এবং খাবার জলও ছিল না আমাদের। কি করব, ভয়ে সব কোথায় যে গিয়েছিল তা জানি না। আমরা তিনজন যুক্তি করলাম সমস্ত রাত্র কি করা যায়, এভাবে সেই রাত্র শেষ হয়ে গেল। তারপর ২৭শে মার্চ সকাল ৮টা বা ৯টার সময় সবাই চলে এসেছে, কারণ কারফিউ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। আমরা কোন খবরাদি পাইনি, হয়ত রেডিওতে ঘোষণা হয়েছিল বলেই লোকজন দেখা গেল। আমি দেখলাম কিছু লোক আসল বাসায়, তখন আমিও উঠে বাসায় গেলাম। কোথা থেকে লোকজন আসল তা বলতে পারবো না, স্যারকে নিয়ে গেল মেডিক্যালে। মেডিক্যালের ডাক্তাররা বলল যে, "আমাদের এখানে কোন খাবার এবং জল সরবরাহ করতে পারবো না। যদি পারেন তো কিছু খাবার নিয়ে আসবেন।" বাসা থেকে আমরা কিছু চাল-ডাল মেডিক্যালে ডাক্তারদের কাছে পৌঁছে দিলাম। এরপর ঠিক দু'ঘন্টা পরে সমস্ত ডেডবডি আসতে লাগলো যে তা দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। কারও হয়ত চোখ নেই, কান নেই বা কারও মুখ নেই- একেবারে বীভৎস দৃশ্য মেডিক্যালে। ঠেলাগাড়ি, রিকশা, ভ্যানগাড়ি যে যেভাবে পারে নিয়ে এসেছে মেডিক্যালে। আমি তখন মানুষের এই বীভৎস রূপ দেখে দিশেহারা, বললাম ঃ "আমি আর টিকতে পারছি না, চলে যাব।" স্যারকে সর্বদাই আমি বাবু বলতাম। বাবু আমাকে বললেন ঃ "গোপাল তুমি আমাকে ফেলে যেও না।" আমি দেখলাম বাবু কখনও কথা বলছেন। আমি বললাম ঃ "আমি আপনাকে ফেলে যাব না ঠিকই, কিন্তু আমি আর টিকতে পারছি না বাবু। আমি আজ এখানে থাকতে পারবো না।" আমি তখন মাত্র পাঁচটা টাকা পকেটে নিয়ে অর্থাৎ আমার পকেটে যা ছিল তা নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম, গেন্ডারিয়া যাব। এই ভাবতে ভাবতে তাঁতীবাজার পৌঁছলাম এবং দেখলাম লোকজন ছুটছে তো ছুটছেই গ্রামের দিকে। গেন্ডারিয়া স্কুলে পৌঁছলাম এবং দারোয়ানকে বললাম আমি আজ রাত্রে এখানে থাকব। দারোয়ান বলল ঃ "সাধনা ঔষধালয়ের ফ্যাক্টরীটার এখানে বোম্বিং হতে পারে, তুমি থাকতে পারবে?" আমি তখন আরেকটা বাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার মত ১০/১২ জন ছেলে হাতে রাইফেল, দা, বন্দুক, ছোরা নিয়ে ঐ খালি বাড়িটায় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিচ্ছে। একে অপরে কিভাবে আক্রমণ চালাবে তার পরিকল্পনা করছে। আমার তখন আরও ভয় করতে লাগল। ভাবলাম আমি ঘুমিয়ে

লাগল। ভাবলাম আমি ঘুমিয়ে থাকলে ওরা একটা গুলি করে পালিয়ে যাবে, তারপর আমার মরণ হবে আর কি! ২৭ তারিখ, রাত যখন বারোটা বাজে তখন ওরা গুলি করছে একে একে শুধু শুধু। রাত্রে আর কোথায় যাই, থাকলাম সেখানেই। কিন্তু পরের দিন বিকেল বেলা কি করব? ঠিক করলাম দিদিমণির বাবার বাড়ি ফতুল্লা, ওখানেই যাব। ঠিক চারটার সময় রওয়ানা হলাম। গেন্ডারিয়া স্টেশনের কাছে সব ই.পি.আর. এবং রাজারবাগের পুলিশ হাতে অস্ত্র নেই, ছুটছে। এ দেখে লোকজন আরও ভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। নিরস্ত্র ই.পি.আর. এবং পুলিশরা বলছে ঃ "আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা পালিয়ে এসেছি, আরও গণ্ডগোল হবে। আপনারা যে যেখানে নিরাপদ বোঝেন, শহর ছেড়ে চলে যান।" এইভাবে ছুটতে ছুটতে ফতুল্লা গিয়ে পৌঁছলাম। স্যারের শ্বশুর বাড়ি পৌঁছানোর সাথে সাথে মাসীমা আমাকে বললেন ঃ "তুমি এখানে আসলে কেন? আদমজী তো কাছেই, এখানেও গোলাগুলি হচ্ছে, কেউই বাঁচব না।" রাতটা ওখানেই কাটালাম। স্যারের খবর আর কাউকে বললাম না। বুড়োবুড়িরা কান্নাকাটি করবে, তাই জোয়ান লোকদের কাছে বললাম এবং ওনারা বারণ করলেন। ২৮ তারিখ সকাল বেলা রওয়ানা হলাম ঢাকার দিকে। গেন্ডারিয়া স্কুলে এসে একজন স্যারের সাথে দেখা হলে তিনি বললেন ঃ "গোপাল, তুমি তোমার নামটা পরিবর্তন করে অন্য নাম অর্থাৎ মুসলমানী নাম রাখ।" মুসলমান স্যার একজন আমাকে এই বুদ্ধি দিল, তখন আমি বুঝতে পারলাম না। হাঁটতে হাঁটতে নবাবপুর দিয়ে মেডিক্যালে গেলাম। সেখানে একজন পরিচিত ডাক্তার, নাম আবদুল ওয়াহেদ, আমাকে বললেন ঃ "তুমি আজ আর কোথাও যেও না, এখানেই থেকে যাও।" উনি মনে হয় বাবুর অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বাবুকে দোতলায় রাখা হয়েছিল। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আজকে আমাকে এখানে থাকতে হবে?" ডাক্তার ওয়াহেদ বললেন ঃ "হ্যাঁ থাক।" রাতে সমস্ত লাইটগুলো ডিম করে রাখা হত, ডাক্তার থাকতেন না ওয়ার্ডে। রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সাথে সাথে গুলির আওয়াজও হচ্ছিল। দু'জন নার্স এসে বললেন ঃ "আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন।" বাবুকে কোন কেবিনে রাখা হয়নি, জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। নার্স দু'জন সাবধানে থাকতে বলায় আমরা জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ই.পি.আর. এবং পাকিস্তানী মিলিটারীর সাথে গোলাগুলি হয়েছে। হাসপাতালে ই.পি. আরেরা মার খেয়ে আসছে, হয়ত হাসপাতাল চেক হতে পারে। ভয় পেয়ে গেলাম। যাবার কোন পথ নেই, কি করব, থাকলাম হাসপাতালেই। পরের দিন সকাল ৮টার সময় দেখলাম যে বাবুর গায়ে কয়েক দিন ধরে ভীষণ জ্বর ছিল তা নেমেছে। হাসপাতালে আসার পর ঐ দিনই জ্বরটা একটু নেমেছে। মুখ নেড়ে কথা বলত, তা একটু কমে এসেছে। গা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কথা বলছিলো কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে গেল। কিছু খেতে পারত না; খাওয়াও অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি দিদিমণি ও দোলাকে ডাকলাম। কাজের লোক স্বর্ণ, ধীরেনদা কাছে ছিল। ডাক্তার টি. হোসেন ও আরও অনেক ডাক্তার ছিল কাছেই। ঠিক হাঁ করে মুখ দিয়ে দমটা যেন বের হয়ে গেল, আর সাথে সাথেই সবাই ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। তখন দিদিমণি কান্না সংবরণ করে বললেন একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য। ডেথ

সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেলো, কিন্তু সব ডাক্তার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন সই করতে। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলাম এখন ডেডবডি কোথায় নেয়া হবে। পোস্তগোলা নেয়াও বিপদ। এরই মধ্যে ৩/৪ টা মিলিটারী আসলো এবং বললো হাসপাতাল চেক করা হবে। গত রাতে ই.পি.আর. এবং মিলিটারী সংঘর্ষে ই.পি.আর. যারা আহত হয়ে মেডিক্যালে আছে তাদের খুঁজে বের করা হবে। তখন হাসপাতালে একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। সবাই ভালো হয়ে গেছে। হাসপাতালের বেড থেকে কানা, খোঁড়া সবাই উঠে পালিয়ে যাচ্ছে, কেউই আর অসুস্থ নেই এমন অবস্থা। এর মধ্যে শুনলাম ডেডবডি এবং ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া হবে না। তখন আমরা আর কি করব! ডাক্তার টি. হোসেনের সাথে দিদিমণির জানাশোনা ছিল বিধায় তিনি এ্যাম্বুলেন্সে করে আমাকে, দিদিমণি, দোলা এবং স্বর্ণকে নিয়ে গেলেন। ডেডবডি রয়ে গেল, ডেডবডি নিতে পারিনি। আমরা টি. হোসেনের বাসায় ছিলাম রাত্রে। মন ভাল লাগছে না। দিদিমণি এবং দোলা গেল ওয়াহেদ ডাক্তারের বাসায়। তাঁর একটা প্রাইভেট ক্লিনিক ছিল, আমরা ওখানেই ছিলাম। উনি আমাকে বললেন ঃ "কোন চিন্তা করো না, আমার একটা গাড়ি চালাবে আর আমার কাছে থাকবে।" সকালে দিদিমণি আমাকে বললেন ঃ "মনটা মানে না গোপাল, তুমি গিয়ে একটু ডেডবডিটা দেখে আসবে কি অবস্থায় আছে?" হাসপাতালে এসে কে যেন একজন বিশ্বাস ডাক্তার ছিলেন তাকে বললাম যে স্যারের ডেডবডি নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছিলাম। তিনি বললেন, "ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয় নাই, পোস্টমর্টেম করা হয় নাই, তুমি ২/৩ দিন পরে আস।" তিন দিন পরে ডাক্তার বললেন ঃ "দেখ তুমি আর এখানে এসো না, ডেডবডি পাবে না, তাতে তোমার অসুবিধা হতে পারে। তাই বলি যে তুমি আর এখানে এসো না।" ডেডবডি পাইনি, পোড়ানও হয়নি, ডেথ সার্টিফিকেটও পাইনি। তবে স্বাধীনতার পরে ডেথ সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। পরে শুনেছি যে অন্যান্য ডেডবডি আঞ্জুমানের গাড়িতে করে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু জগন্নাথ হলের চিৎবল্লীসহ আরও অনেকেই বলছিল যে স্যারের লাশ পোস্টমর্টেমের ঘরের পাশে একটা গর্ত করে তার মধ্যে রেখেছিল। হাসপাতালের ডোমরা বলছিল যে এতগুলো ডেডবডির মধ্যে একটা মাত্র ডেডবডির কিছু হচ্ছে না দেখে ওদের ভীষণ দুঃখ লাগছিল, তাই আর কি করার। মোটামুটিভাবে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে পোস্টমর্টেমের ঘরের পাশে একটা গর্তে। চান্দুর সাথে বাবুর একটা ভাল সম্পর্ক ছিল ফুলের বাগান করার জন্য। বাবু ভীষণ ফুল ভালবাসতেন। বাবু মারা যাবার পর দিদিমণি বলেছিলেন ঃ "আর কিছুই তো করার নেই, শুধু ভালবাসতো ফুল, তাই কয়েকটি ফুল দিয়ে দাও সাথে করে।" দোলা তাই কয়েকটা ফুল এনে বাবুর বুকের উপর রেখে দিয়েছিল।

প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

Night of Horror in Dacca's Jagannath Hall

When the barbarous hordes of President Yahya Khan launched a sneaking attack on sleeping and unsuspicious populaces of Dacca at midnight of March 25, it caught them unawares. They did not expect it and they were not prepared for it, writes Mr. Banoj Kumar Chakraborty, Assistant Editor, Pakistan Observer, Dacca.

Mr. Chakraborty further states :

Instead of the announcement which Yahya Khan was supposed to make that night accepting Sheikh Mujib's demand for the transfer of power to the elected representation of the people, the announcement for which the people were eagerly waiting, the Director secretly slipped out of Dacca in the darkness of night leaving orders for Tikka Khan to let loose a reign of terror in East Bengal and set such examples of wholesale killing, looting, raping and burning as would forever acts as deterrents for the Bengalis to raise their voice against West Pakistani domination and injustice. A faithful Lieutenant as he is, Tikka Khan carried out the job thoroughly and neatly.

Though the attack was sudden and unprovo-ked, subsequent events proved that it was planned by the Pak Army well in advance and planned with meticulous care. As a leverage for this sinister action Yahya Khan popped up the charge that the Awami League in collusion with the Hindus was planning to launch an armed attack on the night of March 25 to separate East Bengal from Pakistan. This totally fictitious charge of Hindu-Awami League collusion gave

the Pak Army the necessary excuse to exterminate the Hindus from East Bengal.

And Jagannath Hall of Dacca University, being the residence of the minority students of the University, became easily one of the main targets of the Pak Army's barbarous attack.

What the Pakistan Army did in Jagannath Hall on the night of 25 March could only be done by the descendants of Halaku Khan, Nadir Shah and Tamarlane. No language is enough to describe that tragedy-the wholesale massacre and destruction and the savagery with which it was carried out. The massacre at My Lai was merely a child's play in comparison with the massacre at Jagannath Hall. The hour of attack was well chosen-midnight, when all the residents of the hall were sound asleep the marauders numbering more than a hundred, stealthily entered the hall compound fully armed with machine-guns, rifles, mortars and tanks. The gates in the boundary walls were not wide enough for the tanks to enter inside. So a portion of the wall in the eastern side was blown away by mortar charge for the tanks to roll inside. The troops encircled all the buildings in the compound to make sure that none could escape.

Then hell was let loose, a hell mere savage and vicious than Daniel inferno. The trig-happy soldiers started firing, indiscriminately from rifles, machine-guns, mortars and tanks. Shells were falling everywhere like rain. The main thrust of the attack was directed towards the two three-storied buildings in the compound which housed about 500 students. Both the buildings were subjected to heavy shelling from tanks and mortars which resulted in parts of the buildings being blown up. I could see galloping flames leaping out from both the buildings.

The blood-thirsty hounds then entered the buildings and searched every room. They dragged out each and every student they found in the buildings. I could hear the screams those hapless youths. I could hear their loudly declaring their innocence and imploring for mercy to those barbarians. But they were replied with merciless beating and rifle shots. Then all of them were forcibly dragged into the field in front of

the hostel buildings made to fall in line and then. I still shudder to think machine-gunned hellish things happen before my eyes.

MIRACULOUS

I had a miraculous almost providential escape. I am perhaps the only survivor from the wholesale massacre carried out at Jagannath Hall. But that night after the cut-throats started killing every-one they came across I did not for a moment think that I would escape the massacre. I resigned myself to fate and was expecting death every moment. The agony of those tension-filed hours waiting for the murderer's bullet to pierce me through can hardly be described. But death missed me almost by a hair's breadth.

How I managed to do it ? The whole story would seen incredible and I still find it hard to believe that I survived while everyone else in the hall was cold-bloodly butchered. My door locks did the trick. I used to reside in a house inside the hall compound. The house was meant for the house tutors of the hall. One portion of the house was occupied by myself and the other portion by a house tutor of the hall. That fateful night I was living alone in that house, my neighbour that house tutor having left for his village home with his family a few days back. His rooms were lock and key. My room I used to keep double locked when I was out. But even when I was in, I used to keep the two locks hanging from the door rings. This would give the impression, unless carefully noticed that the door was locked from outside even when it was shut from inside. And this impression saved me from certain death.

That night I had my dinner with Dr. Jyotirmoy Guhathakurta, Provost of Jagannath Hall and a Reader in English in Dacca University. We had a long discussion about the situation in the country. None of us had the slightest inkling of what coming. I returned to my quarters at about 11 P.M. While returning I found people erecting barricades on the road. This did not give me any idea about impending tragedy, as the erection of barricades on roads was a common feature

in Dacca city since March I when Sheikh Mujib gave his call for non-violent non-cooperation. I went to bed at about half past eleven but could not get to sleep. Suddenly at about 12 I was violently startled and thrown out of my bed by heavy gunfire all around. I stood up and peeping through the window, saw the blood-curdling scene of heavily armed West Pakistani troops entering the hall compound, bringing in tanks after blowing up parts of the boundary wall and firing at random. To my great horror I found 10 to 12 soldiers standing by the side of my room and shelling the hostel buildings from a heavy mortar. The impact of the mortar charge was so great that all the window panes of my room were broken to pieces letting in light from outside. I could see in that light soldiers massacring innocent students in the field. Then I knew for certain that if the soldiers standing beside my room could for a moment suspect that someone inside the room, the next moment I would be dead. And there was no way for me to get out of the room with these soldiers standing so close to my door. So I kept on waiting for anything to happen. At that moment a stray bullet hit me on the right leg. Fortunately, the injury was not serious. I tore a piece of cloth and got the wound bandaged.

After the soldiers had finished their operation in the two main hostel buildings, they launched their attack on the assembly building which housed the hall auditorium, the Provost office, besides being the residence of many students. The soldiers standing beside my room through that no one was in that house and left the place to join their comrades who were then engaged in attacking the Assembly building. Immediately I slipped out of the room and hold myself in a bush in one corner of the hall compound.

MENIALS KILLED

From there I could see the West Pakistani butchers entering the Assembly building, killing everyone there and then setting fire to the building. Then the butchers turned their attention to the menials quarters inside the hall. A large number of the

University's fourth class employees belonging to the minority community used to live in one part of the hall. There were about 200 of them-men, women and children. All of them were brutally murdered and all their dwelling houses razed to the ground.

The carnage went on for the whole night. When the night was almost over, I decided to seek a safer refuge made for the residence of the Provost. The Provost, Dr. Guhathakurta used to reside in the ground floor of four-storied building just across the road in the eastern side of the hall. On reaching the building I found myself facing a hell. The entrances to the Provost's quarters was blocked by a wall of bodies and the entire place was literally overflowing with blood. All of them were not yet completely dead, because I could hear their groans in mortal pain. I closed my eyes to this hellish scene and run for the roof of the building. Once there I looked for a place of hiding because shells were still falling on the open roof. Finding no other alternative, I crept into a niche under an overhead water tank and shuffled myself there.

About an hour later-it was day now-the troops attacked that building. I could hear their forcibly breaking open the doors and shooting the inmates. Later on I found that they killed all the teachers they found in that building, including Dr. Guhathakurta, who was shot twice. Suddenly I saw a soldier climbing up the stairs to the roof. This made me freeze with fear. I thought that though I had been lucky to escape death once last night, this time I would surely be shot dead because I thought that the soldier had climbed on the roof in search of fugitives and he would easily find me if he just looked around. I was counting my moments and waiting for the shots to be fired. But again fortunately, the soldier not look around. He came only to tear up the two flags-one black and the other Bangladesh's-flying from atop that building. He tore them up and climbed down. And death missed me again by a hair's breadth.

I kept on hiding myself under the water tank. At about 12 noon I dragged myself out from there and looked around. The sight I saw in the playground of

Jagannath Hall struck me with horror.The entire field was littered with innumerable bodies. I could not believe my own eyes. I thought that I was having an illusion. I rubbed my eyes and looked again. And the nightmarish sight met my eyes. It was too horrible a scene to endure long. I took myself away and again went into hiding under that water tank. I stayed there for two days and two nights without food or drink. On the second night I thought to myself that if I went on like this I would die on hunger and thirst. So I decided to take the risk of fleeing from Dacca. At about 4 a.m. I came out on the street. The curfew was still in force and I could hear the sound of firing here and there. But I ran on through lanes and by-lanes and took shelter in a school building in a less affected part of the city. I spent there one day and one night. Next day I could manage to reach a friend's house at Siddheswari and stayed with him till March 30. I fled from the cursed city on March 31.

[Hindusthan Standard, Friday, July 2, 1971]

পরিমল গুহ

[তৎকালীন জগন্নাথ হল ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে আইনজীবি, সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ হল। সার্জেন্টস কোয়ার্টার। পাশেই গোয়াল। এর নিকটেই ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘন্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে ম্যানহোলে। পূতি দুর্গন্ধময়। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম্ ঝিম্ পা রি রি করত। উপায় নেই বেরুবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোন রকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টো করেছেন ম্যানহোলের বাইরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বীভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল গুহ আমার কাছে ২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপ্নের রাতের একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। ম্যানহোলে কোন রকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যুপুরীর নিশ্চিত পরিণাম থেকে নিজেকে অনেকটা অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, ২৫শে মার্চ রাতে প্রায় ১১টার দিকে আমি প্রখ্যাত কন্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষীবাজারস্থ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনো হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরি করেছেন। গাড়িগুলো ক্ষীপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীনদার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন। আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্থা খুব উত্তপ্ত, যে কোন সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আপনি যাবেন না। শ্রী পরিমল গুহ বলেছেন, লোকজনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই। ভাবলাম রাতে হলে ফিরব না, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্থানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই একসাথে মরবো আর বাঁচলে সবাই একসাথে বাঁচবো। ওদেরকে ওভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণ রক্ষাকে বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত তখন ঠিক ১১টা। চারদিকে থমথমে ভাব। গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ। নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগনবিদারী শ্লোগান "জয় বাংলা, বাংগালী জেগেছে, বাংগালী জেগেছে।" হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই অজানা আশংকায় শঙ্কাগ্রস্ত।

আমি তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না। কেউ বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোন কারণ নেই। এরপর প্রায় ২৫ জন ছাত্র হলের বাইরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানি না তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলেন, না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন? আমাদের হলে পাক বাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারটায়। এর আগেই আমরা চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কের প্রচন্ডশব্দ। আমাদের হলে সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠলো, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমে আত্মগোপন করার চেষ্টা করল। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরুলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার

সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনও ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে ওরা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনও বেদম প্রহার করতো, আবার কখনও ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে এল। গুলির শব্দে আমার অন্তর আত্মা কেঁপে উঠল। এর পরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬শে মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠলো। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আর্ত কান্না ভেসে আসছে বা এসেছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আর পারা যায় না। ১৯ ঘন্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেয়াল টপকে নিকটবর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয় ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে বারটায়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলেন আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। ক'জন দল বেঁধে ছাদে উঠলেন, কেউ কেউ নিজের কক্ষেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন, দু'একজন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। জগন্নাথ হল নর্থ হাউজ। ২৯ নং কক্ষ। কক্ষে দু'জন ছাত্র থাকতেন। হরিধন ও সুনীল দাস। ২৫শে মার্চ সুনীলের একজন অতিথি এসেছিলেন। পরিমল বললো, পাকিস্তানী হিংস্র হানাদারেরা নর্থ হাউজে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমেই ঢুকলো ২৯ নং কক্ষে।

তিনজনেই তখন রুমে উপস্থিত। পাকিস্তানী সৈন্যরা এত হিংস্র হতে পারে তারা তা ধারণা করেনি। তাই সরল বিশ্বাসে তারা নিজেদের রুমটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিল। সৈন্যরা তিনজনকে পেয়ে গেল। শিকার ধরতে পেরে এই পশুসৈন্যদের সে কি উল্লাস! সে কি আনন্দ! পরিমল গুহ বলেন, হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। সৈন্যরা সার্চলাইট সাথে এনেছিল। তিনজনকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করল তারা। তিনজন একত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর সৈন্যরা রুমে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারল।

পাছে যদি কেউ বেঁচে যায়। ব্রাশে সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেন। সুনীলের খবর নিতে এসে তিনি নিজেই নরপশুদের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হরিধনের গায়ে গুলি লাগেনি। মেশিনগানের গুলির শব্দে তিনিও অপর দু'জনের সাথে পড়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে কিন্তু গ্রেনেড লাগলো তার পায়ে।. তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পরিমল গুহ বলেন, গ্রেনেড ছুড়েই হানাদার সৈন্যরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল সবাই শেষ। কেউ মেশিনগানের গুলি এবং এর পরই গ্রেনেড চার্জে বাঁচতে পারে না। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল হরিধন। তাঁর পা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। নিজের তাজা লাল রক্তের ধারা নিজেই চেপে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারেননি।·

হরিধন বসে কক্ষে পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু সুনীল আর তার অতিথির মৃতদেহ। কক্ষে রক্তের স্রোত। বেরোবার উপায় নাই। হিংস্র হায়েনার দল তখন এ কক্ষে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে পাচ্ছে তাদেরকেই হত্যা করেছে। হরিধন বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চেতনাশক্তি লোপ পাবার উপক্রম। হতবাক হয়ে বসে রয়েছেন। চিন্তা

করছেন হরিধন সুনীল ও তার অতিথি এবং অপরাপর ছাত্রদের শোচনীয় পরিণতির কথা। তিনি চিন্তা করছেন। খেই হারিয়ে যাচ্ছেন তবুও চিন্তা করছেন। হঠাৎ মনে পড়লো তার কক্ষের কয়টি শিক ভাঙ্গা। চেষ্টা করলে হয়তো বেরোনো যাবে মৃত্যুপুরী থেকে এ পথে।

তখন শেষ রাত। হলের ভিতরে গোলাগুলির আওয়াজ কমে গেছে। হরিধন চেষ্টা করলেন। পাইপ বেয়ে নিচে নামলেন। কিন্তু নিরাপদ স্থান কোথায়। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন তিনি পুকুরের দিকে। তখনও তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবে রক্তের বেগ কমে গেছে। প্রায় পানির সাথে মিশে তিনি পুকুরের পারে ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এরপর এখান থেকে তিনি আর সরেননি। ২৬শে মার্চ সারাদিন ও রাত তিনি এভাবে কাটালেন। পরিমল গুহ বলেন, ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত হরিধন এ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন।

সকালে কারফিউ তুলে নেয়া হলো। জনৈক দোকানী এ পথে যাবার সময় অর্ধমৃত হরিধনকে দেখতে পান। তিনি হরিধনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ কিছুদিনের চিকিৎসার পর হরিধন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২৫ জন ছাত্রের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ এদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত। তাদের বুকের সাইজ মিলিয়ে দাঁড় করানো হল। কয়েকটা লাইন। প্রতি লাইনে তিনজন। তারপর দ্রিম দ্রিম শব্দ। মেশিনগানের গুলি। সবাই একসাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর একটু নড়াচড়া করে মহান মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে নীরব হয়ে গেলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদের কথা বলছি। হানাদার পাকিস্তানী হায়েনার দল ২৫শে মার্চের শেষ রাতে হলের ছাদে আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ ক'জন ছাত্রকে এমনিভাবে গুলি করে হত্যা করে।

শ্রী পরিমল গুহ বলেন ঃ পাকিস্তানী নরপশুদের তান্ডব নৃত্য দেখে সত্যদাস, রবীন ও সুরেশ দাসসহ প্রায় জন পঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। একমাত্র সুরেশ ছাড়া আর কেউ ওদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। তিনি বলেছেন সুরেশ একটু বেঁটেখাটো। বুকের সাইজে অন্যান্যদের সাথে তার মিল ছিল না। তাকে সবার পিছনে দাঁড় করানো হলো। তারপর গর্জে উঠল মেশিনগান। সকলের বুক হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত বইলো। সুরেশ বেঁটেখাটো, তার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছিল তার কাঁধে। তিনিও সকলের সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঠিক মৃতের মত।

মৃতের মিছিলে জীবন্ত সুরেশ। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে গিয়েও সবাই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করলেন, মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। কিন্তু শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছেন তিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। পরিমল বলেন, সুরেশের কাঁধের মাংস উড়ে গেছে মেশিনগানের শক্তিশালী গুলিতে, অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল ক্ষতস্থান থেকে। ক্ষতস্থান গায়ের জোরে চেপে ধরেও তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারছিলেন না। নিজের শরীরের উষ্ণ রক্তে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের গায়ের টকটকে তাজা রক্ত অবিরাম ধারায় ঝরছে তো ঝরছেই। কিছুতেই

কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না তার রক্তপাত, রক্তের বেগ কমছে না। ব্যান্ডেজ করা দরকার, কিন্তু ব্যান্ডেজ করবেন কি দিয়ে। পরনের লুংগি আর গায়ের গেন্জি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। লুংগি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে লুংগির ছেঁড়া টুকরো দিয়েই তিনি তৈরি করলেন ব্যান্ডেজ। ছাদের উপর সারিবদ্ধ তরুণদের মৃতদেহ। প্রহরীর মত তিনি বেঁচে আছেন একা। রক্তের স্রোত। হলের ছাদ লাল রক্তে ভেসে গেছে। চারিদিক নিরব নিঝুম। শুধু গোলাগুলির শব্দ ও মানুষের আর্তকান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পরিমল বলেই চলছেন ঃ মৃত্যুর পাশে বসে রয়েছেন সুরেশ। বসে রয়েছেন সুরেশ হতবাক হয়ে। মাঝে মাঝে তিনি চেতনা হারাচ্ছিলেন। নিজের বেঁচে থাকার উপর তার ধিক্কার আসছিল। আবার কখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠত ভিড় জমানো ফেলে আসা স্বপ্নরঙিন মধুময় হাজারো দিনের স্মৃতি। আছড়ে আছড়ে কেঁদে সেসব স্মৃতি ফরিয়াদ জানাত। স্মৃতির মিছিলে সুরেশ হারিয়ে ফেলতেন। হলের ছাদের উপর পানির ট্যাংক। হঠাৎ তার চেতনার উদয় হলো। সুরেশ আর দেরী না করে পানির ট্যাংকে ঢুকলেন। ২৬শে মার্চ পুরোদিন ও সারা রাত তিনি পানির ট্যাঙ্কেই কাটালেন আত্মগোপন করে। ২৭ তারিখ পানির ট্যাঙ্কে তার থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ২৭ তারিখে ভোরের দিকে হাতে প্রাণ নিয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে নামলেন ছাদ থেকে। এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ হলের উত্তর পাশের রাস্তার দিকে। সুরেশ ভয়ে সোজা হননি। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিলেন। পরিমল গুহ তখন কারফিউ তুলে নেবার পর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এদিকের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সুরেশের সাথে পরিমলের দেখা হওয়ায় সুরেশ প্রাণ ফিরে পেলেন। পরিমল গুহ পরে সুরেশকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরিমল ছাদের নারকীয় হত্যালীলার কাহিনী সুরেশের কাছে থেকে শুনেছেন।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল নরপশুরা। অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা তিনজন যখন প্রায় আধমরা তখন তাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হলো। ২৬শে মার্চ সকাল ১১টা। হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এলো হলের ভিতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুললো। হলের মাঠের মাঝখানে আগে থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এলো মাটিচাপা দেয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পাড়ে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। সবাই সাথে সাথেই লুটে পড়লো।

শ্রী পরিমল গুহ বললেন ২৬শে মার্চ সকালের কথা। তিনি তখনো ম্যানহোলে। স্বচক্ষে দেখেছেন এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেছেন, এই ৫ জনের মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে কালীরঞ্জন শীলকে চিনতে পেরেছেন। আর কাউকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করার পর হানাদার খুনীরা সবাই চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। হয়ত তারা আরো শিকার ধরার জন্যেই গেল। মাঠের গর্তে আর গর্তের পারে পড়ে রইল অগণিত প্রাণের নিষ্প্রাণ দেহ। হঠাৎ এই মৃতের স্তূপ থেকে একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো। পরিমল গুহ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান লোক কালীরঞ্জন শীল।

জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সেলুলয়েড ক্যামেরায় যার ছবি ধরা পড়েছে তিনি কালীরঞ্জন শীল। তিনি আবার ২৬শে মার্চ ভোরের কথা বললেন। খুব ভোরে হানাদার

সৈন্যরা অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে আসে মাঠে। শ্রী ভট্টাচার্য হলেন একজন হাউজ টিউটর। এসেম্বলী বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে থাকতেন। পরিমল গুহ দেখেছেন হলের ছাত্র বিধান রায় এবং অপর একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে আসলো। শেষোক্ত ব্যক্তির বেশভুষায় তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে মনে হলো।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরনে ধুতি। তিনজনকে একত্র করা হলো। প্রহারের পালা। তারা তাদেরকে বুট দিয়ে লাথি দিচ্ছিল। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছিল। বেদম প্রহার। তারা চিৎকার করছিল, বিধান প্রহারের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দেবার কাকুতি-মিনতি করছিলেন। বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। বিধানের কথাতে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। নরপশু সৈন্যরা প্রহারের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল। অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা যখন তিনজন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। তারপর সেই পরিচিত মেশিনগানের শব্দ। তারা তিনজন এলিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পরিমল গুহ বললেন, তিনি ২৬শে মার্চ মাঠে মানবতার পূজারী প্রখ্যাত দার্শনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখেছেন। তার গা খালি ছিল। সৈন্যরা তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল মাটিচাপা দেবার জন্য।

দৈনিক পূর্ব দেশ, ১৫, ১৬, ২৫ ও ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

প্রয়াত ডঃ নূরুল উল্লা
প্রাক্তন অধ্যাপক
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।

যিনি টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক দৃশ্য সেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ডঃ নূরুল উল্লার সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের ছবি নিজ হাতে তুলেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬শে মার্চের সকালবেলা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঘটেছিল তার ছবি আমার বাসায় জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তুলেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ এ ছবি তোলার জন্য কি আপনার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, না এমনি হঠাৎ করে মনে হওয়াতে তুলে নিয়েছেন?

উত্তর ঃ ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণের পর থেকেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, এবার একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। তাই

তখন থেকেই বিভিন্ন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, ব্যারিকেড ইত্যাদির ছবি আমি তুলতে আরম্ভ করি।

প্রশ্ন ঃ ক্যামেরাটি কি আপনার নিজস্ব ?

উত্তর ঃ না, ওটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ভি.ডি.ও টেপ ক্যামেরা। ছাত্রদের হাতেকলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি ধরনের আরো বহু ক্যামেরা ও জটিল যন্ত্রপাতি আছে।

প্রশ্ন ঃ ক্যামেরাটি আপনার কাছে রেখেছিলেন কেন ?

উত্তর ঃ এর জবাব দিতে হলে আমাকে আরো একটু পিছনের ইতিহাস বলতে হয়। ইতিহাস বলছি এজন্য যে এগুলো ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা উচিত। ৭ই মার্চের পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, "স্যার, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি অয়্যারলেস স্টেশন তৈরি করতে হবে।" আমি ওদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এরপরে ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা ঠিক করে আমাকে তার ধানমন্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির একেবারে ভিতরের এক প্রকোস্টে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। অনেক ভিতরের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম সেখানে সোফার উপরে তিনজন বসে রয়েছেন। মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। তার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ও বাঁ পাশে তাজউদ্দিন সাহেব। আমি ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম করলাম। ছাত্ররা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও আগেও অনেকবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সোফা থেকে উঠে আমাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, "নূরুল উল্লা আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক আমার জন্য একটা ট্রান্সমিটার তৈরি রাখবে। আমি শেষবারের মত ভাষণ দিয়ে যাব। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ তখন আমার কাছে বাচ্চা শিশুর আবদারের আবেগময় কণ্ঠের মত মনে হচ্ছিল। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের তড়িৎকৌশল বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে সব কথা খুলে বললাম। শুরু হলো আমাদের কাজ। বিভাগীয় প্রধান ডঃ জহুরুল হকসহ প্রায় সকল শিক্ষকই আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন। ৯ দিন কাজ করার পর শেষ হলো আমাদের ট্রান্সমিটার। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শক্তি ধরা যেত। যা হোক পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার আসেনি। এইসাথেই আমার মাথায় ধারণা এলো, যদি কোন হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা গোলাগুলি হয় তাহলে তা আমি ক্যামেরায় তুলে ফেলব। এবং সেই থেকেই ক্যামেরাটি আমার সাথে রাখতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন ছবি তোলা শুরু করেন ?

উত্তর ঃ রাত্রে ঘুমের মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবশ্য আমরা তখন অতটা গুরুত্ব দেইনি। আমি ভেবেছিলাম যে আগের মতই হয়ত ছাত্রদেরকে ভয় দেখাবার জন্য ফাঁকা গুলি করা হচ্ছে। অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় যে সমস্ত হাতবোমা তৈরি করছিল তারই দু'একটা হয়ত বিস্ফোরিত হচ্ছে। সারা রাতটা একটা আতঙ্কের মধ্যে

কাটালাম। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে জগন্নাথ হলের দিকে তাকাতাম। কিন্তু সমস্ত এলাকাটা আগে থেকেই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। রাতে জগন্নাথ হলের এলাকায় কি হচ্ছিল কিছুই দেখতে পারলাম না। শুধু গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওখানে দু'পক্ষেই একটা ছোটখাটো লড়াই হচ্ছে। সাথে সাথে আমার ক্যামেরার কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে। আর দিবালোকে আমি ছবি তুলতে পারব।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তা কি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না ?

উত্তর ঃ এমনভাবে ক্যামেরা বসানো হয়েছিল যে বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ পর্দার আড়ালে এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে শুধু ক্যামেরার মুখ বের করা ছিল। পুরো ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। আমাদের জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি যে বন্ধ করার পরেও ধাক্কা দিলে কিছুটা ছোট ফাঁক থেকে যায়। ঐ ফাঁক দিয়ে ক্যামেরার মুখটা বাইরে বের করে রাখলাম।

প্রশ্ন ঃ ক্যামেরা চালু করেন কখন ?

উত্তর ঃ সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময়ে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, জগন্নাথ হলের সামনেই মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। তখনই আমার সন্দেহ জেগে যায় এবং আমি ক্যামেরা অন করি। আমাদের ক্যামেরাটির একটি বিশেষ গুণ এই যে, এতে মাইক্রোফোন দিয়ে একই সাথে শব্দ তুলে রাখা যায়। তাই আমি টেপের সাথে মাইক্রোফোন যোগ করিয়ে ক্যামেরা চালু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে ছেলেগুলোকে একধারছে গুলি করা হচ্ছে ও একজন একজন করে পড়ে যাচ্ছে। পাক-সেনারা আবার হলের ভিতর চলে গেল। আমি ভাবলাম আবার বেরিয়ে আসতে হয়তো কিছু সময় লাগবে। তাই এই ফাঁকে আমি টেপটা ঘুরিয়ে আমার টেলিভিশনের সেটের সাথে লাগিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম যে ঠিকভাবে উঠছে কিনা। এটা শেষ করতেই আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, আবার কিছুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আবার লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। আমি তখন পূর্বের তোলা টেপটা মুছে ফেলে তার উপর আবার ছবি তোলা শুরু করলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি পূর্বের তোলা ছবিটার টেপ কেন মুছে ফেললেন ?

উত্তর ঃ আমার মনে হচ্ছিল আমার আগের ছবিতে সবকিছু ভালভাবে আসেনি। আর নতুন ছবি তুলতে গিয়ে আমি হয়তো আরো হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ধরে রাখতে পারব। আর হাতের কাছে আমার টেপ ছিল না। মোট কথা আমি এই সমস্ত দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেলাম। আজও আমি দুঃখ করি যদি আমি নতুন টেপে ছবি তুলতে পারতাম তাহলে কত ভাল হতো। দুটো দৃশ্য মিলে আমার টেপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেত। কিন্তু তখন এতকিছু চিন্তা করার সময় ছিল না। যা হোক দ্বিতীয় লাইনে দেখলাম একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক রয়েছে। সে বসে পড়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছে। আমার মনে হচ্ছিল সে তার দাড়ি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে মুসলমান। কিন্তু বর্বর পাক বাহিনী তার কোন কথাই শুনতে চায়নি। তাকে গুলি করে মারা হল। মাঠের অপর দিকে অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে পাক বাহিনী একটা তাঁবু বানিয়ে ছাউনি করেছিল। সেখানে দেখছিলাম, ওরা চেয়ারে বসে বেশ কয়েকজন চা খাচ্ছে আর হাসি-তামাশা ও আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

প্রশ্ন ঃ লোকগুলোকে হলের ভিতর থেকে কিভাবে আনা হচ্ছিল ?

উত্তর ঃ যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলো এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করার পরে আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা করে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ জমা করা মৃতদেহের সংখ্যা দেখে আপনার ধারণায় কতগুলো হবে বলে মনে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০ জনের মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় যে এগুলো সবই ছাত্রদের মৃতদেহ ?

উত্তর ঃ আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালী, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সাথে গুলি করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়-চোপড় পরা বয়সী লোকদেরকেও ওখানে লাইনে দাঁড় করিয়ে মারা হচ্ছিল। এদের দেখে আমার মনে হয় তারা ছাত্রদের গেস্ট হিসাবে হলে থাকছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি দেখেছেন যে কাউকে গুলি না করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ না, তবে লাইনে দাঁড় করাবার পরে যে খানসেনাটিকে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল সে যখন পিছনে তার অফিসারের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল সেই ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তূপ করা মৃতদেহগুলির মধ্যে শুয়ে পড়ল। আর বাকিগুলোকে গুলি করে মারা হলো। গুলি করে যখন খানসেনারা সবাই কয়েক ঘন্টার জন্যে এই এলাকা ছেড়ে চলে গেল সেই ফাঁকে ঐ দু'জন উঠে প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো। পরবর্তীকালে তাদের একজন আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একজন ছাত্রের অতিথি হিসাবে হলে থাকছিল। ঢাকায় এসেছিল চাকরির ইন্টারভিউ দিতে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার ইচ্ছামত সব ছবি তুলতে পেরেছিলেন ?

উত্তর ঃ না, আমি আগেই বলেছি যে আমি থেমে থেমে তুলছিলাম, পাছে টেপ ফুরিয়ে যায়। তাই আমি সব ছবি তুলতে পারিনি বলে আমারও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কারণ পরে যখন বুলডোজার দিয়ে সব লাশগুলোকে ঠেলে গর্তে ফেলা হচ্ছিল, সে ছবি আমি তুলতে পারিনি। কারণ ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবার পর পরই আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি টেপ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ না, আমি সাথে নেয়াটা আরো বিপদের ঝুঁকি বলে মনে করে বাসায়ই যত্নসহকারে রেখে যাই। আর এ ঘটনা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরে নিয়ে গেলে হয়তো অনেকে জেনে ফেলত এবং আজকে এই মূল্যবান দলিল আমি দেশবাসীর সামনে পেশ করতে পারতাম না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন এই টেপ সবার সামনে প্রকাশ করলেন ?

উত্তর ঃ যুদ্ধকালীন নয় মাস প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আমার আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। কখন কে জেনে ফেলে, কখন আমি ধরা পড়ে যাই বা কখন এটা এসে নিয়ে

যায়–এমনি মানসিক যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলাম। যা হোক দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৭ই ডিসেম্বরের দিকে আমি আস্তে আস্তে প্রকাশ করলাম আমার এই গোপন দলিলের কথা এবং ২/৩ দিন পরেই এটা আমি সবাইকে জানালাম ও কয়েকদিন পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের এটা দেখালাম। এ খবর শুনে অনেক বিদেশী সাংবাদিক আমার কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এই দলিলের অরিজিনাল কপি অর্থাৎ আসল টেপ কিনতে চাইলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি রাজী হলেন ?

উত্তর ঃ আমার রাজী হবার প্রশ্নই ওঠে না। অরিজিনাল কপি আমি হারালে সেটা আমার দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে।

(বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২)

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক, বি. এ.
পিতা মৃত – শ্রীবীর চন্দ্র বসাক
১৮, তাঁতীবাজার লেন, ঢাকা–১।

আমি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে আমার ১৮ তাঁতীবাজারস্থিত বাসায় ছিলাম। রাত ১২টায় উত্তর দিক থেকে অকস্মাৎ কামানের আকাশ ফাটা গর্জন শুনে আমি তেতলার ছাদের উপর দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহে আগুনের ফুলকি ও লক্ষ লক্ষ গুলির আগুনের ফুলকিতে আকাশ ভরে গেছে। অনবরত কামানের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে। উত্তর দিকে আকাশে দেখলাম, একটা ঘোলাটে বেলুনের মত আগুনের বিরাট পিণ্ড পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পূর্বদিকে দিয়ে গভর্নর হাউসের কাছে এসে নেমে পড়ল। এই সময় দেখলাম–চারদিকে জনপদ, বস্তি এলাকায় আগুন আর আগুন জ্বলছে। বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে কামানের কানফাটা গর্জন ভেসে আসছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম গুলির আওয়াজ ক্রমে ক্রমে গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সদরঘাট খৃষ্টানদের গীর্জার সম্মুখে সামরিক গাড়ি ও ট্যাঙ্কের ঘরঘর আওয়াজ শুনলাম। এ সময় শতকণ্ঠের "মাগো, বাবাগো, বাঁচাও, বাঁচাও" আর্তনাদ শুনলাম। শাঁখারী বাজারের সকল হিন্দু জনতা যার যার ছাদে দাঁড়িয়ে এ বীভৎস কাণ্ড দেখছিল। কিছুক্ষণ পর সদরঘাট টার্মিনালে ভীষণ গুলিবর্ষণের শব্দ শুনলাম। রাত দু'টার সময় মাইকে ঘোষণা করা হলো–রাজধানী ঢাকায় ২৬শে মার্চ ভোর পর্যন্ত কার্ফু জারি করা হয়েছে, যার যার বাড়িতে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীন বাংলার পতাকা আছে, তা অবিলম্বে নামিয়ে ফেলে সে স্থানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। রাত দুটার পর রাজধানীর পূর্বদিক থেকে আর একটি জ্বলন্ত বেলুনের মত ঝলমলে গ্রোব পূর্ব আকাশ

থেকে উঠে আস্তে আস্তে সোজা পশ্চিমে ভেসে গিয়ে মিশে যেতে দেখলাম। এরপর আর একটি গুলির আওয়াজও কানে আসে নাই। চারদিকে নীরব, নিস্তব্ধ শ্মশানের হাহাকার। আগুন আর আগুন জ্বলছে দেখলাম রাজধানী ঢাকার চারদিকে–জনপদ ও বস্তি এলাকা জ্বলছে।

২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেয়ার পর শুনলাম শাঁখারী বাজারের কোর্টের প্রবেশপথের একটি বাড়িতে ১০জন হিন্দুকে একই ঘরে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ডঃ শৈলেন সেনকে গ্রেফতার করে জগন্নাথ কলেজের পাক–সেনাদের ছাউনিতে আটক করা হয়েছে। ইংলিশ রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোডের দুই পাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখানা ও মেশিনপত্র ভস্ম হয়ে পাক–সেনাদের বীভৎসতার স্বাক্ষর হয়ে পড়ে আছে–দুই পাশের বাণিজ্য এলাকার সকল দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। রাস্তাঘাট শূন্য, কোথাও কোন মানুষ নেই। আমি কাজী আলাউদ্দিন রোড হয়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে দেখলাম আটজন পুলিশী পোশাক পরা লাশ গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে ফাঁড়ির বারান্দায় ও রাস্তায় বিকৃতভাবে পড়ে আছে। রেল লাইনের দুই পাশের বস্তি এলাকা ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে আছে, দেখলাম চারদিক জনমানবশূন্য। আমি দ্রুত আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জি. কে. নাথ, সংস্কৃতের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের খোঁজে জগন্নাথ হলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম জগন্নাথ হলের চারদিকের দেয়াল লক্ষ লক্ষ গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হয়ে আছে। হলের কাচের জানালাসমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। হলের পুকুরপাড় দিয়ে আমি অগ্রসর হওয়ার সময় দেখলাম হঠাৎ পুকুরের মধ্য হতে একজন মানুষের মাথা উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে, ভীত–সন্ত্রস্ত দিশেহারা উন্মাদের মত হয়ে পানি থেকে মাথা তুলে ক্রন্দন ও বুকে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, "দাদা ওদিকে যাবেন না, ওরা আমাদের সব মেরে ফেলেছে।" আমি লোকটাকে উন্মাদ মনে করে তার কথায় কান দেই নাই। আমি আরও অগ্রসর হয়ে হলের কেন্টিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি প্রাণীও নাই–নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। কেন্টিনের মধ্য দিয়ে হলের নর্থ হাউসে প্রবেশ করে সিঁড়ির নিকটে দেখলাম একজন হিন্দু যুবকের লাশ পড়ে আছে। মাথায় চুল আগুনে পোড়া, সারা দেহগুলিতে ঝাঁজরা। আমি দোতলায় না উঠে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ে হলের শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখলাম শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। শহীদ মিনারের পিছনেই সদ্য মাটি তোলা একশত ফুট লম্বা এক বিরাট গর্ত দেখলাম– গর্তটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মাটি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। গর্তের উপরের মাটি ভেদ করে কারো কারো হাতের পাঞ্জা, পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। আমি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে হলের শেষ মাথায় লোহার গেটে পৌছলে পিছন থেকে একটি দিশেহারা কর্কশ নারীকণ্ঠ চিৎকার করে বললেন, "আপ কাহাপর যাতে?" আমি সেই কণ্ঠের দিকে নজর না দিয়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর মিঃ জি. কে. নাথ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এবং পরেশ মণ্ডলের কোয়ার্টারের প্রবেশপথে গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টারের দরজা–জানালা সব খোলা, জনমানবশূন্য, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখলাম দোতলা থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, সিঁড়ির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন জমাট হয়ে আছে। আমি এ পচা দুর্গন্ধ ও

দেখে আর উপরে উঠতে পারি নাই। বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়ে এখানেই আমি প্রথম ভয় পেলাম এবং ভড়কে গেলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। আমার উপরে উঠতে সাহস হলো না। আমি নিচে নেমে আসলাম এবং ভীত-সন্ত্রস্তভাবে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ধরে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথে জগন্নাথ হলের একজন চাপরাশীর সাক্ষ্য পেলাম। সে বললো, আমাদের হলের প্রভোষ্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের দোতলায় ৯ নং কক্ষে আছেন, তিনি জীবিত আছেন। আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করুন। আমি হাসপাতালের দোতলার ৯নং কামরায় প্রবেশ করতেই হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা আহত হলের একজন যুবক ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকেন, "দাদা আমি কি বেঁচে আছি? দেখেন আমাকে ওরা গুলি করেছে। ঐ যে দেখুন জ্যোতির্ময় বাবু, তাকেও পশুরা গুলি করেছে। আমি তাকে উন্মাদের মত মনে করলাম, তার অসংলগ্ন কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম সে প্রকৃতিস্থ নয়। আমি আরও অগ্রসর হয়ে দেখলাম জ্যোতির্ময় বাবু শুয়ে আছেন- জ্ঞানহারা, মাঝে মাঝে দীর্ঘ চাপা নিঃশ্বাস ফেলছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি চক্ষু খুলে বন্ধ করে ফেলছেন। আমি অনেকক্ষণ তার শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর করুণ অবস্থা দেখলাম। তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন "কে?" আমি বললাম, "আমি বসাক, আমি পূর্ণ বাবু।" তিনি উত্তরে বললেন "ও"। একটু পরেই বিড় বিড় করে বললেন, "ডঃ গোবিন্দ বাবু ইজ প্রসিডিং ওয়েল।" এ কথা বলেই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই অন্তিম দৃশ্য দেখছিলাম। একটু পরেই বারান্দা হতে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ক্রন্দনরতা অবস্থায় কাতর কণ্ঠে বললেন, "দাদা, আপনি এসেছেন, আমাকে একটু সাহায্য করুন। কাল থেকে এ হাসপাতালে কিছুই নাই, আমাকে একটি এক্সরে প্লেট যোগাড় করে দিন।" আমি উত্তরে বললাম, "দাস কোম্পানীর দোকান খোলা পেলে এখনি এনে দিচ্ছি।" বলে তাকে প্রবোধ দিলাম। আমি তাকে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম গুলি কোথায় কোথায় লেগেছে- উত্তরে বললেন, ঘাড়ে একটি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। পেটে নাভীর কাছে ব্যথার যন্ত্রণার কথা বলছেন। বোধ হয় পেটের ভিতরও গুলি লেগেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম। প্রবেশপথে আসলে হলের সেই আহত গুলিবিদ্ধ ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি করে বাঁচলে?" সে বলতে লাগলো-খান সেনারা ভারী অস্ত্র নিয়ে রাত বারটার দিকে আমাদের হলের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কামরা ও কক্ষে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। হল বন্ধ থাকলেও কতিপয় অনার্স পরীক্ষার্থী ও এম. এ. পরীক্ষার্থী প্রতিভাবান বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র হলে অবস্থান করছিল। প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করে যাকে যেখানে পেয়েছে তাঁকে সেখানেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছে, আমি সেই সময় হলের বাথরুমে পালিয়ে ছিলাম। তারা আমাকে বাথরুমেই ধরে ফেলে, আমাকে ওরা ধরে বললো, "তোমকো কুচ নেহি বলেগা" এবং দোতলা থেকে আরও তিনজন ছাত্রকে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার বললো, "ইয়ে দেখ তোম লোগ কো কুচ নাহি করেগা। উপর যেতনা লাশ হায়, সব নিচে লে আও।" আমরা চারজন তাদের নির্দেশমত উপর থেকে সদ্য গুলিবিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত শহীদদের লাশ নিচে নিয়ে আসলাম। বীর শহীদদের সব লাশ আমরা

শহীদ মিনারের গর্তের সামনে নিয়ে এসে দেখলাম পাক-সেনারা সশস্ত্রভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লাশগুলি ওরা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটিচাপা দিল। হত্যাযজ্ঞ শেষে আরেকদল সৈন্য উপরে গিয়ে আবার তল্লাশী চালিয়ে ফিরে আসলো-আমাদের চারজনকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম লাইন করে, এরপর আমাদের উপর ওরা গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। আমাদের উপর গুলির শব্দ হওয়া মাত্র আমি মৃতের ভান করে পড়ে গেলাম। বীর শহীদদের সেই লাশের মধ্যে পড়ে থেকে দেখলাম পাক-সেনারা আর্মি ট্রাক নিয়ে সদলবলে চলে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখে যখন নিশ্চিত হলাম তারা আর নাই, তখন সেই লাশের মধ্য হতে উঠে এক দৌড়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চলে এসেছি।

স্বাক্ষর/-
শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক
২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৮।

বাংলা একাডেমী দলিলপত্র, ১৯৭২—৭৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র ঃ অষ্টম খন্ড
ঢাকা, ১৯৮৪
পৃষ্ঠা ঃ ১৯—২২।

শ্রী বাসন্তী রানী গুহঠাকুরতা

স্বামী-ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান গার্লস হাই স্কুল,
গেন্ডারিয়া, ঢাকা-৪।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সেই কালরাতে আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই রাত নয়টার সময় রেডিও খুলে বসে ছিলাম। ঢাকা রেডিও থেকে আমরা সে রাতে দুর্যোগের কোন পূর্বাভাস পাই নাই। ভয়েস অব আমেরিকা'র সংবাদ শুনে আমার স্বামী ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মেয়ে মেঘনার ঘরে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. প্রিলিমিনারী এবং অনার্স পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখতে বসলেন। অকস্মাৎ জনতার দুপদাপ শব্দ শুনে আমার স্বামী এবং আমি দেয়ালের বাইরে গিয়ে দেখলাম জনতা রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় গাছ, পানির ট্যাঙ্ক ও ইট-পাটকেল দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করছে। আমার স্বামী বিপদ বুঝতে পেরে ফ্লাটের প্রবেশপথ তালাবদ্ধ করেন। আমরা রাস্তার দিকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে ভারাক্রান্ত মনে 'বিপদ আরম্ভ হয়ে গেল' বলে আবার মেয়ের কক্ষে গিয়ে খাতা দেখতে বসে গেলেন। আমি আজেবাজে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। রাত বারটার

দিকে অদূরে বোমার আওয়াজ শুনে জেগে উঠে দেখলাম ইকবাল হল এবং রোকেয়া হলের দিক থেকে বোমার আওয়াজ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে অসংখ্য লাইট-বোম আকাশকে আলোকিত করে দিচ্ছে, আলোর ফুলকিতে দেখলাম বোমা ও গুলি বর্ষিত হচ্ছে। আমরা দুজন গুলি ও বোমার কানফাটা আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে খাটের তলায় বেড কভার বিছিয়ে নিরাপদে শুয়ে থেকে বর্বর পাক সেনাদের বীভৎসতার তাণ্ডব শুনছিলাম। পাশের কামরা থেকে আমাদের ঝিকে ডাকতে গেলে সে আসে না। আমরা সবাই গুলির অবিরাম গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ফ্লাটটি কাঁপছিল। চারদিকে দেখলাম লাইট-বোমের আলোর ঝলকানি। হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমার গায়ের লোম শিউরে উঠল। আমি উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম আমার ফ্লাটের প্রবেশপথের সামনে পাক সেনা ভারী অস্ত্রবাহী সশস্ত্র আর্মি ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অল্পক্ষণ পরেই এক পাঞ্জাবী মেজর লোহার জিঞ্জির হাত দিয়ে সজোরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্লাটে প্রবেশ করে আমার মেয়ে মেঘনার কক্ষের জানালার মসকুইটো নেট বেয়নেট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে মাথা ঢুকিয়ে আমাকে দেখে এক দৌড় দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাদের ফ্লাটে প্রবেশ করে। আমি আমার স্বামীকে বললাম পাক-সেনারা আমাদের ফ্লাট ঘেরাও করেছে। আমরা বিপদগ্রস্ত বিপন্ন। আমার স্বামী আমার মেয়েকে অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন, পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের কামরার দরজায় বুটের লাথি মারছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার স্বামীকে বললাম, পাক-সেনারা এসে গেছে, হয়ত তোমাকে গ্রেফতার করবে, তুমি তৈরি হয়ে নাও-বলে একটা পাঞ্জাবী তার হাতে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসে দেখলাম রান্নাঘরের পাশের বারান্দার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার আয়াকে কনুইয়ের আঘাতে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, "প্রফেসর সাহাব হায়?" আমি নিরুপায় হয়ে সত্য কথা বললাম। পাঞ্জাবী মেজর আবার বললো, "উনকে লে যায়েগা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাহা লে যায়েগা?" আমার কথায় কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলল, "লে যায়েগা?" আমার সাথে সাথে মেজর চলতে চলতে বলতে লাগল, "ফ্লাটমে আওর কই জোয়ান আদমী হায়?" আমি বললাম, "নেহি ত হামারা একহী লাড়কি হায়।" একথা শুনে মেজর বলল, "ঠিক হায় লাড়কি কা ডার নাহি হায়া" আমার সাথে আমার স্বামী যে কামরায় ছিলেন সে কামরায় প্রবেশ করে আমার স্বামী ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে বাম হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "আপ প্রফেসার সাহাব হায়?" আমার স্বামী উত্তরে ইংরেজীতে বললেন "ইয়েস।" পাঞ্জাবী মেজর বললো, "আপকো লে যায়েকা।" আমার স্বামী মোটা গলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, "হোয়াই।" মেজর তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। আমি পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়ে তাদেরকে আর দেখতে না পেয়ে কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে দেখলাম সবকিছু বিকল অচল হয়ে আছে। আমি এ সময় সবই বুঝতে পারলাম-আমরা বিপদগ্রস্ত বিপন্ন। ফিরে দেখলাম উপর তলার সিঁড়ির শেষ মাথায় মিসেস মনিরুজ্জামানকে পাঞ্জাবী জোয়ানরা 'যাও, যাও, হটো' বলে তাড়া দিচ্ছে। ইতিপূর্বে পাক-সেনারা মনিরুজ্জামান, তাঁর ছেলে. তাঁর ভাগনে এবং প্রতিবেশী যুবককে

টানাটানি করে ঠেলে ধাক্কিয়ে নিচে নামিয়ে নীয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করছিল। মিসেস জামান সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে আমাকে বললেন, পাক-সেনারা ওদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম নিয়ে-যেতে দিন, ওদেরকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওরা আমাদের ভাষা বোঝে না, জোরাজুরি করলে মেরে ফেলতে পারে। একথা বলতে বলতে বাইরে আমি দুটি গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়ে বালিশ হাতে অদূরে দাঁড়ানো মেয়েকে ধরতে গিয়ে পর পর আটটি গুলির শব্দ শুনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম সিঁড়ির নিচে চারজনের দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গুলিবর্ষণ করার পরক্ষণেই পাক-সেনারা সবাইকে কার্ফু জারির কথা ঘোষণা করে দ্রুত ট্রাকগুলি নিয়ে চলে গেল। মিসেস মনিরুজ্জামান তেতলা থেকে পানি নিয়ে এসে গুলিবিদ্ধ সবাইকে খাওয়ালেন। তিনি দৌড়ে এসে বললেন, "আপনার স্বামী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন, আমার সাথে কথা বলছেন, তিনি বাঁচবেন না।" একথা শুনে আমি এবং আমার মেয়ে মেঘনা দৌড়ে আমার স্বামীর গুলিবিদ্ধ দেহের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমার স্বামীর দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলছিলেন, "ওরা আমাকে গুলি করেছে, আমার শরীর প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাও।' আমি কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু হায় হায় শব্দ করছিলাম। দোতলায় যে ফ্লাটে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব এবং অধ্যাপক আনিস সাহেব থাকতেন তাঁদের ব্লকের প্রবেশপথে অটোমেটিক তালা ঝুলতে থাকায় পাক-সেনারা সেখানে প্রবেশ করে নাই। পাক-সেনারা চলে যাওয়ার পরও ওরা কেউ আমাদের অসহায় চিৎকার শুনেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই। আমরা কোন রকমে আমার স্বামীর রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ ধরাধরি করে আমাদের ফ্লাটে নিয়ে এসে বারান্দার খাটে এলিয়ে দিলাম। আমার স্বামী জ্ঞান হারান নাই তখনও। আমার মেয়ে মেঘনা মনিরুজ্জামান সাহেবের ভাগনের পানি পানি বলে অসহায় আর্তনাদ শুনে আমাকে নিয়ে তার মুখে শেষ পানি দিয়ে আসলো। পরক্ষণেই ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দূরে-অদূরে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলিবর্ষণ করছিল পাক-সেনারা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাক-সেনারা জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ছাত্রদের কেন্টিনে আগুন ধরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে পাক-সেনাদের সামরিক ট্রাকগুলি টহল দিচ্ছিল। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার। পরের দিন ১৯৭১ সানের ২৬শে মার্চ ও ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত আমার স্বামীর ক্ষত বেয়ে রক্ত ঝরছিল। বাইরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারি নাই।

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে কতিপয় লোকের সাহায্যে আমার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করি। হাসপাতালে কোন লোকজন ও ডাক্তার ছিল না। দায়িত্বরত নার্সরা সাধ্যমত আমার স্বামীর সেবাযত্ন করেছে। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ বিনা চিকিৎসায় আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি তার মৃতুদেহ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনার অনুমতি পাই নাই। তার পবিত্র মৃতদেহের সৎকার করতে পারি নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই পাক-সেনারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে।

আমি স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসার কোন উপায় না দেখে ডাক্তারদের উপদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডঃ মালেকের বড় ভাই আব্দুল বারি সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাদের গাড়িতে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী ডঃ এম.এ. ওয়াহিদ সাহেবের ২০নং ধানমন্ডিস্থ বাসায় আশ্রয় লাভ করি। আমার স্বামীর লাশ চারদিন হাসপাতালে পড়ে ছিল আমার ড্রাইভার ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডের বারান্দায় আমার স্বামী ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মৃতদেহ দেখে এসেছে।

বাংলা একাডেমী দলিলপত্র, ১৯৭২—৭৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র ঃ অষ্টম খন্ড
ঢাকা, ১৯৮৪
পৃষ্ঠা ঃ ১৩—১৬।

ডক্টর দেবকে হানাদাররা কিভাবে হত্যা করেছিল

সাক্ষাৎকারবেগম রোকেয়া সুলতানার

স্বর্গীয় ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের পালিতা কন্যা তিনি। ২৬শে মার্চ সকালে হানাদার বাহিনী যখন ডক্টর দেবকে গুলি করে হত্যা করে তখন একমাত্র কন্যা রাবেয়াকে কোলে বেগম রোকেয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর পালক পিতার পাশে। তার আগেই হানাদার পশুরা রোকেয়ার স্বামীকে হত্যা করেছে। কোলে শিশু নিয়ে আতঙ্কে আর বেদনায় তিনি মুহ্যমান। রোকেয়া বেগম শুনাচ্ছিলেন সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা।

মৃত্যুর সংজ্ঞা আমি জানি না। তবে ২৫শে মার্চের অশুভ কালরাত আর ২৬শে মার্চ সকালে বিধ্বস্ত ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমারই চোখের সামনে গুলি খেয়ে ঢলে পড়েছিলেন ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব। হানাদার পাকিস্তানী সেনারা তাঁকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। অথচ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাদেরকে তিনি বাবা বলে সম্বোধন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন তাদের আগমনের হেতু। টুকরো টুকরো কথায় জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে বর্ণনা করেছিলেন বেগম সুলতানা।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় ডক্টর দেব সুস্থ ছিলেন না। ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা থেকে পায়ে ব্যথা নিয়ে ফিরেছিলেন। মার্চ মাসে দাঁতে ব্যথা হল। ব্যথা শেষ পর্যন্ত গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত ডক্টর দেব কখনও রাজনীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না, কিন্তু মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁকে কখনও কখনও বিচলিত হতে দেখা যেতো। বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি শব্দটিকে তিনি স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করতেন। ২৩শে মার্চ ছাত্রলীগ নেতা জনাব আবদুল কুদ্দুস

মাখন ডক্টর দেবের সাথে দেখা করতে এলে তিনি স্বাধীন বাংলার পতাকা কিনতে নিজ থেকেই টাকা দিয়েছিলেন। পরে হাসিমুখে বলেছিলেন, 'এবার দেশের কিছু একটা হবেই।'

২৫শে মার্চের বিকেলে অন্যান্য দিনের মতই তিনি পদব্রজে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাত আটটার সময় ঘরে এসে পড়তে বসলেন। স্বাস্থ্য ভালো নেই বলে আমি সকাল সকাল শুয়ে পড়তে বললাম। আমার স্বামী মরহুম মোহাম্মদ আলী ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। আমি বি.এড. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমার কর্মক্লান্ত স্বামী আর অসুস্থ ডক্টর দেব তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাত তখন প্রায় এগারোটা। হঠাৎ গুলির শব্দে আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেয়ে আমার স্বামীকে ডাকলাম। আমরা তখন জগন্নাথ হলের সামনে একতলা এক কোয়ার্টারে থাকতাম। বাবা থাকতেন মাঝের ঘরে, আর আমরা থাকতাম শেষের ঘরটাতে। গুলির শব্দে স্বামীকে ডাকতেই তিনি উঠে বসলেন। ঠিক এই মুহূর্তে প্রবল ভূমিকম্পের মতই আমাদের বাসার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগলো। থর থর করে কাঁপতে থাকে বাসাটা। চারদিক থেকে আগত গুলিবৃষ্টি আমাদের বাসাটাকে ঝাঁজরা করে দিচ্ছিল। আমি আর আমার স্বামী বাচ্চাকে বুকের মাঝে নিয়ে বুকে হামা দিয়ে মাঝের ঘরে ঢুকলাম। সেখানে উত্তেজনায় বাবা থর থর করে কাঁপছেন। বাচ্চাকে স্বামীর কাছে দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। উত্তেজনায় তিনি সে রাতে বেশ কয়েকবার মূর্ছা গিয়েছিলেন। শেষরাতের দিকে গুলির প্রচণ্ডতা এত বাড়লো যে, আমরা বাবাকে নিয়ে কোণের ছোট্ট ঘরটাতে আশ্রয় নিলাম। এ সময় গুলির সাথে সাথে মুখে মাইক লাগিয়ে হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করার জন্য ইংরেজিতে আদেশ দিচ্ছিল। সকাল হয়ে আসার সাথে সাথে গুলির প্রচণ্ডতা কমে আসতে লাগলো। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরে ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছিলেন বাবা। তবুও আমাকে বললেন, 'উপাসনার সময় হয়েছে। একটু স্থান করে দে, মা।' গুলির শব্দ প্রায় থেমে গেছে। মাঝের ঘরটাতে বাবার বিছানাটা ঝেড়ে উপাসনার স্থান ঠিক করে দিলাম। সমস্ত বাড়িটার 'পরে বয়ে যাওয়া গত রাতের তাণ্ডবে তখন ঘরের কোন স্থানে পা রাখা অসম্ভব। দেয়াল ফুটো হয়ে চুন-বালি খসে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঘরটা হয়তো ভেঙ্গে পড়বে।

গুলির শব্দ থেমে যাওয়াতে আমার স্বামীও বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিলেন। আমি ফ্লাস্কে রাখা গরম পানি দিয়ে কোনমতে এক কাপ চা বানিয়ে বাবার ঘরে নিয়ে এলাম। চা খেয়ে তিনি বেশ কিছুটা সুস্থ হলেন বলে মনে হয়।

শেষ পর্যায়ে অশুভ অভিশপ্ত সেই ক্ষণটার কথা বলতে যেয়ে শোকার্ত দেখালো বেগম রোকেয়াকে। চার বছরের বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, আমার বাবুও জানে তার দাদুর মৃত্যুর ক্ষণটাকে। ও তখন আমার কোলে বসে ছিল। ওর সামনেই হানাদার দস্যুরা ওর বাবাকে, ওর দাদুকে হত্যা করেছে। আজও সবসময় ও সে কথা বলে আর প্রতিশোধ নিতে চায়।

২৬শে মার্চের সেই অভিশপ্ত সকাল। জগন্নাথ হলের সামনে শুধু সৈন্য আর সৈন্য। মাঠের মাঝে ফেলে রেখেছে রাতের হামলায় আহত ও নিহতদের দেহ। আশপাশের বাড়ি থেকে অত্যাচারিত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা সবাই মাঝের ঘরটিতে জড় হয়েছি। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজায় আঘাত পড়লো- 'মালাউন কি বাচ্চা দরওয়াজা খোল দো।' আদেশ নয় যেন বাঘের হুঙ্কার।

ভয়ে উত্তেজনায় বাবা আবার উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিলাম। দরজায় ততক্ষণে লাথির পর লাথি মারছে ওরা। আমার স্বামী বাচ্চাকে আমার কোলে দিয়ে বাবাকে সামলে রাখতে বলে চলে গেলেন দরজা খুলতে। তিনি দরজার কাছে যেতেই দরজাটি ওদের লাথির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়লো তার গায়ে। তিনি উঠে দাঁড়াতেই একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে তাঁকে আঘাত করলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দূর থেকে একটা গুলি এসে তাঁর বুকে বিঁধতেই তিনি ছুটে সরে এলেন কয়েক পা। তারপর লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। আমরা মাঝের ঘরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি, বাবা আর আমার খুকু। ঠিক এমনি মুহূর্তে শান্তভাবে বাবা বললেন– 'বাবারা কি চাও এখানে?' ব্যাস, এই ছিল তাঁর শেষ কথা। বাবার কথা শেষ না হতেই ওরা গুলি করেছিল। দুটো গুলি লেগেছিল কানের পাশ দিয়ে মাথার মধ্যে, আর অনেকগুলি বিঁধেছিল তাঁর বুকে। চোখের পলকে লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। আমাকেও ওরা রাইফেল দিয়ে মারলো। বার বার প্রশ্ন করতে লাগলো আমাদের ঘরের রাইফেলগুলো কোথায়। বাবার মৃতদেহটাকে ওরা বেয়নেট দিয়ে বারে বারে বিদ্ধ করে বিদ্রূপ করতে লাগলো। বুটের আঘাতে ক্ষত–বিক্ষত করতে লাগলো তাঁর পবিত্র দেহটাকে। মানসিক বিপর্যয়ে বাচ্চাটাকে বুকে চেপে একবার শুধু চীৎকার করে উঠেছিলাম– 'আল্লাহ্'। জানি না সে কারণেই কিনা, আমাকে ওরা মারলো না। শুধু আমার স্বামীর আর বাবার দেহটাকে নিয়ে গেল হলের সামনের মাঠে সাজিয়ে রাখা শত শত শহীদের মাঝে।

[দৈনিক বাংলা থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সংকলিত]
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে,
ডঃ মযহারুল ইসলামসম্পাদিত,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা
পৃষ্ঠা ৯৩—৯৬।

২৫শে মার্চের কালো রাতে জগন্নাথ হল
গোপাল কৃষ্ণ নাথ

কত মার্চ মাস এসেছে এবং কত মার্চ মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে, কেউ তার হিসেব রাখেনি বা রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু ১৯৭১–এর মার্চের কথা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ কোন দিন ভুলতে পারবে না। এই মার্চের সেদিনের বাংলার গণবিপ্লব লাভ করেছিল সর্বোচ্চ ভরবেগ, শুরু হয়েছিল বাঙালীর স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, উড়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল–সবুজ পতাকা। গণবিপ্লবের জোয়ারে যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকবর্গের

বালির বাঁধ। এই মার্চেই মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার হার মানিয়েছিল আদিম যুগের বর্বরতাকেও। এই মার্চেই রক্তপিপাসু পাকিস্তানী হায়েনার দল রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী নরনারীর উপর, ওরা মেতেছিল বাঙালীর রক্তে হোলি খেলায়, তাই এই মার্চকে ভোলা যায় না, ভোলা সম্ভব নয়।

এই মার্চেরই ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও ঢাকার বুকে নেমেছিল ছোট-বড় অসংখ্য গণমিছিল, বসেছিল গণসঙ্গীতের আসর। মহল্লায় মহল্লায় চলেছিল আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহড়া, ঐ মহড়ায় অংশগ্রহণকারীদের একটা বিরাট অংশ ছিল মেহনতি মানুষ। এমনি এক মহড়ার জন্যই সেদিন বিকেলেও জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো হয়েছিল একদল কষ্টক্লিষ্ট মানুষ। অন্তহীন উদ্যমে চলছিল কুচকাওয়াজ। এদের বেশির ভাগই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। ওদের শীর্ণ হাত-পা বহন করছিল পুষ্টিহীনতার স্বাক্ষর। দেখে মনে হচ্ছিল না দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ওড়াই গড়ে তুলবে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য ব্যূহ একদিন। কিন্তু ওদের মুখে ছিল সুদৃঢ় প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ, চোখে ছিল স্বাধীনতার অনির্বাণ শিখা। সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত-এই আশাতেই স্পন্দিত হচ্ছিল ওদের হৃৎপিন্ড। ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিল বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু সে মুহূর্তে বোধ হয় ওদের কেউ ভাবতেই পারেনি যে, কয়েক ঘন্টা পরেই বর্বর হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের উপর, জ্বালিয়ে দেবে ওদের যথাসর্বস্ব, আর ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাই হবে এদেশের স্বাধীনতার পূত মোহশিখা। সেদিন হয়তো ওরা ভাবেনি পরিবার-পরিজনসহ চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে ওদের অনেককে। প্রতিদিনের মত সেদিনও সূর্য যথানিয়মে অস্ত গেল পশ্চিম আকাশে। ঢাকার বুকে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। কর্মক্লান্ত মানুষ ফিরে গেল নিজ নিজ ঘরে। কলকোলাহল মুখরিত ঢাকা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লো নিস্তব্ধতার কোলে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে বসলাম। রাত তখন আনুমানিক বারোটা। চারদিক থেকে বিরাট হৈ চৈ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা এসে মাথায় ভিড় জমালো। একটা আসন্ন বিপদের আশংকায় রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম।

জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষক হয়ে তখন সপরিবারে গৃহশিক্ষকদের পুরাতন বাসভবনের নীচতলায় থাকি। আমার শ্যালক মানিক তখন ড্রইংরুমে পড়ালেখা করছিল। অন্যান্য সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মানিককে নিয়ে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলে বাইরে গেলাম। হল থেকে উত্তর দিকে বের হবার রাস্তায় পূর্ব পাশে ছিল একটা পান-বিড়ির দোকান। দোকানী ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দোকানের পাশ দিয়ে হলের মাঠ থেকে শামসুন নাহার হলের গৃহশিক্ষকদের বাসভবন পর্যন্ত জলের পাইপ বসানোর কাজ অত রাত্রিতেও চলছিল। ঠিকাদারের বেশ কয়েকজন লোক পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে রাস্তা কেটে পাইপ বসাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে গিয়ে চারদিকের হৈ চৈ শব্দের কারণ জিজ্ঞেস করলুম। কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন কিছু জানা গেল না। ওরা বিভোর ছিল নিজ নিজ কাজে। হৈ চৈ'র কারণ জানার মত সময় ওদের ছিল না। হায় অদৃষ্ট! ওরা কি কেউ তখনও বুঝতে পেরেছিল যে, ওদের জীবনের আর মাত্র ১৫/২০টি মিনিট বাকী আছে? ওদের জন্য প্রেরিত যমদূত ওদের কাছ থেকে মাত্র ২০০/৩০০ গজ দূরে ইউ. ও. টি. সি'র সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

এ সময় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে কিছু কিছু লোক ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। অনেক ছাত্রও হল ছেড়ে গিয়েছিল। মনে হয় কয়েকশ'এর বেশি ছাত্র তখন হলে ছিল না। গৃহশিক্ষকদের মধ্যে রঙলাল বাবু (বর্তমান হল প্রাধ্যক্ষ) ও পরেশ বাবু, এবং সহকারী গৃহশিক্ষক পরিমল বাবুও ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরা পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি করে নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তৎকালীন হল প্রাধ্যক্ষ স্বর্গত ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, গৃহশিক্ষক ঘোষঠাকুর মহাশয় এবং আমি থেকে গেলাম ঢাকাতেই। বিপদের আশংকা আমাদেরও ছিল। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন নাকি খণ্ডন করা যায় না। তাই এই ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কাউকে দিতে হল জীবন আর কাউকে হতে হল নৃশংস হত্যাযজ্ঞের নীরব দর্শক।

খবরাখবর জানাবার জন্য হলের দারোয়ানদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিল। এমন কি রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগিয়েও ওরা আমাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রাখার চেষ্টা করত। আমার ঘরের দরজা খোলা দেখে তৎকালীন দারোয়ান সীতানাথ, মাখন ও প্রিয়নাথ বাসায় এল। ওদের কাছ থেকে জানা গেল যে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে তারা কিছুই বলতে পারল না। হলের ছাত্রদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসার জন্য বলে পায়চারি করতে লাগলাম। একটা আসন্ন বিপদের আশংকায় এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে নিজে এগিয়ে খোঁজ নেয়ার সাহস হচ্ছিল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীতানাথ ও মাখন ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, হলের ছেলেরা হলের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় গাছের ডাল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করছে। তারা বলেছে, একটা বড় রকমের গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত স্থির করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই দারোয়ানদেরকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অবস্থা জেনে এসে সংবাদ দেয়ার জন্য বলে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকের হৈ চৈ যেন ক্রমশ বেড়েই চলছিল।

আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে কত দুশ্চিন্তা যে মাথায় এলো তার হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। অধীন আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম দারোয়ানদের খবরের জন্য। মনে হয় এবারে ২/৩ মিনিটও অতিবাহিত হয়নি। হঠাৎ কানফাটা এক বিরাট আওয়াজে মাথার কাছের জানালার সবগুলো কাচ ভেংগে পড়ে গেল। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নিচে নেমে এলাম। ছেলেমেয়েসহ অন্য সকলে চিৎকার দিতে দিতে আমার শোবার ঘরে জড় হল। প্রথমত শব্দটাকে হাতবোমার শব্দ বলে ভুল করেছিলাম। কারণ ঐ সময় ঢাকায় এরূপ বোমার শব্দ প্রায়ই শোনা যেত। কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে বেশি সময় লাগল না। স্পষ্ট শুনতে পেলুম কে যেন মাইক বা ঐ জাতীয় কিছুর সাহায্যে ঘোষণা করছে "Surrender or you shall be Killed" শব্দগুলো এসেছিল খ,.ক.উ–র দিক থেকে এবং বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না যে, জগন্নাথ হলের ছাত্রদের উদ্দেশ করেই কথাগুলো বলা হচ্ছিল। আরও দু'তিনটি গুলির আওয়াজ হল। ঘোষকের শব্দ থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, সে গাড়ির উপর থেকে ঘোষণা করছে, কারণ গড় গড় শব্দে গাড়িটা হলের মধ্যে প্রবেশ করছিল এবং ঘোষণার শব্দগুলোও পশ্চিম দিকে উত্তর বাড়িকে লক্ষ্য করে এগুচ্ছিল। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম কারা গুলি চালাচ্ছে এত

রাতে। গত কয়েকদিন ধরে যে অজানা বিপদের আশংকায় সদা সন্ত্রস্ত ছিলুম এখন আমরা সে বিপদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঘন ঘন গুলি চলতে লাগল। সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরীহ বাঙালী নর-নারীর উপর।

প্রথম গুলি চালিয়েছিল ঠিকাদারের লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। ওদের ধারণা ছিল ঐ লোকগুলো রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। মনে হয় জগন্নাথ হল এলাকায় বর্বর পাকিস্তানীদের নগ্ন হামলার প্রথম শিকার হয়েছিল এই হতভাগ্য লোকগুলিই। ক্ষনিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলুম। হিংস্র পাকিস্তানী পশুদের হাতে বিনাদোষ অসহায়ভাবে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হবে ভাবতেই যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। আমাদের বাসার পূর্ব পাশের ৮নং বাংলোতে তখন থাকতেন প্রফেসর এম.এন. হুদা সাহেব। সম্বিৎ ফিরে পেতেই সকলকে নিয়ে বাসা ছেড়ে হুদা সাহেবের বাসায় অথবা উত্তর দিকের ইশা খাঁ রোডের আবাসিক এলাকায় চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলুম। ঘোষক এতক্ষণে মাঠের শহীদ মিনারের কাছাকাছি এসে গেছে এবং ঘন ঘন হলের দিকে গুলিবৃষ্টি চলছে। এ সময় আমাদের বাসার উত্তর দিকের রাস্তা ও যানবাহন চলাচলের এবং গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রোকেয়া হল এবং শামসুন-নাহার হলের দিক থেকেও গুলির শব্দ আসতে লাগল। মনে হল কয়েকটা গুলি পূর্ব দিক থেকে আমাদের বাড়িতেও আঘাত করল। একটা দল হলের গৃহশিক্ষকদের নতুন বাড়িটি যেখানে অবস্থিত সেখানে অবস্থান নিয়ে হলের দিকে আক্রমণ চালাতে লাগল।

ঘটনাপ্রবাহ এত দ্রুত এগিয়ে চলছিল যে, কোন প্রকার সিদ্ধান্তই নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তবে বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমরা চারদিক থেকেই পাকিস্তানী দ্বারা বেষ্টিত এবং এই চক্রব্যূহ থেকে বের হবার কোন পথ খোলা নেই। তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই দুরুহ। অগত্যা ঘরের একটা নিরাপদ স্থানে সকলকে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। যাতে গুলি সরাসরি আঘাত করতে না পারে এবং মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম। মোট কথা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হাতে সপে দিলুম। আজ অবাক হয়ে ভাবি, সেদিন নিশ্চয় ভগবান আমাদের নিঃশব্দ আকুল আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন, তা না হলে এখন ১৯৮০তে বসে যেদিনের স্মৃতিচারণ করা আদৌ সম্ভব হত না।

জগন্নাথ হলে অপারেশন চালানোর জন্য পাকিস্তানীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে ৭নং বাংলোর পিছনে। ঐ সময় ৭নং বাংলোয় থাকতেন প্রফেসর নফিস আহমদ সাহেব। ওরা দ্বিতীয় অবস্থান নিয়েছিল আমাদের বাসার পশ্চিমে পাশে। কোড নম্বরের মারফতে ওরা অন্যান্যের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছিল। মেঝেতে শুয়ে শুয়ে আমরা কোড নম্বরগুলো শুনতে পারছিলাম। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর আমি আস্তে আস্তে ড্রইংরুমে গেলাম। সবগুলো জানালাই ছিল খোলা। জানালা দিয়ে হলের দিকে তাকাতে লাগলুম। গোলার আঘাতে হলের দেয়ালে আগুন জ্বলে উঠছিল। একটা প্রচন্ড গোলার আঘাতে উত্তর বাড়ির সম্মুখস্থ আম গাছের একটা বড় ডাল ভেংগে পড়ল। মাঠে মিলিটারীর গাড়ির চালানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু

অন্ধকারের জন্য মাঠের মধ্যে যেন কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

জানালায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না। আবার মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। সৈন্যদের বুটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ওরা বাসায় ঢুকে পড়ল। হঠাৎ উত্তর পাশের রোকেয়া হলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার হতে হৈ চৈ ও কান্নার শব্দ শোনা গেল, গুলির শব্দও হচ্ছিল। মনে হল পাকিস্তানী সেনা ওদের কোয়ার্টারে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। ধারণাটা আমাদের অমূলক ছিল না। সত্যি সত্যিই ঐ সময় পাক-বাহিনীর লোকেরা ওদের অনেককেই হত্যা করেছিল। আবার ড্রইংরুমে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকাতে লাগলুম। দেখলুম কে যেন মশাল নিয়ে উত্তর বাড়ির তিন তলায় দক্ষিণ দিকের করিডোরে কিছু খুঁজছে। মনে হল সৈন্যরা হলের ভিতরে ঢুকে ছেলেদের খুঁজছে। তখন চারদিকেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটে। মাঠের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হলের দারোয়ান-বেয়ারাদের ঘরগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক প্রতিহিংসায় যেন মেতে উঠেছিল বর্বর পাকিস্তানী সৈন্য। জানালা দিয়ে দেখলুম আগুনের গগনচুম্বী লেলিহান শিখায় সমস্ত মাঠ আলোকিত হয়েছে। ঐ আলোতে মাঠে সৈন্যদের চলাচল দেখতে পেলুম। আরও দেখতে পেলুম মাঠের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম জ্বলন্ত ঘরগুলির দিকে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ঘরগুলি একের পর এক। কেউ কেউ জ্বলন্ত ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে এনে মাঠে জড়ো করছিল। এদের অধিকাংশই ছিল মেয়েলোক এবং ছোট ছেলেমেয়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য গরুগুলো "হাম্বা, হাম্বা" করতে করতে ছুটে এলো মাঠের উত্তর দিকে। উত্তর বাড়ির মধ্যে সৈন্যদের যাতায়াত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণ বাড়ি থেকে ভেসে আসা শব্দে বুঝতে পারলুম পাকিস্তানী পশুর দল সেখানেও আমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এই তাণ্ডবলীলা দেখছিলুম আর অনেক কিছুই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম হলের ছাত্রদের কথা; ভাবছিলুম মাখন, রামবিহারী, সীমানাথ, ধীরেন প্রভৃতি কথা ওদের পরিজন পরিবারের কথা ভাবছিলু জ্যোতির্ময় বাবু, গোবিন্দ বাবু, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের কথা। ভাবছিলুম নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। কেন যেন মনে হচ্ছিল নিশা অবসানের সাথে সাথে হয়তো পাকিস্তানীদের ঐ তাণ্ডবনৃত্যেরও অবসান হবে। আবার ছেলেমেয়েদের মুখে দেখতে পাব মৃত্যুর বিভীষিকার পরিবর্তে বাঁচার আনন্দ। তাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলুম কখন রাত্রি শেষ হবে।

অবশেষে ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত্রির অবসান হল, পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল ২৬শে মার্চের সূর্য। কিন্তু অবসান হয় না পাকিস্তানী সেনার তাণ্ডবনৃত্যের। বরং সূর্য যতই উপরে উঠতে লাগল পাকিস্তানীদের তাণ্ডবনৃত্যও যেন ততই নারকীয় রূপ ধারণ করতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারে তাণ্ডবলীলা যেন ওদের পশুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করতে পারেনি। তাই চৈত্রের উজ্জ্বল সূর্যালোকে জগন্নাথ হলের মাঠে নিরীহ বাঙালী নিধনের তাণ্ডবনৃত্যে মেতে উঠেছিল ওরা।

অন্ধকার কেটে যেতেই আবার ড্রইংরুমের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলুম মাঠের শহীদ মিনার থেকে ১৫/২০ হাত পূর্বদিকে টারপলিন বা ঐ জাতীয় মোটা

কাপড় দিয়ে কি যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলুম মেশিনগান বা অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র ঢেকে রাখা হয়েছে। কারণ মেশিনগানের নলের মত একটা কিছু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু অচিরেই সে ভুল ভাংগল। দেখলুম একজন সিপাহী পা এবং অন্য একজন সিপাহী হাত ধরে একজন দীর্ঘাকৃতি লোককে উত্তর বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে এলো ঐ টারপলিন দ্বারা ঢাকা জিনিসগুলোর কাছে। ওকে তখনও জীবিত বলে মনে হল। দেহটা মাটিতে রাখার পর তার পা নড়ছিল বলে মনে হল। লম্বাকৃতি ফরসা গড়ন দেখে মনে হল ও ছিল সম্ভবত মৃণাল বোস। ওরা ওকেও টারপলিনের নিচে রাখল। টারপলিনের নিচে আরও বেশ ক'জনকে দেখা গেল। এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল টারপলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হেয়েছে যুদ্ধাস্ত্র নয়; গত রাত্রিতে ঐ যুদ্ধাস্ত্রের শিকার জগন্নাথ হলের নিরীহ ছাত্রদেরকে–যাদের অনেকেই হয়তো তখনও জীবিত ছিল। আরও বুঝতে পারলুম যে ওরা মৃত বা জীবিত সকলকেই এভাবে মাঠে নিয়ে আসবে। নিজের পরিবারের লোকের কথা ভাবতেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সকলের সাথে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম।

এদিকে চলমান গাড়ি থেকে বারবার প্রচারিত হতে লাগল পতাকা নামিয়ে ফেলুন। নইলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হবে। ঐ সময় প্রায় সকল বাড়ির উপরই উড়ছিল কালো পতাকা বা 'জয় বাংলা' পতাকা। আমাদের বিল্ডিং–এর উপর ছিল কালো পকাতা। অতি সন্তর্পণে নামিয়ে আনা হল পতাকা। ঘরে ছিল 'জয় বাংলা' পতাকা। নষ্ট করে ফেলা হয় ওটা।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উত্তর পাশের রাস্তার দিকে তাকাতেই যা দেখতে পেলুম তাতে শরীরের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দেখলুম ১৫/১৬টি মৃতদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছে। কি ভয়াবহ নৃশংসতা। ২/৩ মিনিট যেন পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বেলা ক্রমেই বেড়ে চলছে। কখনও বাথরুমের ভেনটিলেটরের মধ্য দিয়ে U.O.T.C-র সম্মুখস্থ রাস্তায় মিলিটারী যানবাহনের চলাচল লক্ষ্য করছি, আবার কখনও জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু বেশিক্ষণ জানালার কাছে দাড়াতে সাহস হচ্ছিল না। অধিকাংশ সময়ই অন্যান্যদের সাথে মেঝেতে শুয়ে কাটাচ্ছিলুম। মাঠের দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকজন পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে ছিল। গত রাত্রে এদেরই ঘরদোর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। একবার লক্ষ্য করলুম ৪/৫ জন সিপাহী ৩/৪ জন সাধারণ লোককে নিয়ে খ,.ক.উ–র দিক থেকে মাঠে প্রবেশ করল এবং ওদেরকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের লোকগুলোর নিকট গেল এবং প্রায় সবগুলো পুরুষ লোককে নিয়ে ইণবঠফহ–র দিকে গেল। ওদেরকে দিয়ে বিভিন্ন স্থান থেডক মৃত এবং আহত লোকগুলোকে মাঠে আনা হয়েছিল।

বেলা আনুমানিক দশটা। ভেনটিলেটরের মধ্য দিয়ে U.O.T.C-র দিকে তাকিয়ে আছি। Medical College-এর দিক থেকে একটা মিলিটারী জিপ এসে U.O.T.C-র সামনে দাঁড়ালো। সঙ্গে ছিল একটা কি দুটো সৈন্য বোঝাই ট্রাক। জিপ থেকে একজন অফিসার বের হয়ে মাঠের দিকে লক্ষ্য করে একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে একটা গুলির আওয়াজ হল এবং Assembly-র দিক থেকে ভেসে

এল অনেকগুলো স্ত্রীলোকের কান্না ও আর্তনাদের শব্দ। দেখলুম ৩/৪ জন সিপাহী মাঠ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর অপেক্ষমান ট্রাকে উঠল এবং জিপ ও ট্রাকগুলো রোকেয়া হলের দিকে চলে গেল।

আমিও তাড়াতাড়ি ড্রইংরুমে গেলুম এবং জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাতেই যে নারকীয় দৃশ্য চোখে পড়ল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঘটনার নৃশংসতা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়লুম। অন্যান্যরা তখনও ঘুমাচ্ছিল। মানিককে জাগিয়ে তুললুম এবং এক গ্লাস জল খেলাম। কয়েক মিনিট পর মানিককে নিয়ে আবার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। রাত্রিতে যেখানে কতকগুলো মৃতদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছিল সে বরাবর উত্তর-দক্ষিণে পড়ে আছে আরও অনেক লোক। মনে হল লোকগুলোকে উত্তর-দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে গরুর 'হাম্বা' রব আর কাকের কা কা শব্দ ভিন্ন অন্য কোন জনপ্রাণীর কোনরূপ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না- এখন সেখানকার আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছিল পাকিস্তানী পশুদের শিকার নিরীহ মৃত্যুপথযাত্রী বাঙালীর আর্তনাদে। হ্যাঁ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পশুর চেয়েও অধম ছিল, কেননা কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে অন্য মানুষের উপর এমন বীভৎস ও জঘন্য অত্যাচার চালানো সম্ভব নয়। যাদের গুলি করা হয়েছিল তাদের অনেকেই তখনও জীবিত ছিল। 'জল-জল' চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। কি ভয়ংকর দৃশ্য! দু-এক জন দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল। কেউ কেউ ২/৩ পা হেঁটে গিয়ে আবার ঢলে পড়ছিল মাটিতে। কেউ কেউ মাথা উঁচু করে চারদিকে তাকাচ্ছিল। তখন মাঠে কোন সৈন্য ছিল না। শুধু দক্ষিণ দিকে কতকগুলো স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ওদের আত্মীয়-স্বজন ছিল ঐ মৃত ও আহতদের মধ্যে। আহতদের মধ্য থেকে হঠাৎ ২/৩ জন উঠে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে গেল এবং ২ জন দৌড়ে এল আমাদের বাসার দিকে। একজন 'স্যার, স্যার' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকের দরজা খুলে ওকে সাহায্য করার সাহস হল না। লোকটা দৌড়ে বাড়ির পূর্বদিকে গেল। আমরাও ছুটে গিয়ে পূর্বদিকের দরজা খুলে দিলুম কিন্তু লোকটার আর কোন সারাশব্দ পাওয়া গেল না। এই লোকটিই ছিল হেমলাল মালী। সে আজও বেঁচে আছে। আমাদের কোন সাড়া না পেয়ে সে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

আবার ফিরে গেলুম জানালায়। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম মাঠের মানুষগুলোর দিকে। যতদূর গুনতে পেরেছিলাম তাতে লোকগুলোর সংখ্যা ৮০-এর মত মনে হল। তবে স্তূপের মধ্যে অনেক দেহ ছিল। কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল হয়তো আমাদেরকেও ওখানে নিয়ে এভাবে গুলি করে মারবে। দেখলুম কয়েকজন স্ত্রীলোক ২/৩ জনকে দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ছিল হয়তো ওদের আপনজন এবং তখনও জীবিত ছিল। কাছাকাছি যখন কোন পাক-সৈন্য দেখা যাচ্ছিল না, তখন মেয়েলোকগুলো জল খাওয়াচ্ছিল। সবই নাকি ভগবানের লীলাখেলা, আর সেটাই বোধ হয় পরম সত্য-নইলে এই মানবনিধনযজ্ঞ থেকে আমরাই বা বেঁচে থাকলুম কিরূপে।

বেলা আনুমানিক তিনটে। হঠাৎ শুনতে পেলুম কে যেন কাতরাচ্ছে 'স্যার জল, স্যার জল।' দরজার কাছে এগিয়ে বুঝতে পারলুম শব্দটা আসছে তেতলার সিঁড়ির কাছ থেকে। মনে হল গুলির আঘাতে আহত কোন ছাত্র পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। কিন্তু নিচতলা থেকে তাকে কোন জল দেয়া বা সাহায্য করা সম্ভব হয় না। কারণ উপরে যাওয়ার জন্য দরজা খুললেই মুসলিম হলের গেট পর্যন্ত দেখা যায় এবং তখনও আমাদের পাশের রাস্তা দিয়ে মিলিটারির টহল চলছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ লোকটি হলেরই ছাত্র ছিল। আঘাত লেগেছিল তার হাতে এবং রক্তক্ষরণের দরুন সে মারা যায়। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন এটা শ্মশানভূমিতে নীরব দর্শকরূপে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, চারদিকে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। বেলা চারটের দিকে মাঠে প্রবেশ করল একটা বিরাট বুল ডোজার। মৃতদেহগুলি যেখানে পড়ে ছিল তার পাশ ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে খোঁড়া হতে লাগল একটা গর্ত। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না যে, ঐ গর্তেই মাটি চাপা দেয়া হবে ঐ লোকগুলোকে যাদের মধ্যে ছিলেন হলের প্রভোষ্ট স্বর্গত ডঃ গোবিন্দ দেব, সহকারী গৃহশিক্ষক স্বর্গত অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, দারোয়ান প্রিয়নাথ ও দুখীরাম এবং হলের অনেক ছাত্র। হায় জগন্নাথ হল। পাক বাহিনীর মৃত্যুছোবল হতে আত্মরক্ষার মত নিরাপদ আশ্রয় সে দিতে পারেনি এ মানুষগুলোকে। কিন্তু হলের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল সেটা ছিন্ন করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি বর্বর পাক বাহিনীর পক্ষে। তাই মৃত্যুর পর এরা চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জগন্নাথ হলের কোলে, হলের মাঠে।

সাড়ে ৫ টার দিকে ডইং রুমের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলুম গর্ত খোঁড়া হয়েছে, পাশেই রয়েছে উঁচু মাটির স্তূপ। লোকগুলোর মধ্যে তখনও কেউ কেউ জীবিত ছিল। বুল্‌ডোজারটি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল একজন সিপাই। হঠাৎ নজর পড়ল একজন সৈনিকের উপর। সে আমার জানালা থেকে ১০/১২ হাত দূরে বাসার দক্ষিণ পাশের বেড়া ঘেঁষে আমাদের বাড়ির দিকে একটা মেশিনগান তাক করিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো সৈনিকটি হয়তো আমাকে দেখে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে গিয়ে খাটের নিচে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। আবার বুল্‌ডোজারের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ আমাদের কানে বাজছিল আশু মৃত্যুর ধ্বনিরূপে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মনে মনে ভাবছিলুম আমাদেরকেও নিয়ে ওদের সাথে মাটিচাপা দেয়া হবে। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে সেদিন এত বিপদের মধ্যেও চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি। কিন্তু ১০ বৎসর পরে আজ সেদিনের কাহিনী লিখতে বসে দেখছি দুই চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

এ সময় মাঠের মধ্যে ট্রাক জাতীয় ভারী যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এ সকল যানবাহনে করে চারদিক থেকে আরও মৃত বা আহত লোকদের মাঠে আনা হচ্ছিল। আমরা সকলে ভিতরের ঘরের খাটের নিচে মেঝেতে গাদাগাদি করে পড়ে ছিলাম। সারাদিন খাবারের মধ্যে ছিল মুড়ি আর জল। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন ছিল রেডিও। কানের সাথে রেডিও ঠেকিয়ে শুনলাম বি.বি.সি'র খবর এবং অন্যান্য স্টেশনের খবর। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিরও একটা আন্দাজ করা গেল। এ সময় ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হল শনিবার

সকাল ৮ টায় কারফিউ তুলে নেয়া হবে। হিসেব করে দেখলুম আর ১২/১৩ ঘন্টা বাকি। আরও মনেপ্রাণে ভগবানকে ডাকতে থাকলুম। রাত আনুমানিক ৮টা। মাঠ থেকে বুলডোজার ইত্যাদি যানবাহন বের হয়ে গিয়েছে, কারণ ওগুলোর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। বুঝলুম মটিচাপা দেয়ার কাজ শেষ হয়েছে। পাকিস্তানীরা ধর্ম নিয়ে বড়াই করত। কিন্তু সেদিন কি দেখলুম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম মৃত-জীবিত সকলকে ওরা বুলডোজারের আঘাতে একই গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিল। মৃতের দাফন বা সৎকারের কোন ধর্মীয় আচারের ব্যবস্থা কি সেদিন করেছিল ঐ পাকিস্তানী বর্বরের দল? অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আজও ওরা জোর গলায় প্রচার করছে- ওদের মত ধর্মভীরু জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের রাস্তায় বুলডোজারের শব্দ শোনা গেল। শামসুন নাহার হলের গেটের সামনে গর্ত করে অনেকগুলো লোককে মাটিচাপা গেয়া হল। কাজটি চলল রাত ১০টা পর্যন্ত।

রাত বাড়তে লাগল। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কখন রাত শেষ হবে। এক একটা মিনিট এক একটা ঘন্টার মত মনে হচ্ছিল। রাত একটার দিকে আবার বুলডোজার অন্যান্য যানবাহনের সাথে মাঠে ঢুকল। মনে হল মাঠে আর একটা গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বুলডোজার বেড়া ভেঙ্গে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাত আনুমানিক চারটার দিকে বুলডোজার আর অন্যান্য যানবাহন মাঠ ছেড়ে চলে গেল। আমরাও অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগলুম। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে মিলিটারীর গাড়ির চলাচলের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে ২৭শে মার্চ শনিবারের ভোরের আবির্ভাব ঘটল। জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকালুম। সেখানে কোন সৈন্য দেখা গেল না। যেখানে মৃতদেহগুলো মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল সেটা দেখা গেল। বেলা বাড়তে থাকল।

রেডিওতে আবার ঘোষণা করা হল-৮টা থেকে কারফিউ উঠে যাবে। ৮টা বাজল। কিন্তু বাইরে কোন লোকজন দেখা গেল না। সাড়ে ৮টার দিকে একটা লোককে মেডিক্যাল সেন্টারের নিকটে রাস্তা পার হতে দেখলুম। দক্ষিণ দিকের দরজা খুলে ছোট্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। মনে হল যেন পুনর্জন্ম পেয়েছি। যাদের মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল তাদের দু-একটা হাত-পা উপরে দেখা যাচ্ছিল। একটা লোক এসে কেঁদে পড়ল--ওর পরিবারের কারও খোঁজ নেই। ধীরেন এসে জানাল ডঃ গুহঠাকুরতা আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন, গোবিন্দ বাবু বেঁচে নেই, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য নেই। নেই প্রিয়নাথ এবং আরও অনেকে। হুদা সাহেবের বাসার কাজের ছেলেটি এল আমাদের খোঁজ নিতে। আরও অনেকের নিহত ও আহত হওয়ার কথা শুনলুম। ইতিমধ্যে বহু লোক মাঠে ভিড় করেছে। হতভম্বের ন্যায় সবকিছু দেখছিলাম। আর শুনছিলাম। সম্বিৎ ফিরে পেলুম বড় ছেলে সমীরের ডাকে। সে বলল, বাসায় আর এক মিনিটও থাকা নিরাপদ নয়। পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে গেলাম পাশের কলোনীতে। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আজও জানি না। কেন সেদিন পাকিস্তানী সৈন্য জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষকদের বাসভবনে ঢোকেনি?

(বাসন্তিকা, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা
১৯২১-১৯৮১, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পৃষ্ঠা ২৪৪—৫৫।)

পঁচিশে মার্চে জগন্নাথ হলের সেই
ভয়াল রাতের স্মৃতি
কালীরঞ্জন শীল

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। এ দিনটির কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রতিবছর মার্চ মাস আসে আর মনেপড়ে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাতটির কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উপর পাক বাহিনীর বর্বর হামলার আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেদিন জীবনটা যেতে যেতেও রয়ে গেছে কোন রকমে। ভাবতেও অবাক লাগে ... আমি বেঁচে থাকব, বেঁচে আছি। এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। এ কি সত্যি, না স্বপ্ন, না কোন ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি। আমি থাকতাম জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনের দ্বিতলে,২৩৫ নং কক্ষে। মার্চের শুরুতেই ঢাকা শহর উত্তপ্ত ছিল। ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতগতিতে এগুচ্ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানুষ নতুন নতুন খবর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। শহরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঐ দিনটিও গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি সমস্ত দিন মিটিং, প্যারেড, মিছিল করে রাত ১০টার দিকে হলে ফিরলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। হঠাৎ মাথার কাছাকাছি বোমার এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সজাগ হয়েই শুনি চতুর্দিকে শুধু গগনবিদারী টর-টর-টর শব্দ আর মাঝে মাঝে সে শব্দকে ছাপিয়ে গুর-গুর-গুরুম শব্দ এবং দালানকোঠা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল হলের পুরান দালান বুঝি এক্ষুণি ভেঙ্গে পড়বে। এমন গোলাগুলির শব্দ জীবনে শুনিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। এ অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম। কী করা দরকার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। সঠিক কিছু স্থির করতে না পেরে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নুয়ে নুয়ে দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠলাম। সেখানে সিঁড়ির কাছে আরো কয়েকজন ছাত্র জড়ো হয়েছিল আগেই। সুশীলকে খুঁজছিলাম। দেখলাম তিনতলার সিঁড়ির কাছে তার রুম তালাবদ্ধ। সুশীল ছিল আমাদের হলের সহ-সম্পাদক। পরে শুনেছি সে গোলাগুলির শুরুতেই মেইন বিল্ডিংয়ে (উত্তর ভবনে) চলে গিয়েছিল এবং সেখানে মারা গেছে। কেউ কেউ ছাদে ওঠার কথা বললো আমাকে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে আমি তিনতলার বারান্দা দিয়ে নুয়ে নুয়ে উত্তর দিকের লেট্রিন ও বাথরুমের কাছে গেলাম। দেখি উত্তর বাড়ির সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারি হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলি করে মারছে। এক-একটা ব্রাশ ফায়ার করছে আর চিৎকার করে কতকগুলি তাজা প্রাণ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করতেই তাকে সে অবস্থায় গুলি করে মারছে। এখনও ভাবতে পারি না এ দৃশ্য-এতো বাস্তব ও

জীবন্ত, তবু মনে হয় স্বপ্ন। মাঝে মাঝে দালানের উপর ভারী কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। কোন কোন স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এ সময় এসেম্বলির সামনে ডাইনিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উপর থেকে নিচে সবুজ ও লাল রংয়ের আলোর গোলা নামতে দেখছি। তখন চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। সেই আলোতে দেখা গেল উত্তর বাড়ির সামনের মাঠে শত শত মিলিটারী মেশিনগান ও ভারী কামানের গোলাগুলি বর্ষণ করছে নির্বিচারে। এক সময় দেখলাম এক-একটি গাড়ির বহর হেড লাইট বন্ধ করে থেমে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে আবার চলে যাচ্ছে। সম্ভবত দেখে নিচ্ছে ঠিক ঠিক গুলি হচ্ছে কিনা, মানুষ মরছে কিনা। হঠাৎ এক সময় দেখা গেলো সলিমুল্লাহ্ হলের দিক থেকে ৪০/৫০ জন মিলিটারী দক্ষিণ বাড়ির ঘরের দিকে এলো এবং দরজা ভেঙ্গে খাবার ঘরে ঢুকল। খাবার ঘরে আলো জ্বালাল এবং এলোপাতাড়ি জানালা-কবাটের উপর গুলি ছুড়তে লাগল। কয়েকজন চিৎকার করে মারা গেল বুঝতে পারলাম। এমন সময় দক্ষিণ বাড়ির দারোয়ান প্রিয়নাথকে নিয়ে বেরিয়ে এলো মেশিনগানের মুখে। তাঁকে দিয়ে হলের মেইন গেট পশ্চিম দিক দিয়ে খুলিয়ে ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে। তখন আমি মিলিটারীদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রথমে লেটিনে ও সেখান থেকে জানালা পেরিয়ে তিনতলার কার্নিশে গেলাম ও শুয়ে পড়লাম। সেখানে কয়েকটি শালগাছ ছিল। একটি মোটা ডাল (শাখা) কার্নিশের কাছে নুয়ে ছিল। একবার ভাবলাম গাছে উঠি । শেষ পর্যন্ত গাছে না উঠে কার্নিশেই শুয়ে পড়লাম। হলের মধ্য থেকে শুধু গুলির শব্দ আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। একতলা, দোতলা করে এভাবে ওরা তিনতলায় উঠলো বুঝলাম। এক সময় আমার কাছেই কয়েকটা গুলির শব্দ হল। আমার মাথা সোজা দেওয়ালের বিপরীত দিকে একটা লোক গোঙাচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি তখন ভাবছি কখন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাকে ওরা দেখেনি বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ওরা নেমে গেল। নিচ থেকে 'ফরিদ' বলে ডাক দিল। একজন সৈন্য সাড়া দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। যেভাবে ছিলাম সেভাবে শুয়ে থাকলাম কিছু সময়। এক সময় কার্নিশ থেকে উঠে এসে আবার লেটিনে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে উত্তর বাড়ি, তার সামনে মাঠ ও সলিমুল্লাহ্ হলের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে মিলিটারীর তান্ডবলীলা দেখতে লাগলাম আর কখন এসে আমাকে ধরে নিয়ে গুলি করবে সেই মুহূর্ত গুনতে লাগলাম। এক সময় দেখা গেলো সলিমুল্লাহ্ হলের দিকে আগুন। সলিমুল্লাহ্ হলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বড় একটি গাছেও আগুন জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উত্তর বাড়ির পশ্চিম দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠছিল। আর বুঝতে পারছিলাম ঐদিকে কোথাও আগুন লাগিয়েছে পাক-সেনারা। বাইরের মত হলের মধ্যেও চললো সারারাত গোলাগুলি আর আগুন। এক সময় কোন একদিকে আযানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকদিকে আযান শোনা গেল। মনে হলো আযানের এমন করুণ সুর, এত বিষণ্ণ সুর আর কোনদিন শুনিনি। গোলাগুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধ ছিল মুহূর্তের জন্য মাত্র। আবার চললো গোলাগুলি পুরোদমে। ভোরের দিকে মাইকে কার্ফু জারির ঘোষণা শুনলাম। তখন ভাবলাম বেলা হলে বোধ হয় এমন নির্বিচারে আর মারবে না। কিন্তু একটু ফর্সা হয়ে যেতেই দেখা গেলো এখানে সেখানে পালিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে এনে গুলি করছে। যেন দেখতে না পায় আমাকে এভাবেই মাথা নীচু করে লেটিনের মধ্যে বসে রইলাম। বেলা হল। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায়

অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি লেট্রিনের দরজা খুলে বেরুলাম। বেরিয়েই দেখি সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে। আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেষ্টা করছে। রাতে আমার কাছে দেয়ালের ওপাশে যে গোঙাচ্ছিল এটা তারই লাশ। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের হলের দারোয়ান, সবার প্রিয়নাথদা। তাঁকে দিয়ে মেশিনগানের মুখে সব পথ দেখে দেখে নিয়ে নামার মুহূর্তে এখানে গুলি করে রেখে গেছে। আমিও আর নিষ্কৃতি পেলাম না। আমাকেও ধরতে হলো লাশ। তিনতলা থেকে দোতলা, সেখান থেকে একতলা এবং দক্ষিণ দিকের ভাঙা গেইট দিয়ে ব্যাংকের (এখন যেটা সুধীরের কেন্টিন ওটা ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান) উত্তর পাশে নিয়ে রাখলাম। আরো লাশ জড়ো করা হলো সেখানে। ওখানে আমাদের বসার নির্দেশ দিল একজন পাকসেনা।

তখন ছিলাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন মালী, লন্ড্রীর কয়েকজন দারোয়ান, গয়ানাথের দুই ছেলে শংকর ও তার বড় ভাই, আর সবাই ছিল সুইপার। লাশগুলির পাশ ঘিরে আমরা সবাই বসে ছিলাম। সুইপার' ওদের ভাষায় মিলিটারীদের কাছে অনুরোধ করছিল ওদের ছেড়ে দেবার জন্য। বলছিল, ওরা বাঙালী নয়। সুতরাং ওদের কি দোষ? একজন মিলিটারী ওদের আলাদা হয়ে বসতে বললো আমাদের কাছ থেকে। ওদের নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী সোজা উত্তর বাড়ির মাঠে চলে গেল। ভাবলাম ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আবার ঐ লাশগুলো বহন করার আদেশ দিল। লাশগুলি নিয়ে এসেম্বলির সামনের রাস্তা দিয়ে সোজা পূর্ব দিকের গেটের বাইরে চলে গেলাম। গেটের বাইরে দক্ষিণ পাশে একটি বড় গাছের গোড়ায় জড়ো করলাম লাশগুলো। এই সময় আমাদের সাথে প্রায় সমান সংখ্যক মিলিটারী ছিল। তারা সবাই ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওখানে যেয়ে মিলিটারীরা দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। একজন সিগারেট বের করে দিল সবাইকে। আমাদের কেউ বসে, কেউ শুয়ে থাকলো। আমিও কাত হয়ে ছিলাম গাছের শিকড়ের উপর। এখানে পাক– সেনারা আমাদের উদ্দেশে বিশ্রী ও অকথ্য ভাষায় ক্রমাগত গালাগালি করছিল। যতটা বুঝতে পারছিলাম তাতে বুঝলাম, শালা! বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব। বল একবার শালারা জয় বাংলা। শেখ মুজিবকেও বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব। আরো নানা অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিল। এ সময় একটি গাড়ির বহর রেসকোর্সের দিক থেকে এসে ওখানে থামল। আমাদের সাথের মিলিটারীর একজন সামনের একটি জীপের কাছে গেল। তাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হলো বুঝলাম।

সেখান থেকে আমাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেলো লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেলো ডঃ গুহঠাকুরতা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিং–এর সিঁড়ির কাছে অনেকগুলি লাশ পড়ে ছিল। সিঁড়ির কাছে এনে গুলি করেছে বোঝা গেল। একটি লাশ দেখলাম সাদা পাজামা– পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টুপি, পাতলা চেহারা। সেখান থেকে নিয়ে গেলো দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় লাশ বয়ে আনতে। প্রতিটি তলায় ওরা খোঁজ নিচ্ছিল কোন জীবিত প্রাণী আছে কিনা। আর খুঁজছিল দামী মালামাল, ঘড়ি, সোনাদানা ইত্যাদি। চারতলায় একটি রুমে ঢুকতে পারছিল না। কারণ রুমের দরজা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। দরজা ওরা ভেঙ্গে ফেলল। ঢুকে কাউকেই পাওয়া গেল না। কতকগুলি

এলোমেলো কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেখানে। একজনকে ছাদে উঠে কালো পতাকা এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা নামাতে বলল। পতাকা নামিয়ে আনলে মিলিটারীদের একজন নিয়ে নিলো সেগুলো। আমাদের নিচে নামতে বললো। নিচে নামলাম আমরা। সিঁড়ির কাছের লাশগুলো নিতে বললো। অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলি জড়ো করলাম এগুলির পাশে। পরে নিয়ে গেলো ঐ বিল্ডিং এর সামনে দোতলা বাংলা বাড়িটিতে (তখনকার এস.এম.হলের প্রভোষ্টের বাড়ি)। সামনে দিয়ে ঢুকতে না পেরে পিছন দিয়ে ঢুকলাম ঐ বাড়িতে। নিচতলা, দোতলার সবগুলি রুমেই খুঁজলাম। এলোমেলো কাপড়-চোপড়, সুটকেস, বাক্স, খোলা ফ্যান ছাড়া কিছুই দেখা গেল না সেখানে। মিলিটারীরা দামী জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিয়ে নিলো। কোন লাশ কিংবা রক্তের দাগ ছিল না ঐ দালানে। নেমে আসলাম আমরা সবাই এবং জড়ো হলাম আবার লাশের কাছে। মিলিটারীরা কালো পতাকা এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা পোড়ালো। আমাদের আবার লাশ নিতে বললো। রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর দিকে অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের বাসার সম্মুখ দিয়ে ইউ.ও.টি.সি. বিল্ডিং-এর সামনে জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্ব দিকের ভাঙা দেয়াল দিয়ে ঢুকতে বললো। হলের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে শহীদ মিনারের সংলগ্ন লাশগুলির কাছে জড়ো করতে লাগলাম লাশগুলি। লাশ যখন নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম ডঃ দেবের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসছে সেলাইর মেশিন ও অন্যান্য ছোট ছোট জিনিসপত্র রাস্তার পাশে অনেকগুলি মিলিটারী ট্রাক যুদ্ধের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শিববাড়ির রাস্তার তিনমাথায় অনেকগুলি মর্টার চতুর্দিকে তাক করে রেখেছিল। দু'জন তিনজন করে আমরা এক-একটা লাশ বহন করছিলাম। কোন জায়গায় বসলে কিংবা ধীরে হাঁটলে গুলি করার জন্য তেড়ে আসছিল। সব সময়ই আমরা সবাই গা ঘেঁষে বসছিলাম ও চলছিলাম।

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। অবশ্য রৌদ্রে থাকার জন্যও হতে পারে। লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ কতকগুলি মেয়েলোক চিৎকার করে উঠলো। দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তিটির ছেলেমেয়েরা মাঠের দিকে আসতে চাচ্ছে আর পাক সেনারা মেশিনগান নিয়ে ওদের তাড়াচ্ছে। সামনে চেয়ে দেখি সুইপারদের মাঠে এনে দাঁড় করিয়েছে গুলি করার জন্য। এইসব সুইপারদেরই ব্যাংকের কাছ থেকে আলাদা করে এই মাঠে নিয়ে এসেছিল ওরা। সুইপারদের গুলি করে মারছে আর ঐ ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে এবং ছুটে যেতে চাচ্ছে ওদিকে। বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে কোরানের আয়াত পড়ছিল। ব্যাংকের কাছে যখন বসেছিলাম তখন জেনেছি এই ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জে ছিলো তার বাড়ি। আগের দিন বিকালে আর এক বন্ধু সহ এসে উঠেছিল তার হলের এক বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। আমরা কোন রকমে দুজনে লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। সামনেই দেখি ডঃ গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ। ধুতি পরা, খালি গা, ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বললো, দেবকেও মেরেছে! তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি? কি ভেবে আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশ সহ শুয়ে পড়লাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা আমার ছিলো না। চোখ বুজে পড়ে থেকে ভাবছিলাম এই

বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি করবে। এক সময় ভাবছিলাম তবে কি আমাকে গুলি করেছে? আমার তখন কোন অনুভূতি নেই। কি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। এই মরার মত অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না। এক সময় আমার মাথার কাছে ছেলেমেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সুইপার, দারোয়ান ও মালীদের বাচ্চারা ও মেয়েছেলে গুলি খাওয়া মৃত স্বামী কিংবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখনও অনেকে মরেনি। কেউ পানি চাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ পানি খাওয়াচ্ছে। এই সময় দেখলাম কে একজন গুলি খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি যেদিকে মিলিটারীর গাড়ি ও অসংখ্য মিলিটারী ছিল সেদিকে কোন গাড়ি বা মিলিটারী নেই। চতুর্দিকে একনজর দেখে নিয়ে মেয়েছেলে ও বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম। প্রথমে গিয়ে ঢুকি চিৎবালীর ঘরে। চিৎবালী ঘরে ছিল না। এক মহিলা ভয়ে কাঁপছিল। তার কাছে পানি খেতে চাইলে সে একটি ঘটি দেখিয়ে দিল। পানি খেয়ে ওর ঘরের কোণে যে ঘুঁটে ছিল তার নিচে লুকিয়ে থাকতে চাইলাম। মহিলাটি আমাকে তক্ষুণি সরে যেতে বললো। তখন আমি বস্তির পাশের লেটিনে ঢুকে পড়ি।

এ সময়ে রাজারবাগের দিকে গোলাগুলি হচ্ছিল। এক-একটা প্রচন্ড শব্দ । থেমে থেমে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। একটু বাদেই দুটি প্লেন উড়ে গেলো বুঝতে পারলাম। এভাবে অনেকক্ষণ কাটালাম সেখানে।

এক সময় একটা লোক এসে লেটিনের দরজা নাড়া দিল। দরজায় নাড়া শুনে ভাবলাম এবার শেষ। মিলিটারী নিশ্চয়ই এসেছে। খুলে দেখি একটি লোক, মিলিটারী নয়। লোকটি বলল তার নাম ইদু। পুরানো বই বিক্রি করে রাস্তার ওপারে। বলল, সে হলে এসেছিল মেয়েছেলেদের মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি আছি শুনে আমাকে ও নিয়ে যাবে। প্রথমে যেতে চাইনি। বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। বলল সে সাথে যাবে। রাস্তা এখন পরিষ্কার, কোন মিলিটারী নেই। গায়ে সেই চাপ চাপ রক্ত নিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। বকসীবাজারের কাছ দিয়ে যেতে দেখি ওদিকে কোন মিলিটারী যায়নি। অনেকে অজু করছে নামাজ পড়ার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জুমার নামাযের সময়। ইদু আমাকে জেলখানার পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গার পারে নিয়ে এক মাঝিকে অনুরোধ করায় নদী পার করে দিলো। নদীর ওপারে দেখা আমাদের হলের এক প্রাক্তন ছাত্র সুনির্মল সিংহরায় চৌধুরীর সাথে। সে নিয়ে গেল তার কর্মস্থল শিমুলিয়ায়। সেখান থেকে প্রথমে নবাবগঞ্জ ও পরে নিজ গ্রাম বরিশালের ধামুরাতে চলে যাই।

সে ভয়াল রাতে জগন্নাথ হলে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল এখন সে দৃশ্য কল্পনা করলে আমার সমস্ত মানবিক অস্তিত্ব মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না আমি বেঁচে আছি। এ কি সত্যি! ভাবতে গেলে তখন সবকিছু যেন তছনছ হয়ে যায়। সবকিছুই স্বপ্নের মত মনে হয়। আমি কি কোন এক নেশার ঘোরে সেদিন হল জীবনের নিত্যসঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদের লাশ টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম? মার্চের শুরুতে এখনও মাঝে মাঝে ঐ দিনের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই। সেই ঘোর এখনও আমার অস্তিত্বে তীব্র কশাঘাত করে।

(বাসন্তিকা, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা,
১৯২১-১৯৮১, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
পৃষ্ঠা ২৫৬—৬৩।)

জগন্নাথ হল ঃ সাতাশে মার্চ, ১৯৭১
—নির্মলেন্দু গুণ

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেয়া হলো।
দেড় দিন দেড় রাত্রি গৃহবন্দী থেকে আমরা দু'জন
নগরীর রূপ দেখতে বাইরে বেরুলাম।
আজিমপুরের মোড়ে বেয়নেট বিদ্ধ এক তরুণের লাশ
স্বাগত জানালো আমাদের। তারপর বৃদ্ধ একজন।
অগ্নিদগ্ধ, মর্টার বিধ্বস্ত এই প্রাচ্য নগরীকে
মনে হলো প্রাণ স্পন্দন হীন এক মৃত প্রেত পুরী,
অপসৃত অদম্য প্রাণের গর্ব, ডানে বাঁয়ে
সর্বত্র মৃতের হাতছানি।

যুবতী কন্যাকে নিয়ে পালাচ্ছেন পিতা,
মার কোলে দুগ্ধ পোষ্য শিশু।
প্রিয়জনদের খোঁজে উদ্বিগ্ন মানুষ ছুটছে সতর্ক
যেমন সন্ত্রাসবিদ্ধ বনের হরিণ ক্ষিপ্ত হিংস্র নেকড়ের
তাড়া খেয়ে ছোটে। কারো পুত্র, কারো বন্ধু, কারো পিতা
কারো ভাই হ'য়ে পথে পথে শুয়ে আছে ছিন্ন ভিন্ন লাশ।

নগরীতে কারা বেশী, যারা মরে গেছে তারা?
নাকি মেশিন গানের গুলি থেকে বেঁচে গেছে যারা?
সাতাশে মার্চের ভোরে এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।

হত্যা ক্লান্ত পাক সেনা বাঙ্গালীর রক্তে স্নান করে
সহাস্যে নগর পথে বেরিয়েছে প্রমোদ টহলে
সাথে তাক করা নির্দয়, নিষ্ঠুর স্টেনগান।

জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণা বিকৃত মুখ তবু দেশ মাতৃকার গর্বে অমলিন।
জগন্নাথ হলের চত্বরে সবুজ ঘাসের বুকে
আক্রোশে খামচে ধরা ট্যাংকের দাঁতের কামড়।

গোবিন্দ দেবের রক্তে ভাসমান লাল শিববাড়ি
আহা কি হৃদয় বিদারক – হায় কি করুণ!

পুকুরে ভাসছে এক যুবকের লাশ, যেন মরা মাছ।
একি কবি আবুল কাশেম? তুমি কে গো ভাই?
জগন্নাথ হল আছো সেই দৃশ্য স্থির হয়ে আছে।

কবি নির্মলেন্দু গুন ২৭শে মার্চ (১৯৭১) স্বচক্ষে যা দেখেছিলেন তাই লিখেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

দলিলপত্রের আলোকচিত্র

Office of the Provost
Jagannath Hall
University of Dacca
Dacca 2.
Bangladesh

Dear Sir,

I would like to inform you that it has been learnt that the following ex-student of Jagannath Hall, Dacca University was reportedly killed in the last War of Liberation in 1971:

The undersigned requests you kindly to let him know the details known to you as to the place and how the student was killed during the War of Liberation, and as to whether you have received any amount from the Public Ex-chequer, Govt. of Bangladesh, in connection with the Shahid student as aforesaid, if so, the amount already received as sanctioned by the Govt. of Bangladesh.

Thanking you,

Yours faithfully,

A. K. Roy
(A.K.Roy)
Provost,
Jagannath Hall,
Dacca University.

জগন্নাথ হল হতে শহীদদের অভিভাবকের নিকট প্রেরিত পত্র

স্থায়ী ঠিকানা - রবীন অঙ্গন
শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী
পোঃ গ্রাম - চণ্ডীদ্বার
জিলা - কুমিল্লা ।
তাঃ ২/১১-৬-৭৪

মাননীয় প্রাধ্যক্ষ
জগন্নাথ হল , ঢাকা ।

অনুসরন - ভবদীয় পত্র নং ২০৫০-৬৭/১০-৫-৭৪

মহাশয় ,

আপনার উক্ত পত্রের প্রাপক শহীদ পুত্রের পিতা কুয়াটিকায় ২৩শে মে , ১৯৭১ ইং তারিখে অনুগামী বিধায় - আমি মুচ্ছিতা , শোকাকুলা জননীর পরে শহীদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী আপনার উক্ত পত্র যদিও অনেক গৌনে প্রেরীত তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । জানাচ্ছি আপনাদের বন্ধু সজন মায়েরআশীষ --" এই বাংলার অভিশপ্ত জীবনের অমানিশা কেটে গিয়ে একটা সত্য স্ফুরিত আলোকে প্রতিটি হৃদয় উদ্ভাসিত হউক , পুজিত হউক সত্য , শেষের মধ্যে অশেষের হউক বিজয় ।"

বিগত দিনগুলি অতীব ক্লেদাক্ত ইতিহাস - নেতাদের আশ্বাস প্রহসন - শহীদের রুধির সিক্ত মাটিতে জল্লাদের বিচার সবই ব্যর্থ । জাতীয় সংসদ ক্ষমা করেছে - জাতি কি ক্ষমা করেছে ? পেরেছে কি ক্ষমা করতে মা , বাবা , ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েরা .... আর আমি আর আপনি .... ?

আমি শোকাকুল ছিলাম - সংজ্ঞাহীন মা আমার - আর আমার পরিবারের প্রতিজন: একদিনে আকুল অবস্থায় ১২ই ফাল্গুন ১৩৭৮ বাং পূর্বদেশ হানাদারের কবলে জগন্নাথ হল - ৩ পাঠে । ভ্রাতৃ নিধন যজ্ঞের উক্ত সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য আমি ১১-৩-৭২ তারিখে অনেক কষ্টে উপাচার্য্য , প্রাধ্যক্ষ , বিভাগীয় প্রধান গণিত , সম্পাদক জগন্নাথ হল সংসদ সভার কাছে চিঠি দিয়েছিলাম । পরিতাপের বিষয় এযাবত কাল ক্রন্দমান পরিবারের জন্য সান্ত্বনা আসেনি কোন স্থান থেকে ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে কিভাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই রাখাল রায় (রবীন) শহীদ হয়েছিল তা আমরা ঐ সংবাদ পত্রেই জেনেছি - জেনেছি আপনার হলের বার্ষিকী ১৩৭৭ বাং থেকে - গণিত বিভাগের স্মরনিকা থেকে । আমরা কোন প্রকার সাহার্য্য পাইনি বা গ্রহন করিনি ।
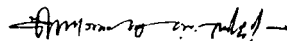
যদি দয়া করে আরও সংগৃহীত ও সত্য সমর্থিত ভ্রাতৃহত্যার বিস্তৃত সংবাদ পরিবেশন করেন তবে ধন্যবোধ করবো । জগন্নাথ হলে ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শহীদানের স্মৃতিধারক কি হয়েছে - হতে যাচ্ছে ইত্যাদি জানালে সুখী হব । পত্র , পত্রিকা , বার্ষিকী এখন পর্যন্ত যা বেড়িয়েছে তার প্রতি কপি পেলে ধন্যবোধ করবো । ভ্রাতৃত্বেরপ্রীতি বোধ করবো যদি কোন সংগৃহিত শহীদ ভাইয়ের স্মৃতিবাহক তাহারই ব্যবহৃত প্রমান্য জিনিষ যদি আমাদের জন্য পেয়ে থাকেন ।

শহীদ ভাইয়ের অমর আত্মার স্মৃতিধারক শিক্ষা অঙ্গনের প্রতিজনের প্রতি স্নেহ , প্রীতি , প্রেম জানিয়ে শেষ করি ।

আপনার প্রচেষ্টা প্রতিক্ষেত্রে ক্ষমতা লাভ করুক ।

ইতি -
হতভাগ্য জীবন পথে

(শ্রী যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী)
রবীন অঙ্গন
৩৮ বক্সির হাট , চট্টগ্রাম

বর্তমান ঠিকানা

প্রাধ্যক্ষের নিকট শহীদ রাখাল রায়ের পিতার পত্রোত্তর

ঘাটীচোরা হইতে
তাং ২৩/৫/৭৪

Dear Sir বিনীত নিবেদন এই- আপনার
২০/৫/৭৪ তারিখের পত্র খানা ২৩/৫/৭৪ তাং পাইলাম। গণপতি ৬/৫/৭১ তারিখে মঠবাড়ীয়া থানায় আসে পুলিশের আশ্রয় লয়, ১০/৫/৭১ তারিখে বেলা ১১টায় মহকুমা-পিরোজপুর পাক সেনা-বাহিনীর কাছে চালান দেয় এবং ঐ দিনই রাত ৭॥ টায় শিবে পাক সেনা-বাহিনীরা গুলি করিয়া হত্যা করে।

আমি গণপতির পরিবারের জন্য বাংলাদেশের প্রতি- জেনারেল ফান্ড হইতে ২০০০.০০ টাকা পাইয়াছি। অন্য কোন ফান্ড হইতে কোন টাকা পয়সা পাই নাই।
ইতি, তাং ২৩/৫/৭৪

নরেন্দ্র নাথ হালদার
সাং: ঘাটীচোরা
পো: মঠবাড়ীয়া
জিঃ বাখরগঞ্জ

প্রাধ্যক্ষের নিকট শহীদ গণপতি হালদারের পিতার পত্রোত্তর

শেখ মুজিবুর রহমান

নং প্রত্রাক ৮/৪/৭২ সিভি/১৭১২৩

প্রিয় ভাই/বোন,

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার সুযোগ্য পুত্র/~~পিতা/স্বামী/মা/স্ত্রী~~ ভাই আত্মোৎসর্গ করেছেন। আপনাকে আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আপনার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও রইল আমার প্রাণঢালা সহানুভূতি।

এমন নিঃস্বার্থ মহান দেশ-প্রেমিকের পি~~তা/পুত্র/স্বামী/মা/স্ত্রী~~ হওয়ার গৌরব লাভ করে সত্যি আপনি ধন্য হয়েছেন। (বোন)

'প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল' থেকে আপনার পরিবারের সাহায্যার্থে আপনার সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের নিকট ২০০০/— টাকার চেক প্রেরিত হ'ল। চেক নম্বর [illegible]।

আমার প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিন।

শেখ মুজিব

রবীন্দ্র চন্দ্র দাস

গ্রাম: [illegible]

পো: [illegible]

থা: শিবপুর

ঢাকা

শহীদদের নিকট প্রেরিত রাষ্ট্রীয় সাহায্যের নমুনাপত্র।

শহীদদের আলোকচিত্র

শহীদ শিক্ষকবৃন্দ
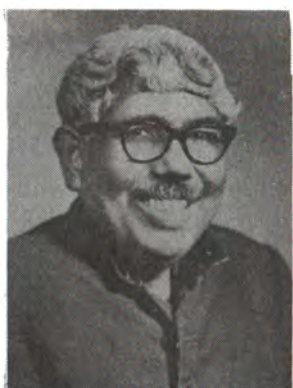
ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব
চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ ও
প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
রীডার, ইংরেজী বিভাগ ও
প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য
লেকচারার, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ও
সহকারী আবাসিক শিক্ষক,
জগন্নাথ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারে নিহত এবং
পরে জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত]
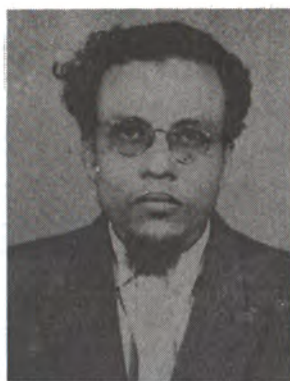
এ. এন. এম. মুনীরুজ্জামান
রীডার, পরিসংখ্যান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপেন্দ্র নাথ রায়
শেষপর্ব এম. এস. সি
পদার্থ বিদ্যা
রোল–জ–৫৪৮
পিতা ঃ মদন মোহন রায়
গ্রাম ঃ গুলিয়ারা
ডাকঘর ঃ সুন্দরপুর
জেলা ঃ দিনাজপুর।
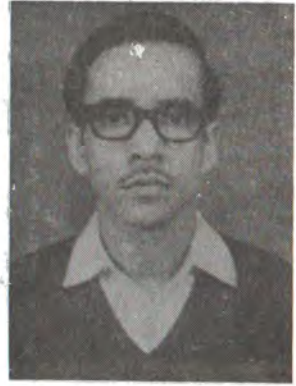
কার্তিক শীল
শেষপর্ব, এম.এ
ইংরেজী–জ–২৮৩
পিতা ঃ
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ কালাখালী
জেলাঃ বরিশাল।

কিশোরী মোহন সরকার
প্রথমপর্ব, এম.এ ইংরেজী–জ–২৮৩
পিতা ঃ কার্তিক চন্দ্র সরকার
গ্রাম ঃ পাড়াগ্রাম
ডাকঘর ঃ হাট বিজয়নগর
থানা ঃ শিবালয়
জেলা ঃ ঢাকা।
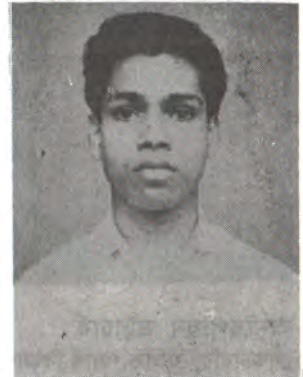
কেশব চন্দ্র হাওলাদার
প্রথমপর্ব, এম.এস.সি
গনিত–জ–১৬২
পিতা ঃ কৃষ্ণকান্ত হাওলাদার
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ কাঁচাবালিয়া
থানা ঃ ঝালকাঠী
জেলাঃ বরিশাল।

গনপতি হালদার
তৃতীয়বর্ষ, রসায়ন
জ–৩২৬
পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথ হালদার
গ্রাম ঃ ঘটীচোড়া
ডাকঘর ঃ মঠবাড়িয়া
জেলা ঃ বরিশাল

জীবন কৃষ্ণ সরকার
শেষপর্ব, এম.এম.সি
রসায়ন–জ–৫৫১
পিতা ঃ মৃত যতীন্দ্র মোহন সরকার
গ্রাম ঃ কুলপতাক
ডাকঘর ঃ সেখুপুর
থানা ঃ মোহনগঞ্জ
জেলা ঃ ময়মনসিংহ

ননী গোপাল ভৌমিক
দ্বিতীয় বর্ষ
জ–৫৮০
পিতা ঃ চন্দ্র মোহন ভৌমিক
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ শ্যামগ্রাম
জেলা ঃ কুমিল্লা।

নির্মল কুমার রায়
প্রথমপর্ব, এম.কম
জ–৭২
পিতা ঃ
গ্রাম ঃ
ডাকঘর ঃ
জেলা ঃ
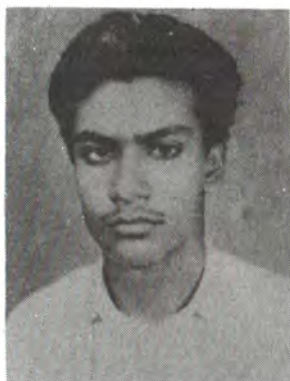
নিরঞ্জন প্রসাদ সাহা
প্রথমপর্ব, এম. এস.সি.
পদার্থ–জ–৫১
পিতা ঃ
গ্রাম ঃ
ডাকঘর ঃ
জেলা ঃ

নিরঞ্জন হালদার
শেষপর্ব, এম.এস.সি
পদার্থ–জ–৬৫১
পিতা ঃ যদুনাথ হালদার
গ্রাম ঃ শিকারপুর
ডাকঘরঃ পিরোজপুর
জেলা ঃ বরিশাল।

প্রদীপ নারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রথমপর্ব, এম.এ.
জ–২৮১
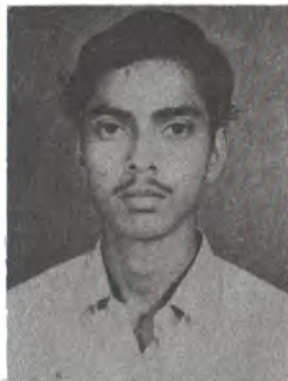
বরদা কান্ত তরফদার
দ্বিতীয়বর্ষ,
ভূতত্ত্ব–জ–৩১১
পিতা ঃ তারাকান্ত তরফদার
গ্রাম ঃ খেপামল
ডাকঘর ঃ ফুলবাড়িয়া
জেলাঃ ময়মনসিংহ।
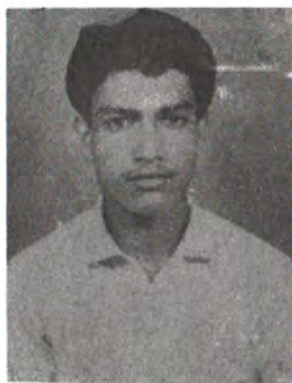
বিধান চন্দ্র ঘোষ
তৃতীয়বর্ষ,
ইংরেজী–জ–৪৭৪
পিতা ঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষ
গ্রাম ঃ কাচারিপাড়া
জেলা ঃ পাবনা

বিমল চন্দ্র রায়
তৃতীয়বর্ষ
পরিসংখ্যান–জ–২৬৩
পিতা ঃ জন্মে জয় রায়
গ্রাম+ডাকঘর ঃ বাল্পিরটেক
থানা ঃ মানিকগঞ্জ
জেলা ঃ ঢাকা।

মুরারী মোহন বিশ্বাস
পিতাঃ মহাদেব বিশ্বাস
একতারপুর, জানিপুর
কুষ্টিয়া
এম.এড

মৃনাল কান্তি বোস
শেষপর্ব, এম.এ
অর্থনীতি–জ–৭৭৫
পিতা ঃ আশুতোষ বোস
গ্রাম ঃ মুরিয়াগোড়া
ডাকঘর ঃ গোহালা
জেলা ঃ ফরিদপুর।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস
দ্বিতীয়বর্ষ
গনিত–জ–২০১
পিতা ঃ নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম+ডাকঘর ঃ সাতপাড়
জেলা ঃ ফরিদপুর।
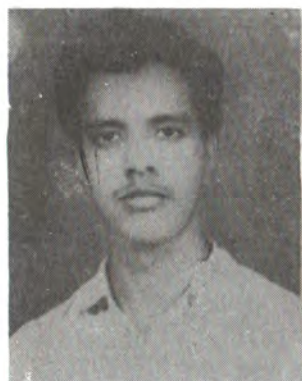
রণদা প্রসাদ রায়
দ্বিতীয়বর্ষ
গনিত–জ–২৮৮
পিতা ঃ সুরেন্দ্র নারায়ন রায়
গ্রাম+ডাকঘরঃ কসবা
জেলাঃ ফরিদপুর।

রমনী মোহন ভট্টাচার্য
প্রথমপর্ব, এম, এ
দর্শন–জ–৩৬৫
পিতা ঃ
গ্রাম+ডাকঘর ঃ অষ্ট গ্রাম
জেলা ঃ ময়মনসিংহ।
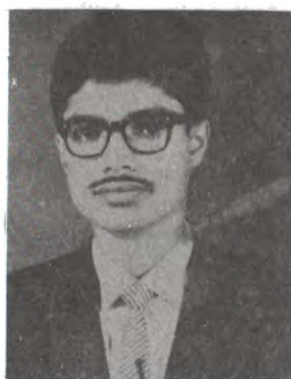
রাখাল রায়
তৃতীয়বর্ষ
গনিত–জ–৩৪৯
পিতা ঃ
গ্রাম+ডাকঘর ঃ চন্ডীদ্বার
জেলাঃ কুমিল্লা।

শিব কুমার দাস
দ্বিতীয়বর্ষ
মৃত্তিকা বিজ্ঞান
জ–২৯৯
পিতা ঃ গনেশ চন্দ্র দাস
গ্রাম ঃ পাটুরিয়া
ডাকঘর ঃ আড়কান্দি
থানা ঃ বালিয়া কান্দি
জেলা ঃ ফরিদপুর।
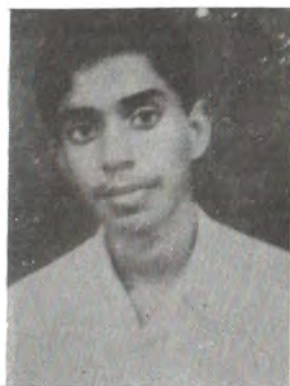
রূপেন্দ্র নাথ সেন
দ্বিতীয়বর্ষ
রসায়ন–জ–২৩১
পিতা ঃ জীতেন্দ্র নাথ সেন
গ্রাম+ডাকঘর ঃ ভাঙ্গা
জেলা ঃ ফরিদপুর।

সন্তোস চন্দ্র রায়
শেষপর্ব, এম.এস.সি
উদ্ভিদবিদ্যা
জ–৩৮৬
পিতা ঃ
গ্রাম ঃ বড়িবাড়ী
ডাকঘর ঃ জিনারদি
জেলা ঃ ঢাকা

শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী
দ্বিতীয়বর্ষ
ইংরেজী
জ–৯২০
পিতা ঃ
গ্রাম ঃ আম্বর থানা
ডাকও জেলা ঃ সিলেট

সত্য রঞ্জন দাস
তৃতীয় বর্ষ
রসায়ন
জ–২৬৯
পিতাঃ রাজেন্দ্র কুমার দাস
গ্রামঃ বাজনবা
ডাকঘরঃ চক্রদহ
উপজেলাঃ শিবপুর
জেলাঃ ঢাকা।

সুজিত দত্ত
তৃতীয়বর্ষ, বি.কম
জ–৩৯
পিতা ঃ
গ্রাম ও ডাকঘরঃ পলাশ
জেলা ঃ ঢাকা

সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
দ্বিতীয়বর্ষ
পরিসংখ্যান
জ–২০৫
পিতা ঃ নলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী
আঠার বাড়ী বিল্ডিং
ময়মনসিংহ
ঢাকা
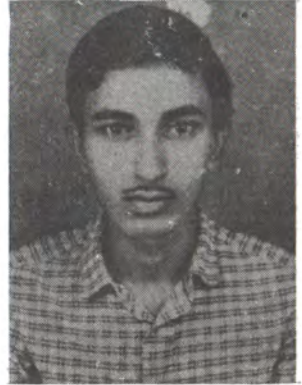
সুশীল চন্দ্র দাস
তৃতীয়বর্ষ
মৃত্তিকা বিজ্ঞান
জ–২৬৭
পিতা ঃ রমা নাথ দাস
গ্রামঃ বরাইল
ডাকঘর ঃ সলিমগঞ্জ
জেলা ঃ কুমিল্লা।

স্বপন চৌধুরী
তৃতীয়বর্ষ
পরিসংখ্যান
জ-১১২
পিতা ঃ হরিরঞ্জন চৌধুরী
গ্রাম+ডাকঘরঃ ধেমলা
সাতকানিয়া
চট্টগ্রাম
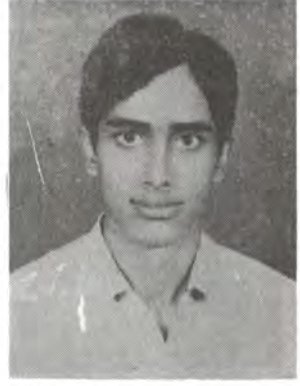
হরিনারায়ন দাস
তৃতীয়বর্ষ
সমাজ বিজ্ঞান
জ-২০৪
পিতা ঃ
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ নরসিংদি
জেলা ঃ ঢাকা

অজিত রায় চৌধুরী (কোন তথ্য পাওয়া যায় নি)

নিরঞ্জন চন্দ (কোন তথ্য পাওয়া যায় নি)

প্রবীর পাল
প্রথম পর্ব এম, এস, সি
১২ নং টি, এন, রায় রোড
আমলাপাড়া
ময়মনসিংহ

ভবতোষ ভৌমিক (কোন তথ্য পাওয়া যায় নি)

সত্যরঞ্জন নাগ (কোন তথ্য পাওয়া যায় নি)

সুব্রত সাহা (কোন তথ্য পাওয়া যায় নি)

মধুসুদন দে
কেন্টিন পরিচালক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
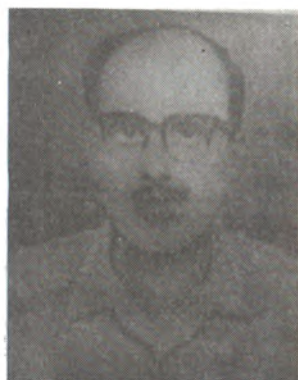
খগেন্দ্র চন্দ্র দে, কর্মচারী, দর্শন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুশীল চন্দ্র দে, পাম্প খালাসী,
প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মতিলাল দে
পিতা খগেন চন্দ্র দে

দাসু রাম, মালী, উপাচার্য ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মন ভরন রায়
কর্মচারী, নিপা।

মিস্ত্রি রাজভর, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি,
প্রকৌশলী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয়নাথ রায় (দারোয়ান)
গ্রাম–ঘনিয়ার চর
ডাকঘর–ঘনিয়ার চর
জেলা– কুমিল্লা

সুনীল চন্দ্র দাস (দারোয়ান)
পিতা- প্যারী মোহন দার
গ্রাম-চিনামুড়া
ডাকঘর-চিনামুড়া
উপজেলা-দাউদকান্দি
জেলা-কুমিল্লা

দুঃখী রাম মন্ডল (দারোয়ান)
পিতা-অতুল চন্দ্র মন্ডল
গ্রাম- শানবান্ধা
ডাকঘর-বালিরটেক
জেলা-মানিকগঞ্জ

শিবপদ কুড়ী (দারোয়ান)
পিতা গয়ানাথ কুড়ী

রাজেন ব্রহ্মচারী, শিববাড়ির সাধু
আরো অনেক নাম জানা ছাত্র, অতিথি ও পথচারী।

জহর লাল রাজভর, মালী, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সরোজা ব্রহ্মচারী, শিববাড়ির সাধু

মাধব চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শিববাড়ির সাধু

রাম ধনী ব্রহ্মচারী, শিববাড়ির সাধু

শঙ্কর কুরী, শিবু কুরীর ভাই

স্বামী মুকুন্দ নন্দ সরস্বতী, শিববাড়ির সাধু

ভীর রায়

বোধি রাম

মনী রাম

গণহত্যার চিত্র

ছাব্বিশে মার্চের আক্রান্ত সেই হল
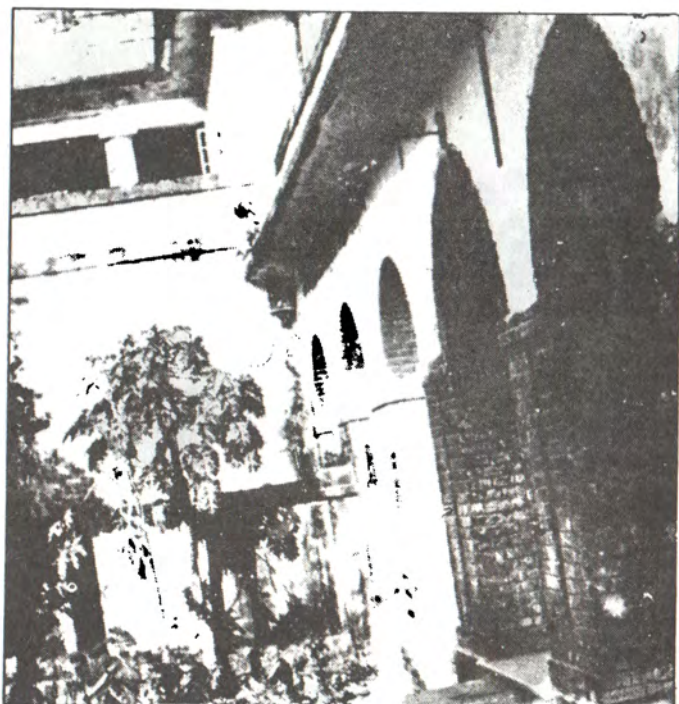
এই ভবন থেকেই অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য কে ধরে নেয়া হয়।

এই গাছের নীচে অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য কে হত্যা করা হয়।

গণহত্যার শিকার

এই পুকুরে পরেছিল বেশ কিছু শহীদদের লাশ।

গণ কবরটি প্রথম গড়ে ওঠে এখানে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শহীদদের দেহাবশেষ গণ কবর হতে তোলা হয়।

শহীদদের দেহাবশেষ।
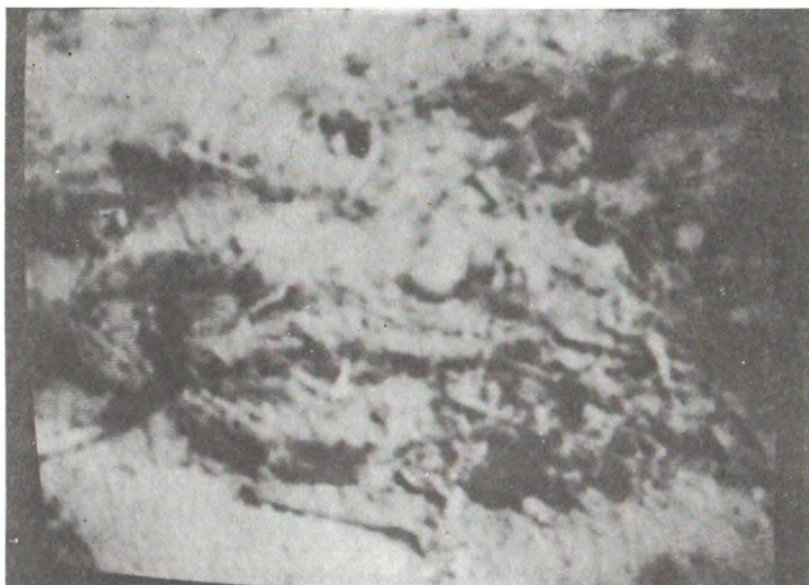
শহীদদের দেহাবশেষ।

শহীদদের দেহাবশেষ।

এই শহীদ মিনারটি ধ্বংস করা হয়েছিল।

স্থানান্তরিত গণ কবর।
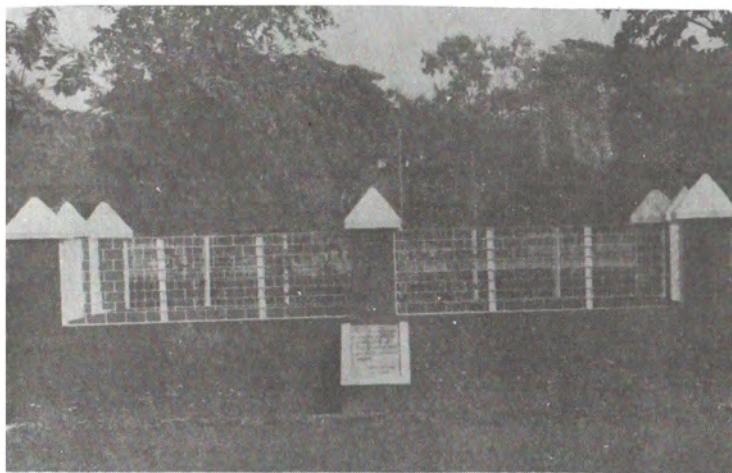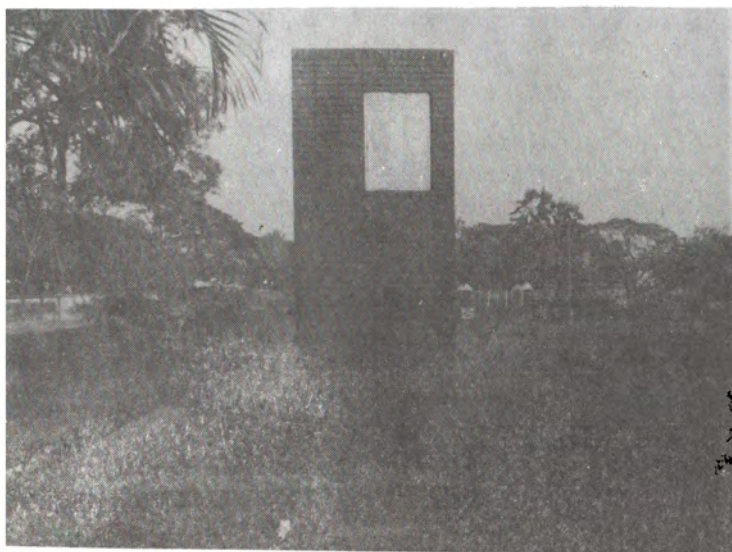
শহীদ স্তম্ভ।
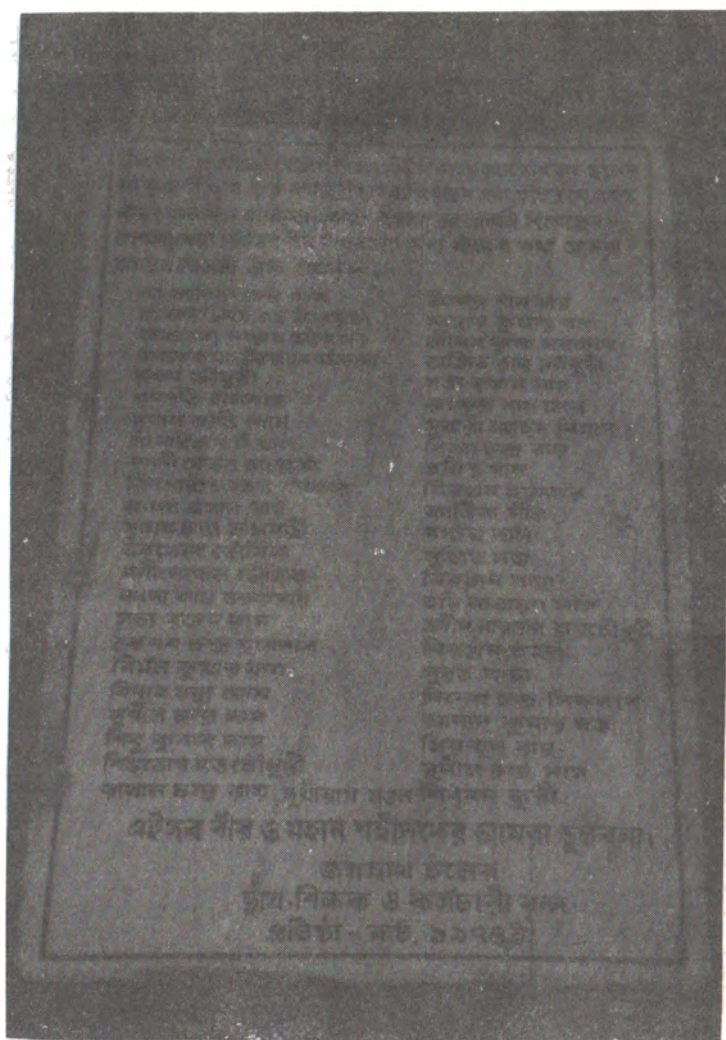
শহীদ স্তম্ভে খোদিত শহীদদের নাম।
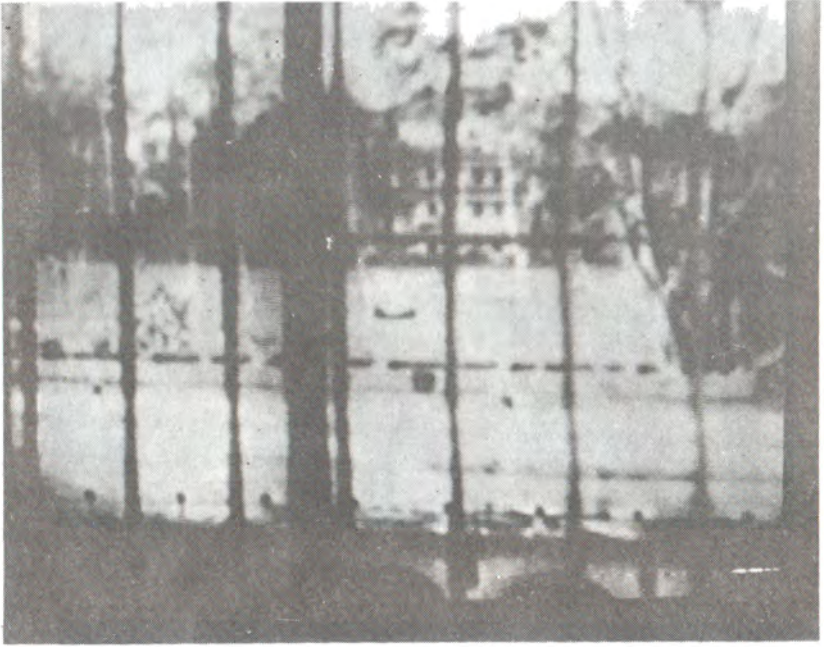
যে জানালা দিয়ে ডঃ নূরুল্লা উল্লাহ্ জগন্নাথ হলের গণ হত্যার ভিডিও করেছেন।

ডঃ নুরুল উল্লাহ্‌র ভিডিও থেকে নেয়া জগন্নাথ হলের গণ-হত্যার চিত্র।

গণহত্যার পরিলেখ পরিকল্পনা চিত্র

জগন্নাথ হলের গণহত্যার
পরিলেখ পরিকল্পনা চিত্র